অখণ্ড সংহিতা

বা

ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক পঁয়ষট্টি টাকা

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" : হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ত্রয়োদশ খণ্ডের নূতন প্রথম সংস্করণের নিবেদন

"অখণ্ড-সংহিতা বা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী" ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হইল। বাংলা ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসে ক্ষুদ্রাকৃতি যে ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের কালে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণের বর্দ্ধিতায়তন একাদশ খণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ফলে বর্ত্তমান ত্রয়োদশ খণ্ড সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ হইল। এই খণ্ডে যে সকল উপদেশ-বাণী পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার মাত্র ৮/১০ পৃষ্ঠা অনেক দিন আগেকার "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই খণ্ডের বাকী সমস্ত অংশই সম্পূর্ণ নূতন মুদ্রিত হইতেছে।

ভারতীয় ধর্ম্মসাহিত্যপুঞ্জে "অখণ্ড-সংহিতা"র স্থান কোথায়, তাহা আমাদের নিজেদের মুখে বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। এই গ্রন্থের যে-কোনও পাতা খুলিলেই পাঠক-পাঠিকা যুগোপযোগী সনাতন সত্যের সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। জীবনের যে-কোনও গুরুতর সমস্যার এমন সরল, সহজ, সর্ব্বজনগ্রাহ্য, অকাট্য মীমাংসা খুব সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না,—আমাদের এই উক্তি অত্যুক্তি নহে। ইচ্ছা করিয়াই আমরা বর্ত্তমান কালের বহু মনীষীর উচ্ছ্বসিত-প্রশংসা-মুখরিত

মতামত উদ্ধারে বিরত রহিলাম। পাঠক ও পাঠিকা নিজেদের স্বাধীন বিচারের দ্বারা নিজ নিজ মতামত স্থির করুন।

পৃথিবীর গুরুবর্গের মধ্যে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কয়েকটা জায়গায়ই এক একটা অসাধারণ বিশেষত্ব রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটী এই যে, তিনি নিজে শিষ্যদিগকেও স্বাধীন বিচারের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন। তিনি কদাচ একটী প্রাণীকেও নিজ স্বাধীন বিচারের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতে উপদেশ দেন নাই। এমন যে স্বাধীনতাপ্রদাতা আচার্য্য, তাঁহার উপদেশ-বাণী সম্পর্কেও আমরা প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকাকে নিজ নিজ অভিমত গঠন করিবার স্বাধীনতা দিয়া রাখিলাম। অন্যান্য মনীষী ব্যক্তিরা আচার্য্য স্বরূপান্দের অভ্রান্ত দিঙ্‌নির্দ্দেশনের কি মূল্যায়ন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। একটা দেশ, একটা জাতি, একটা যুগই মাত্র নহে, অসংখ্য দেশ, অসংখ্য জাতি এবং ভাবী কালের অনন্ত যুগ আচার্য্য স্বরূপানন্দের প্রাণময়ী উপদেশ-বাণী হইতে তেজ, বীর্য্য, উদ্দীপনা, শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবে,—ইহা সুনিশ্চিত। অলমতি বিস্তরেণ, পৌষ, ১৩৭৪। অযাচক আশ্রম, বারাণসী।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

ঠিক ছয় বৎসর পরে ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৪ সনে দুই হাজার ছাপা

হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা ত্রয়োদশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। তৃতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল।

একলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

অখণ্ড-সংহিতার বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত একত্রিশ বৎসর যাবৎ "অখণ্ড-বাণী" নামে প্রকাশ করিয়া সাধ্যমত নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। ইতি বৈশাখ ১৩৯০ বাং

নিবেদিকা

অযাচক আশ্রম — ব্রহ্মচারিণী সংহিতা দেবী
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, — (মঙ্গলময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়)
বারাণসী-১০। — গ্রন্থ-স্বত্বাধিকারিণী

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

অযাচক সন্ন্যাসী, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের অভিনব সমন্বয়কারী, স্বাবলম্বনের মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাকর্ম্মযোগী, সমদর্শী,

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে মহাওঁকার মন্ত্র ও ব্রহ্মগায়ত্রী মহামন্ত্রের অধিকার প্রদাতা, অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত্ত প্রতীক, আবাল্যব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক, অনন্য চরিত্রগঠন আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, সুমহত অখণ্ডআদর্শ ও অখণ্ডসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, অযাচক আশ্রম নামক অভিনব সেবা প্রতিষ্ঠান এবং দি মালটিভারসিটি নামক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা, জগৎকল্যাণ-অভীপ্সাকে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ স্বরূপ নির্দ্দেশকারী ও জগৎকল্যাণসাধনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে উৎসর্গকারী, ভবিষ্যৎ দেবমানবজাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের পথনির্দ্দেশক বিশ্বত্রাতা নবযুগস্রষ্টা জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, নিত্যসত্যস্বরূপ, পরমপূজ্যপাদ আচার্য্য-বরিষ্ঠ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, ভক্তগণের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীবাবামণি দেবমানবজাতির সম্ভাবনা-কে ত্বরান্বিত ও বাস্তবায়িত করিবার জন্য যে উপদেশামৃত-বারিধি জনসমাজকে কয়েকটি যুগ ধরিয়া প্রদান করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি বিন্দুর সংগ্রহ অখণ্ড-সংহিতারূপী অমূল্য গ্রন্থের আকারে, মানবজাতির নৈতিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও আর্থিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানের সহায়করূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই অমূল্য গ্রন্থ "অখণ্ড সংহিতা" অধ্যয়নে দেশকাল সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ জীবনে

কর্ম্মভূমিতে ও অধ্যাত্ম পটভূমিকায় অধিকতর নিষ্ঠা ও আত্মোন্নতির পথনির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাইবেন এবং এই উপদেশগুলি প্রতিপালনের দ্বারা নিজ উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজকে সমৃদ্ধি প্রদানে সমর্থ হইবেন।

মানব জীবনের সম্ভাব্য প্রতিটি সমস্যার ব্যাখ্যা ও ন্যায়নীতি-সংগত, যুক্তিবদ্ধ সুসমাধান অখণ্ড-সংহিতা মহাগ্রন্থে উপলব্ধ হয়।

সুতরাং অখণ্ড-সংহিতা মহাগ্রন্থ সর্ব্বকালের, সকল দেশের, সকল জাতির, সকল গোষ্ঠির, সকল সম্প্রদায়ের, সকল প্রকার সভ্যতা, সংস্কার ও সংস্কৃতির, সকল স্তরের সকল মানুষের একান্ত পঠনীয় ও পালনীয়। এই অখণ্ড-সংহিতা মহাগ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে মানবের প্রত্যহ পঠনীয় ও সদাপালনীয় এক পবিত্র গ্রন্থ। মানব সমাজের সর্ব্ববিধ অকুশল বিনাশ করিয়া সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও পবিত্রতা বিধায়ক এক অব্যর্থ আয়ুধ এই মহাগ্রন্থ। এই অমূল্য গ্রন্থটি যাহাতে সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয় সেইজন্য অযাচক আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের অর্থমূল্য সর্ব্বদাই ন্যূনতম রাখিয়াছেন। বহুলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা মহাগ্রন্থ প্রতি মানুষ আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিয়াছেন, লক্ষাধিক প্রতি মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে সর্ব্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীবাবামণির অপার করুণায় আরও লক্ষ লক্ষ প্রতি বিক্রীত ও বিতরিত হইতে থাকিবে ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

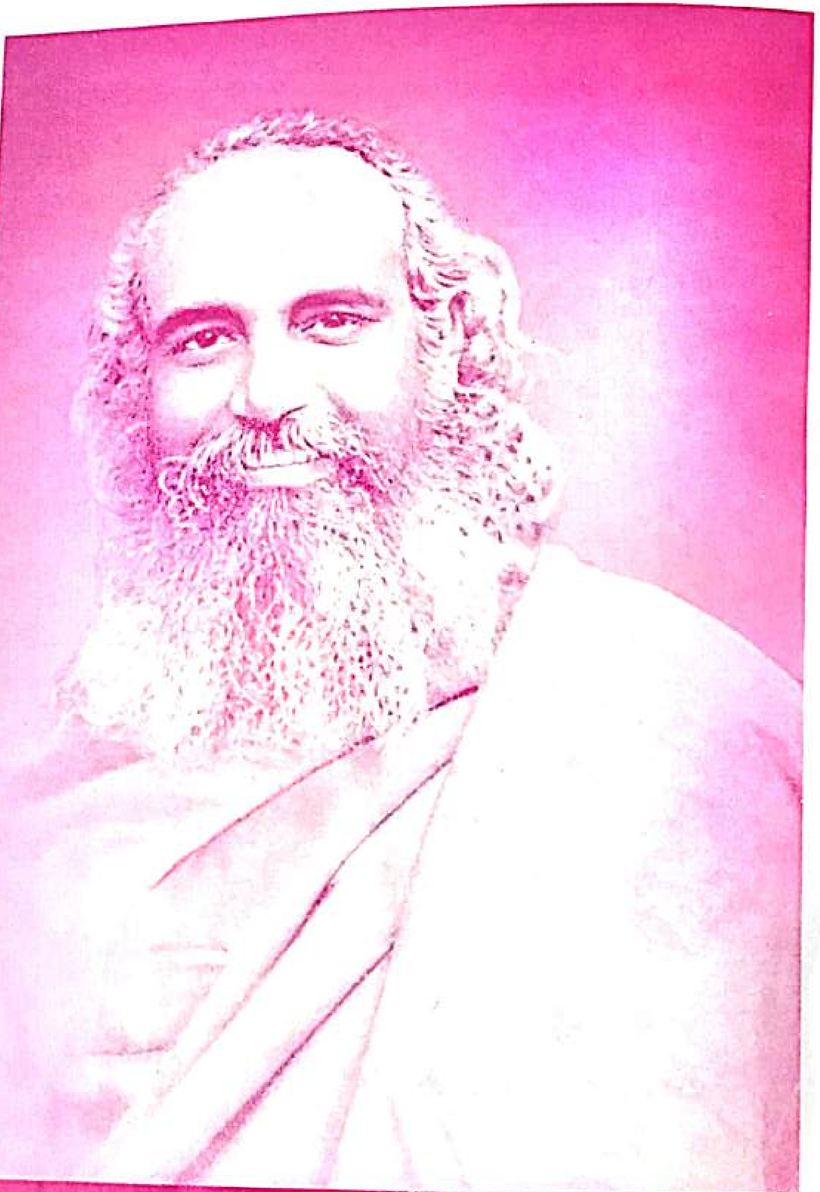
অখণ্ড-সংহিতা ত্রয়োদশ খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের মূল উপদেশাবলীর হুবহু পুনর্মুদ্রণ। অখণ্ড-সংহিতা ত্রয়োদশ খণ্ডের উপদেশ সমাপ্ত হইবার পরে এই সংস্করণেই শ্রীশ্রীবাবামণির অসাধারণ উচ্চভাব, আদর্শের দৃঢ়তা, মাধুর্য্যগুণ ও সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ কাব্য রচনার বিশাল ভাণ্ডার হইতে কয়েকটি কবিতা, কয়েকটি সঙ্গীত সংযোজিত হইল পাঠক সমাজের কল্যাণ, আগ্রহ ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

কিছুকাল ধরিয়া অখণ্ড-সংহিতা গ্রন্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ জনসমাজে এই মহাগ্রন্থের অসাধারণ চাহিদা। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সৎচিন্তার প্রতি, মহৎ আদর্শের প্রতি এখনও মানব মনে সুবিপুল আগ্রহ বিদ্যমান। অখণ্ড-সংহিতা গ্রন্থের পূণর্মুদ্রণে বিলম্ব হওয়ায় আমরা জনসমাজে এই মহাগ্রন্থের চাহিদার প্রকৃত রূপটি জানিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইলাম।

অখণ্ড-সংহিতা মহাগ্রন্থের মুদ্রিত পুস্তক ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া অভাব সৃষ্টি হইবার আর একটি প্রধান কারণ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির মানসকন্যা পরমপূজনীয়া সংঘমাতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীশ্রীসাধনা দেবীর শ্রীদেহের মহাপ্রয়াণ জনিত অনুপস্থিতি এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির মানসপুত্র পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীভাইদা—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারীজীর শ্রীদেহের অসুস্থতা। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশে এই

দুই কর্মযোগী মহৎ ব্যক্তিত্ব অনুকরণীয় আনুগত্য লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির অমূল্য গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ, প্রকাশন, অনুবাদ ও বিতরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া এই সুমহৎ দায়িত্বটি সুনিপুণ ভাবে ও অব্যাহত ভাবে পালন করিয়াছেন। অখণ্ড-সঙ্ঘের এই দুই মহাস্তম্ভ শ্রীশ্রীবাবামণির দুইটি বাহু শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশ-আদেশ অনুযায়ী সমস্ত জীবন ধরিয়া নিরহঙ্কার চিত্তে নীরবে আত্মোৎ-সর্গ করিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীবাবামণির অমৃত বাণীময় গ্রন্থরাজী মুদ্রিত, প্রকাশিত ও বিতরিত হইয়া আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির বাণী বিভিন্ন স্থান হইতে সঙ্কলন, উহা অখণ্ড-সংহিতা গ্রন্থরূপে মুদ্রণের ও প্রকাশনের অনুমতি গ্রহণ এবং প্রকাশন এই দুইজনের নিষ্ঠার, আনুগত্যের ও পরিশ্রমের ফল। শ্রীশ্রীবাবামণির গ্রন্থরাজীর সাময়িক অভাব এই দুই মহা ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব নূতন করিয়া উপলব্ধি করাইল। পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীভাইদা তাঁহার শ্রীদেহের অসুস্থতা লইয়া বর্ত্তমানে বিরানব্বই বৎসর বয়সেও শ্রীগুরুকৃপায় ও যোগসিদ্ধ শক্তিবলে প্রুফ দেখিতেছেন এবং গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশনে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য ও পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

আজিকার সর্ব্বজন কথিত বিষাদসূচক নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে "অখণ্ড-সংহিতা" মহাগ্রন্থের অসাধারণ চাহিদা পরমারাধ্য



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

——ঃ (*) ঃ——

শিলমান্দী (ঢাকা)
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অদ্য প্রাতে সাড়ে সাতটায় জিনারদী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। শিলমান্দী গ্রাম-নিবাসী কয়েকজন ভদ্র ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ইতঃপূর্ব্বে

শ্রীশ্রীবাবামণিকে দর্শন করেন নাই। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী সহ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেও তাঁহারা প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হইলেন না। গৈরিক নাই, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, সাধু বলিয়া চেনা যাইবে কি করিয়া?

কোথা হইতে আসিয়াছি

কিন্তু অভ্যর্থনার্থ আগত সজ্জনদের মধ্যে একজনের সন্ধানী চক্ষু শ্রীশ্রীবাবামণিকে ধরাইয়া দিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—আপনি কি পুপুন্‌কী আশ্রম থেকে আস্‌ছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অত কাছ থেকে আসিনি বাছা, পুপুন্‌কী ত' মাত্র কয়েক শত মাইল দূর, আমি এমন স্থান থেকে এসেছি, অনন্ত কোটি যোজন যার নাগাল পায় না, অথচ একটী ইঞ্চির এক কোটি ভাগের এক ভাগ ব্যবধানও যে সয় না।

সকলে ভক্তিগদগদ চিত্তে আভূমি প্রণত হইলেন।

সুরবালা দেবী

অপরিচিত স্থানে শিলমান্দী গ্রামে একটীও পূর্ব্বপরিচিত নাই, তবু তিনি চলিয়াছেন গ্রামবাসীদের সমবেত আমন্ত্রণে নয়, পরন্তু একটীমাত্র পল্লীবাসিনী ব্যাকুল-হৃদয়া প্রৌঢ়া মহিলার আহ্বানে। ইনি হইতেছেন, ভগিনী সুরবালা পাল। সুর-দিদি

শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত "বিধবার জীবন-যজ্ঞ" গ্রন্থ কোন বান্ধবীর নিকট হইতে আনিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থের উপদেশ-সমূহ তাঁহার বৈধব্য-দগ্ধ প্রাণে শান্তির শীতল প্রলেপ লাগাইয়া অশান্ত-অধীর ব্যথিত চিত্তকে শান্তি দিয়াছে। দূর-দূরান্তরে যাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শনের তাঁহার ক্ষমতা নাই, তাই বারংবার ব্যাকুল প্রাণে শ্রীশ্রীবাবামণিকে তাঁহার পল্লী-কুটীরে আসিয়া পদধূলি ও দর্শন দানের জন্য তিনি সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আজ ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীশ্রীবাবামণি শিলমান্দী আসিয়াছেন।

শিলমান্দীতে শ্রীশ্রীবাবামণির নামে কতকগুলি পত্র পূর্ব্বেই আসিয়া জমিয়াছিল। অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রধানতঃ এই পত্রগুলির উত্তরদানেই অতিবাহিত করিলেন।

ব্যর্থ জীবন-নাট্য

কুমিল্লা-কান্দিরপাড়-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাওয়া আর আসা, ইহা জগতের এক অপূর্ব্ব নাট্য জানিও। চলিয়া যাইবার কালে উহা ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত নাট্য আর ফিরিয়া আসিবার কালে উহা কমেডি বা মিলনান্ত নাট্য। কিন্তু এ নাট্য সর্ব্বাবস্থাতেই ব্যর্থ, যদি ইহার চরম পরিসমাপ্তি না হয় সম্যক্ ভগবানে আত্মসমর্পণে।"

ভগবানের উপর আদেশ-জারি

কুমিল্লা-ফান্দাউক-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া জানিবে। নিজেকে তাঁহার প্রভুর আসনে উপবিষ্ট করাইয়া তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁহার উপরে আদেশ জারী করিও না। তাঁহার নিকটে প্রাণের আকুল প্রার্থনা করিবারই তোমার অধিকার জানিও।"

বিভিন্ন মতের কর্ম্মি-দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান

পূর্ব্বধলা (ময়মনসিংহ)-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতের অনুবর্ত্তী কর্ম্মীদের লইয়া কোনও প্রতিষ্ঠান গড়া অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটী যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইবে, তাহা ভিন্ন-ধর্ম্মমতাবলম্বী সহকর্ম্মীদের সকলের নিকট-ই এক হওয়া দরকার। প্রতিষ্ঠানের বিপদ কোথায় জান? উহা হইতেছে, সহকর্ম্মীদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যের মধ্যে। ব্যক্তিত্ববুদ্ধিবর্জ্জিত কর্ম্মী মিলিলে কোনও অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠানের কোনও ভয় নাই। যেই স্থানটুকুতে বা বিষয়টুকু লইয়া সহকর্ম্মীদের মধ্যে পরস্পরের মতের অমিল আছে, সেই স্থানটুকু বা বিষয়টুকু

সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত করিয়া যদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে গঠিত ও রক্ষিত করা সম্ভব হয়, একমাত্র তাহা হইলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তী কর্ম্মীদের নিয়া কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালন সম্ভব হইতে পারে। একই মুসলমান নামে পরিচিত শিয়া এবং সুন্নীরা এমন কোনও প্রতিষ্ঠানে একত্র হইয়া কাজ করিতে সমর্থ কি না সন্দেহ, যে প্রতিষ্ঠানে হজরত আলীর আধ্যাত্মিক মূল্যকে বিচার করিবার প্রয়োজন আছে; কারণ, সুন্নীরা হজরত আলীকে দীন-ইস্‌লামের প্রচার-সংসারে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, বা যে শ্রদ্ধা দিয়া থাকেন, শিয়াদের দৃষ্টির ভঙ্গী তাহা অপেক্ষা পৃথক্ এবং শ্রদ্ধার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ। একই হিন্দু নামে পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং প্রবর্ত্তক আশ্রমের কর্ম্মীদের এমন কোনও প্রতিষ্ঠানে একত্র হইয়া কাজ করাও তেমনই সুকঠিন, যে প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত তিনটী সঙ্ঘের আদর্শ-পুরুষ কিম্বা প্রতিষ্ঠাতাদের পরস্পরের আধ্যাত্মিক উচ্চতাকে তুলনা করিয়া বিচার করিবার প্রয়োজন আসিতে পারে। কিন্তু অমুসলমান মাত্রকেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, কিম্বা মুসলমান মাত্রেরই অনাথ সন্তানদিগকে পালন করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, অথবা মুসলমান মাত্রকেই কোরাণ-শাস্ত্রে পারদর্শী করিবার ব্যবস্থার জন্য যদি কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সহকর্ম্মীদের মধ্যে কে শিয়া বা

কে সুন্নী, এই প্রশ্ন উঠিবার প্রয়োজন পড়ে না। ঠিক্ তেমনি অহিন্দু-মাত্রকেই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যদি কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, কিম্বা উচ্চনীচের ভেদাভেদবুদ্ধির প্রাচুর্য্য হ্রাস করিয়া হিন্দু মাত্রেরই ভিতরে সমত্ববোধ ও মমত্ববোধ জাগরিত করিবার জন্য যদি কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, অথবা নির্য্যাতিতা, ধর্ষিতা, বলাৎকৃতা ও অপহৃতা, অবমানিতা, অত্যাচারিতা হিন্দু রমণীকে উদ্ধারের জন্য যদি কোনও প্রতিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সহকর্ম্মীদের মধ্যে কে কোন্ সঙ্ঘের, কোন্ আশ্রমের বা মঠের প্রভাবাধীন কর্ম্মী, ইহা লইয়া কোনও সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। আবার হিন্দু বা মুসলমান, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পর্কে স্বকীয় উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ না করিয়া নিখিল মানবজাতির সকল জাতি, সকল বর্ণ, সকল সম্প্রদায়, সকল শ্রেণী ও সকল পংক্তির হিতকামনায় যদি কোনও প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-সাধক কর্ম্মীদের মধ্যে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীষ্টান, কে বৌদ্ধ, এই প্রশ্নও অবান্তর হইয়া পড়ে। উদ্দেশ্যের ভিতরে যদি থাকে কলহের উপাদান, তাহা হইলেই বিভ্রাট। সুতরাং যাহাদের লইয়া প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহ, তাহাদের সকলের পক্ষে গ্রহণীয় উদ্দেশ্যকে আগে গ্রহণ কর।

"ভিন্ন ভিন্ন মতের লোককে লইয়া ত' প্রতিষ্ঠান গড়িতে

চাহিতেছ, কিন্তু প্রত্যেকটী ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া চলিবে, গৃহীত আদর্শের প্রতি পরম আনুগত্য লইয়া একমাত্র সেবাবুদ্ধির সম্বলেই পাদচারণ করিবে, ইহা কি প্রত্যেকে সঙ্কল্প করিয়া লইয়াছ? সেবাবুদ্ধিই যেখানে প্রতি কার্য্যের নিয়ামিকা, সেখানে বিপদের ভয় বিন্দুমাত্রও নাই।"

প্রকৃত পাষণ্ডতা

মেদিনীপুর-দাসপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হরি-বিমুখতাই প্রকৃত পাষণ্ডতা। অন্যবিধ পাষণ্ডতা শুধু ভগবদ্-বিমুখতারই ফল মাত্র।"

দুর্ব্বল মানব-জাতির বান্ধবেরা

উমেদপুর (ফরিদপুর)-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুর্ব্বল মানবজাতির শত শত বান্ধবই এই জগতে আবির্ভূত হইতেছেন এবং নিজ নিজ মতকেই শ্রেষ্ঠ ও পরম বলিয়া প্রচার করিয়া দুর্ব্বল মানবজাতিকে বঞ্চনার হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহারা শত শত ভিন্ন মতের ও ভিন্ন পথের তীব্র সমালোচনা ও নিদারুণ অপবাদ করিয়া প্রচলিত অপধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ

করিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু হায়, নিজেরাও যে নিজেদের অজ্ঞাতসারে জগৎকে অল্পাধিক প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, সেই দিকে কণামাত্র লক্ষ্যও রাখেন নাই।"

কর্ম্মীর অহমিকা

হাওড়া-রিষড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কর্ম্মবীর হইতে গেলে অনেক সময়ে অহমিকাও আসে। বিশ্ব-সেবার নাম করিয়া অনেক সময়ে আমরা বিশ্বভোগ করিবার উদ্যমও করি। পার্থিব চিন্তা অধিকাংশ সময়ে অশান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে কর্ম্মের নাম করিয়া ঈশ্বরবিমুখও করে, ভক্তিরও এরূপ অহমিকা আছে এবং ভক্তির আত্যন্তিক অভিনয় অভক্তির উদ্রেকও করে। জ্ঞানেরও অহমিকা আছে, তাহা অজ্ঞান সৃষ্টি করে।"

সংযম ও সভ্যতা

যশোহর-বিনোদপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবমণি লিখিলেন,—

"সভ্যতার নামে ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণই শুধু হইতেছে, 'কাল্চারে'র নামে 'বার্ণিশ'-করা উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রসার পাইতেছে,—এ সভ্যতা কয়দিন টিকিবে? সভ্যতার সেবকেরা

অধম বর্ব্বরের নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধরিয়া পরস্পর পরস্পরকে হনন করিয়া একে অন্যের সমাধি-গহ্বর খনন করিবে। জ্ঞান-সমুজ্জ্বল বিজ্ঞান অজ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা সৃজন করিয়া বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া নিরীহ প্রাণীদের প্রাণ বধ করিয়া মাতালের মত নির্ব্বোধ অট্টহাস্য হাসিবে, সপ্ততল প্রাসাদের চূড়া হইতে ভিত্তি পর্য্যন্ত অতিকায় কামানের গোলাবর্ষণে উৎক্ষিপ্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং উৎপাটিত করিয়া বীরত্বের মূঢ় গর্ব্বে বাহবাস্ফোটন করিবে। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-সুখকাতরতার জাতিগত এবং জগদ্গত ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। ইহা বিচারে, দূরদৃষ্টি এবং যুক্তিবোধের বলে অনুভব করতঃ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনকে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথানুবর্ত্তী হও। সংযমের পথেই জগতে শান্তি আসিবে।"

কে কাহার জন্য

ঢাকা-হলদিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবান কি তোমার কামনা, বাসনা, লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য রহিয়াছেন, না, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রীতি দান করিবার জন্যই তুমি রহিয়াছ? কথাটী গভীর ভাবে চিন্তা কর। তিনি কি প্রতিনিয়ত তোমার প্রার্থনা ও অভিপ্রায়

পূরণার্থে বা তোমার আদেশ পালনার্থে মোতায়েন থাকিবেন, না, সর্ব্বজীব নিখিল শক্তিতে তাঁরই প্রীতি সম্পাদনের জন্য অনুক্ষণ অনুধাবণ করিবে? ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী কি হইবে, তাহার উপরেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতা অবধারিত হইবে। যে নিজের সুখের পরিতুষ্টিকে এবং নিজের কামের পরিতুষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া ভগবানের স্মরণ, মনন করে, তার ধর্ম্মও আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু ভগবৎ-প্রীতির পানে তাকাইয়া নিজের সুখসন্ধানকে বিসর্জ্জন দিয়া যে ধর্ম্ম-বোধের উদ্দীপ্তি, তাহার সহিত উহার কোনও তুলনা করিতে চেষ্টা করাও মূঢ়তা।"

ঐকান্তিকতা

ঢাকা-হাসাইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঐকান্তিকতার মানে একটি সত্যে নিজেকে সমর্পণ করা, একটি বিষয়ে প্রেমকে ঢালিয়া দেওয়া, শত দিকে শত পথে প্রেম-প্রবাহকে বিগলিত হইতে না দেওয়া।"

ভগবৎ-পথে বিঘ্ন

ঢাকা-দুয়াল্লী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কামাতুর পুরুষ অভীষ্টা কামিনীর প্রাপ্তিপথে যদি বিঘ্নাহত হয়, তখন যেমন বাঞ্ছিত-সিদ্ধির জন্য অত্যধিক ব্যাকুল হইয়া উঠে, ভগবৎ প্রাপ্তির পথে যদি তোমার বিঘ্ন হয়, তবে তুমিও তদ্রূপ মরিয়া হইয়া উঠ। পর্ব্বতরাজিকে সমতল ভূমি জ্ঞান কর এবং লঙ্ঘন কর, উর্ম্মিমালী সমুদ্রকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া অতিক্রম কর, প্রলয়ের মৃত্যুন্মত্ত ঝটিকাবর্ত্তকে স্নিগ্ধ মলয়ের মৃদু হিল্লোল জ্ঞান করিয়া নিরুদ্বেগে গ্রহণ কর।"

বীর-পূজা

খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর-বনগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বীর-পূজার আবশ্যকতা আছে। মহৎকে যে সম্মান করে, সে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তুমি কৃষ্ণসেবা কর বলিয়াই মহাপুরুষ-পূজাকে দোষের মনে করিবে, ইহা অন্যায়। যতক্ষণ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান না সমুদিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব মাত্রেই সসীম বলিয়া গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সসীম ব্যক্তিটীর ভিতরেও এমন অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটিয়াছে, যাহা তোমাতে নাই বা থাকিলে নিতান্ত অস্ফুট ও নগণ্য ভাবে আছে। সুতরাং তাঁহাকে সম্মান দানের প্রয়োজন আছে। দেশনায়ক, সমাজসেবক বা চিন্তাজগতের কোনও মহারথকে সম্মান দান করিলে যদি তুমি তাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া

গালি দাও, তুমি যখন তোমার পরমারাধ্য পিতা, মাতা বা গুরুকে পূজা করিবে, তখন কি তাহা পৌত্তলিকতা বলিয়া গালি হইতে রেহাই পাইবে? তবে বীর-পূজার বিপদও আছে। বীরকে যদি তোমার পূজা অহঙ্কৃত করিয়া আত্মদৃষ্টিবর্জ্জিত দর্পীতে পরিণত করে, তবে এ পূজা বিপজ্জনক। উচ্ছ্বাস-বর্জ্জিত বীরপূজা, যাহা তোমার অন্তরের ভাণ্ডার করিবে নিত্য নব সৎপ্রেরণায় পরিপূর্ণ এবং যাহা পূজিতের ভিতরে করিবে নিত্য নবতর সদ্‌গুণ, সদুৎকর্ষ ও সদ্দৃষ্টান্তের সমাবেশ, সেই বীরপূজা দেশ, দশ ও সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ কুশলের পরিপোষক জানিও। বীরের অনুচিত চরিত্রাংশ নিজ জীবনে গ্রহণে প্ররোচিত হওয়া যদি হয় বীরপূজার অন্যতম পরিণাম, তাহা হইলে ইহা নিতান্তই বিপজ্জনক। সুতরাং বিচারপূর্ব্বক তাহার চরিত্রের গুণাংশের প্রতিই সম্ভ্রমোজ্জ্বল দৃষ্টি ও শ্রদ্ধানত চিত্তকে নিয়োজিত করা উচিত। মহৎকে অগ্রাহ্য করিয়া, উপেক্ষা করিয়া, অতি নগণ্য বা তোমারই সমকক্ষ আর একজন নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিয়া সম্মান প্রদর্শনে বিরত হইয়া একদিকে যেমন তোমরা নিজ চরিত্রে মহদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণের রুচি হারাইয়াছে, অপর দিকে পুনরায় ধন-জন-বলে বলীয়ান্ অবরিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান না দিয়া প্রকারান্তরে তাহার জীবনের অনর্হ ও অনার্য্যোচিত আচরণের অনুসরণে সর্ব্বসাধারণকে পরোক্ষ প্ররোচনা দিয়াছ। এতকাল তোমরা

কি করিয়াছ, তাহার বিচার উভয় দিক্ হইতেই করিও। ভবগান্ তোমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন দুইটী, সুতরাং এক চক্ষে কিছু দেখিও না।"

প্রকৃত হবিষ্যান্ন

কুমিল্লা-উরশীউড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হবিষ্যান্নের নাম করিয়া যাহা সেবন কর, যদি তাহা ভগবৎ প্রসাদ-রূপে সুবিনীত চিত্তে, সুনির্ম্মল মনে, সশ্রদ্ধ হৃদয়ে গৃহীত না হইল, তবে আর তাহাকে সাধারণ অমেধ্য-ভোজন হইতে পৃথক্ করিয়া মর্য্যাদা দিবার গুরুতর কি সঙ্গতি আছে?"

দীক্ষা, তাহার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত গুরুবাদ

দিনাজপুর জেলান্তর্গত মন্মথপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে লাভ করা, ভগবানকে জীবনের জীবন-রূপে পাওয়াই দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য। দীক্ষা ব্যতীতও ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু তদ্রূপ ক্ষেত্রে নিষ্ঠা কম থাকে বলিয়াই বিলম্ব ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষাহীনতার দরুণ বারংবার মত ও পথের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া দিগ্‌ভ্রম জন্মে।

পিতৃ-পিতামহের গুরু-বংশ হইতে দীক্ষা না লইয়া অন্য গুরুর কাছ হইতে দীক্ষা লইলে দোষ হয় না, তবে, যে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইবে, তিনিও যদি সর্ব্বপ্রকারে পিতৃ-পিতামহের গুরুর বা গুরু বংশাবতংসের সমান হন, তবে আর অন্যত্র যাইয়া কি লাভ হইল? যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান নরদেহে আমার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে আমার কাছ হইতে দীক্ষিত হইলে আমি নিজেকে তোমাদের গুরু বলিয়া ভাবিতে ও ভাবাইতে, বুঝিতে ও বুঝাইতে, চলিতে ও চালাইতে বাধ্য হইতেছি এবং হইব, কিন্তু আমার জীবদ্দশায় মৎপ্রেরিত কোনও সাধকের নিকটে বা আমার পার্থিব দেহের অবসানাবস্থায় মদাদর্শ-সেবক কোনও পরহিতকামীর নিকটে দীক্ষা নিলে দীক্ষাদাতা সর্ব্বপ্রকারে নিজ গুরুভাব বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে স্বকীয় কনিষ্ঠ ধর্ম্মভ্রাতা-রূপে গ্রহণ করিয়া একদিকে দীক্ষার নিষ্ঠাবর্দ্ধক উদ্দেশ্য অটুট রাখিবেন, অপর দিকে ব্যক্তিগত গুরুবাদের প্রসারজনিত সকল অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার প্রভাব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবেন। একই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াও গুরুরা কুলপরম্পরায় একই আদর্শকে প্রচার করেন নাই, ব্যক্তিগত প্রভুত্ব এবং খামখেয়ালী এক এক সময়ে এক এক প্রকারের মুদ্রাদোষ উৎপন্ন করিয়া একমন্ত্রের উপাসকদের ভিতরেই শত ভেদ শত ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণেই আমার নির্দ্দেশ পালিয়া চলিতে

হইলে আমার অনুসরণকারীরা নিজেরা দীক্ষাদাতা হইয়াও গুরুবোধকে নির্ব্যক্তিক করিয়া রাখিবে।"

পা-ছুঁইয়া প্রণাম

শ্রীহট্ট-হবিগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পা-ছুঁইয়া প্রণামের কাড়াকাড়িটা আমার কাছে অসহ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক যেমন যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু-বরণ করে, তোমরাও তেমন যে যেখানে আছ, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হও। প্রণামের যৌগিক মানে ভ্রূমধ্যে মনঃস্থৈর্য্যের বিধান করা, আধ্যাত্মিক মানে একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা এবং আত্মাভিমানের সম্যক্ বিনাশ-সাধন পূর্ব্বক চরম সত্যের চরণে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া। প্রণম্যব্যক্তি যখন সমগ্র মনটা একাগ্র করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তখন তাঁহার মনটী থাকে তাঁর ভ্রূমধ্যে। এই সময়ে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলে তোমারই ত' ক্ষতি!

উৎসবের লক্ষ্য

কুমিল্লা রহিমপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে কোনও বিশিষ্ট বারে বা তিথিতে তোমরা

উৎসবানুষ্ঠান করিতে পার। কিন্তু মনে রাখিও, প্রত্যেকটী উৎসবের মূলে যদি একটি বাস্তব সত্যের অকপট অনুসরণ থাকে, সুগভীর অর্থ থাকে, প্রাণ থাকে, তাহা হইলেই উহা নিরর্থক লোক-প্রদর্শনীতে পরিণত না হইয়া সার্থক-নামা হয়। কুর্দ্দন আর কোলাহল, জনতা আর হট্টগোল, চিৎকার আর খিচুড়ী-প্রসাদ,—ইহারই নাম উৎসব নহে।"

প্রচারের দুই দিক্

কুমিল্লা-বিরামপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রচারের সমর্থক এবং বিরোধী এই দ্বিবিধ লোকই জগতে আছেন। বাস্তবিকই মনে মনে জপ, নির্জ্জনে ধ্যান প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানকে প্রচারের রাজসিক হাঙ্গামা অপেক্ষা মঙ্গলজনক ও নিরাপদ মনে করা সঙ্গত। কেন না, প্রচারের ব্যাপারটা অল্পাধিক বহির্ম্মুখতার প্রশ্রয়দাতা। অবশ্য, হিমালয়-গুহায় বসিয়া তীব্র ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করিলে তাহার ফলে বিনা বহির্ম্মুখ প্রচারে সহস্র ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে এবং আমি সেইরূপ সূক্ষ্ম প্রচারেরই সমধিক সমর্থক ও একান্ত অনুরাগী। আমি জানি, বাহিরে কথা কহিয়া, পত্র লিখিয়া, বক্তৃতা দিয়া আর উপদেশ বিতরণ করিয়া যে সংশয়চ্ছেদন করিতেছি, আমার তপোরত-মন এসব না করিয়া ততোধিক করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহা করিবে।

ইহাও স্বীকার্য্য যে, স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অপরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা ব্যতীতই জীবমাত্রের অন্তরে ক্রমশঃ জাগরিত হইবে এবং স্বতো-বিকশিত হইয়া বিমল জ্যোতি বিকিরণ করিতে থাকিবে। কিন্তু তথাপি স্থল বুঝিয়া, পাত্র বুঝিয়া, যুগ বুঝিয়া, দেশ বুঝিয়া, প্রচারেরও আবশ্যকতা আছে।"

গুরুগিরির উভয় সঙ্কট

কুমিল্লা বাজাপ্তি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেহ যদি গুরুগিরি না করেন, তাহা হইলে এক শ্রেণীর ত্রাণেচ্ছু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের পথ কন্টকাকীর্ণ হইয়া থাকে। আবার যিনি গুরুগিরি করেন, তিনি ক্রমশঃ নিজ আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠান হইতে স্খলিত হইয়া পতিতই হইতে থাকেন। ইহা গুরুগিরির এক নিদারুণ সঙ্কট। এই কারণে আমার অনুবর্ত্তিগণ সর্ব্বপ্রকার গুরু-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আমার ধর্ম্মকে প্রচার করিবেন এবং নিজেদের উপরে ব্যক্তিগত ভাবে যাহাতে নবদীক্ষিতেরা গুরুভাব আরোপ না করেন, তদ্রূপ ভাবে ধর্ম্মের প্রসার-সাধন করিবেন।"

সুবৃহৎ নেতৃত্বের বিকাশ

ময়মনসিংহ-পিংলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কতকগুলি ত্যাগী ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এবং ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে অপর সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আত্মবিলোপের ভিতর দিয়া জগতে বৃহত্তর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। গান্ধীজীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে ইহার কতক প্রমাণ পাইবে। তাঁহার চৌদিক বেড়িয়া এমন এক নক্ষত্র-মণ্ডলের পরিবেষ্টন সৃষ্টি হইয়াছে, যে মণ্ডলের যে কোনও একটী নক্ষত্র যে কোনও আকাশে একাকী জ্বলিলে নিজ ত্যাগ, চরিত্র এবং প্রতিভার দীপ্তিতে মহতের পূজা পাইতে পারিতেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির বিশিষ্টতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা না করিয়া আংশিক আত্ম-বিলোপের ভিতর দিয়া তাঁহারা এক অতীব আশ্চর্য্য নেতৃত্বের বিকাশ-পন্থা খুলিয়া দিলেন। গান্ধীজী যাহা হইয়াছেন বা ভবিষ্যতে হইবেন বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করি, তাহার সবটুকুরই কৃতিত্ব তাঁহারই বলিয়া মনে করিও না, পরন্তু একদল প্রায় সমকক্ষ ব্যক্তিরা যে নিজ নিজ সমকক্ষতার দাবীকে চাপিয়া রাখিয়া বা সমকক্ষতা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় বিরত হইয়া একমাত্র সেবাবুদ্ধিতে সহযোগ করিতেছেন এবং যেখানে মতভেদ অনিবার্য্য, সেই স্থানেও line of least resistance বা অল্পতম বিরোধের পথ খুঁজিয়া চলিতে পারিতেছেন বা চাহিতেছেন, ইহাই তাঁহার বিশ্ববিস্ময়কারী নেতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রধান কারণ। জগতে কত নেতা আসিবেন, কত নেতা যাইবেন, কিন্তু চিরকালই

এইরূপ বৃহত্তম নেতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন থাকিবে। তোমরা হয়ত চিন্তা করিবে রাজনীতির দিক্ দিয়া, আমরা হয়ত চিন্তা করিব ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া, কিন্তু সকল নীতির দিক্ হইতেই লোক-বিস্ময়সমুৎপাদক সুবিশাল নেতৃত্বের বিকাশের আবশ্যকতা রহিয়া যাইবে।"

বৃহৎ নেতৃত্বের অযোগ্যতা

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কিন্তু যেহেতু কতকগুলি প্রায়-তুল্যকক্ষ-ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মাভিমানকে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অংশতঃ বা পূর্ণতঃ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া নেতৃবিশেষের প্রতি কর্ম্মে প্রতি চেষ্টায় প্রতি আন্দোলনে প্রাণঢালা সহযোগ দিতেছে, সেই হেতু সহকর্ম্মিগণের মতের পার্থক্যের প্রতি সসম্মান দৃষ্টি রাখিব না, কেহ কোনও নূতন পথ বলিতে পারিলে তাহার কথা শুনিব না, কেহ কোনও নূতন মুহূর্ত্তের প্রতি অঙ্গুলীসঞ্চালন করিয়া ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সদ্ব্যবহার করিবার সুবুদ্ধি প্রদান করিলে তাহাকে নিতান্ত বালক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিব কিম্বা সে নিজ শক্তিবলে অসংখ্য মানবের মনে আশার আলোক সঞ্চারিত ও উৎসাহের আবেগ সঞ্চিত করিতে পারিলে ইহাকে মূল নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ বলিয়া ব্যাখ্যা দিব,—ইহা মহৎ নেতৃত্বের লক্ষণ

নহে। সময়ে বালক বা স্ত্রীলোক বা জড়বুদ্ধি মূর্খের কাছ হইতে যে যুগসন্ধিক্ষণের ইঙ্গিত আসে এবং সেইরূপ নিদারুণ ক্ষণে নিজের নেতৃত্বকে ধূলায় ধূসরিত করিয়া দিয়া নিঃসম্বল ভিখারীটাকেও রাজ-সিংহাসনে অভিষেক করিতে হয়, একথা যে জানে না, বুঝে না, তাহার বৃহৎ নেতৃত্বের অভিমান পরিণামে নিষ্ফলতা আহরণ করে। যিনি সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধ মত হইতে জন-জাতি-সেবার আনুকূল্য বাহির করিয়া নিতে পারেন, তিনিই নেতা।"

অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ব-প্রধান কর্ম্মী

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এক শ্রেণীর অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ব-প্রধান কর্ম্মী জগতে থাকেন, যাঁহারা একা একা নিজেরা উত্তম সেবক, উত্তম কর্ম্মী, উত্তম সাধু কিন্তু অপর সহকর্ম্মীর ছোঁয়াচ সহিতে পারেন না। যতস্থান হইতে যত সহকর্ম্মীই আসুক, ইঁহাদের নিকটে কেহই কাজের লোক নহে, কাহাকেও পছন্দে আসে না, কেহই নির্দ্দোষ বা নিষ্কলঙ্ক নয়। ভাল-মন্দ মিলিয়াই যে জগৎটা রহিয়াছে, এই কথাটা ইঁহারা ভুলিয়া যান এবং নিজেরা ইঁহারা কোথায় অসম্পূর্ণ, সেই বিষয়ে আত্ম-সমীক্ষা করিতে ইঁহারা বিরত থাকেন। পিপীলিকার বলও যে বল, আরসোলার শক্তিও যে শক্তি, কাণা খোঁড়া, অন্ধ, আতুর

প্রত্যেকের কাছ হইতেই যে অল্পাধিক সহযোগ প্রতি সৎ-কার্য্যে মিলিতে পারে এবং ছোট-বড়, পূর্ণ-অপূর্ণ, মহাবল-অল্পবল প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে সকলকে লইয়াই যে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে, এই কথা ইঁহারা বিস্মৃত হইয়া যান। গহন অরণ্যের দুর্গমতম দেশে প্রস্ফুটিত মহাসুগন্ধ ভূমি-চম্পকের কত ইঁহারা একাকী ফুটিয়া একাকী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়েন, ইঁহাদের আত্মাভিমান ও ব্যক্তিগত কৃতিত্ববোধ যতই তীব্র হউক না কেন, মহাপূজার আরাত্রিকে ইঁহাদের শঙ্খ বিধ্বনিত হয় না, ইঁহাদের ঘণ্টা নিক্বণিত হয় না, ইহাদের কাসর নিনাদিত হয় না, ইঁহাদের দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হয় না। আত্মসুখের বেলায় যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অতীব সর্ব্বনাশকর, জন-সেবা বা ভগবৎ-সেবার বেলায়ও এইরূপ ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অতীব নিষ্ফলতাজনক।"

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার পরিচয়

কুমিল্লা-বাঙ্গরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কতকগুলি মূর্খ লোক আছে, যাহারা নিজ নিজ গুরুদেবের বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা আদি মহাপুরুষের সম্পর্কে কতকগুলি আজগুবি ও অবিশ্বাস্য গল্প বলিয়া সাধারণ লোককে আকর্ষণ করতঃ নিজেদের ধর্ম্মগোষ্ঠীর সংখ্যাগত

পরিপুষ্টিবিধানে চেষ্টান্বিত হয়। তোমরা এই সকল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত কখনও অনুসরণ করিও না। মহৎ বা অমহৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই দুই চারিটা অলৌকিক এবং অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সাধারণ যুক্তি, দার্শনিক বুদ্ধি, বা বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা দ্বারা যাহার সমাধান হয় না। তোমার জীবনে হয় ত' এরূপ ব্যাপার দুইটা ঘটিয়াছে, আমার জীবনে হয় ত' দশটা ঘটিয়াছে। কিন্তু এইসব ব্যাপারে কখনও কোনও ধর্ম্মের মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হইবে ধর্ম্মাচরণকারী নরনারীর জীবনের পবিত্রতা, ত্যাগোজ্জ্বল সেবাবুদ্ধি, সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা, আত্মসুখে অপ্রীতি, সর্ব্বজীবের সুখে রতি, বহির্ম্মুখতা বর্জ্জিত কর্ত্তব্যপালন এবং বহির্ম্মুখ কর্ম্মেও অবিরাম অন্তর্ম্মুখতা অক্ষুণ্ণ ভাবে পরিরক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা। তোমরা এই উপায়েই তোমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় জগৎ-সমক্ষে দিও, আমার বা তোমাদের সম্পর্কে কতকগুলি কল্পিত বা দুই চারিটি বাস্তব অলৌকিক ঘটনার দোহাই দিয়া নহে। ধর্ম্মকে তোমরা বুজরুকের মাদুলী, ম্যাজিশিয়ানের ইন্দ্রজাল, ওঝা-ফকিরের তুক্‌তাক্ এবং স্থূল-তান্ত্রিকের মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণের নিকৃষ্ট পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিও না।"

সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি-বর্জ্জন ও সম্প্রীতি অর্জ্জন

অপরাহ্ণে বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ছাত্র ও ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি বর্জ্জনের প্রকৃত উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথমতঃ নিজ সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবলে, বাহুবলে, সাহসে, সামর্থ্যে, আর্থিক অবস্থায় ও নৈতিক উৎকর্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ক'রে গড়াই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি বর্জ্জন ক'রে চলার প্রধান উপায়। তৎপরে অপরাপর সম্প্রদায়ের অকপট আধ্যাত্মিক বুদ্ধি-প্রণোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ না করা হচ্ছে দ্বিতীয় উপায়। ধর্ম্মমাত্রই যে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সোপান, এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক প্রীতি অর্জ্জিত হয়। মানব মাত্রেই একই ভগবানের সন্তান এবং যে মতে বা যে পথেই চল না কেন, সৎকাজের ফল শুভ, অসৎকাজের ফল অশুভ, এই বিশ্বাসকে অন্তরে গভীর রূপে স্থাপিত ক'রে যখন প্রত্যেকটী ব্যক্তি জীবন যাপনে চেষ্টিত হয়, তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষ অপনা আপনি ক'মে যায়।

অন্তর্বিবাহ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী

প্রশ্ন হইল,—নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু আর নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের কৃষ্টি ও সংস্কারের স্তর প্রায় এক। উভয়ের মধ্যেই বিধবা-বিবাহও অল্প-বিস্তর প্রচলিত। এমতাবস্থায় নিম্নস্তরের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অবাধ অন্তর্বিবাহ প্রচলিত থাক্‌লে তা দ্বারা কি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধসমস্যার কিছু সমাধান হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাধান ত' হবেই না, বরঞ্চ আরও কতকগুলি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হবে। মুসলমান রাজত্বের আমলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এবং উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানে কতক কতক বৈবাহিক আদান প্রদান হয়েছিল। সম্প্রীতি স্থাপনের দিক্ দিয়ে তার বিশেষ কোনও সুফল সৃষ্ট হয় নি। হিন্দুর ছেলে যদি মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করে, তবে নিজের হিন্দু-পরিচয় রেখে বিবাহ কত্তে হ'লে তার পক্ষে মুসলমান-কন্যাকে শুদ্ধি ক'রে নিয়ে তবে বিবাহ কত্তে হবে। এরূপ বিবাহ শত শত হ'তে থাক্‌লে সংখ্যাহানির আশঙ্কায় মুসলমান সম্প্রদায়ে নিদারুণ বিক্ষোভ অনিবার্য্য। মুসলমানের ছেলে যদি হিন্দু-কন্যাকে বিবাহ করে, তাহ'লে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ অধিকারের বিষয় চিন্তা ক'রেই হিন্দু-কন্যাকে মুসলমান ধর্ম্মে অঙ্গীকার ক'রে নিতে হবে। স্ত্রীদের স্বাধীন সত্তা এবং পৃথক্ ব্যক্তিত্ব নিয়ে

তোমরা যতই কেন সস্তা বুলি আওড়াও না, বিবাহের পরে স্বভাবতই স্ত্রী তার পতির অনুবর্ত্তিনী হ'তে বাধ্য। বিদুষী এম্-এ, পি-আর-এস্ স্ত্রীর পক্ষেও একথা ততটা সত্য, বিদ্যাহীনা নিরক্ষরা গ্রাম্য-বালিকার পক্ষেও একথা যতটা সত্য। সুতরাং ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীকে কন্যাদান করার মানে যে নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা-শক্তির হ্রাস করা, একথা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিরাও বুঝ্‌বে। এই কারণেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরে অন্তর্বিবাহের প্রচলন সাম্প্রদায়িক মৈত্রীরই উপায় ব'লে গৃহীত হ'তে পারে না।

একজন মাত্র নেতা কর্ত্তৃক দেশোদ্ধার

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভারতবর্ষকে সর্ববপ্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক এবং রাষ্ট্রনৈতিক দুর্ভাগ্য হ'তে রক্ষা করার জন্য শীঘ্র কোনও নূতন নেতার আবির্ভাব কি আপনি সম্ভব মনে করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন বা কয়েকজন লোক, তাঁরা যত মহৎই হোন, আর যত বড়ই হোন, একটা জাতিকে উদ্ধার ক'রে দিতে পারেন, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তোমরা অন্তর থেকে উৎপাটিত ক'রে তু'লে ফেল। একজন বা দশজন বড় লোক মিলে দেশের দুর্ভাগ্য দূর ক'রে দেবেন,

আর সর্ব্বসাধারণে তন্দ্রালস চক্ষে ঝিমুতে ঝিমুতে তাঁদের সংগৃহীত অমৃতফলের আস্বাদন কর্ব্বে, এই ভ্রম মন থেকে দূর ক'রে দাও। সহস্র সহস্র একচিত্ত ব্যক্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এসে নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই সহস্র সহস্র ব্যক্তির আত্মত্যাগ-যজ্ঞের সমিধ-রূপে নিজেকে পরিণত ক'রে এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃত্বের বল্গা ধারণ করেন। যে জাতি সমগ্রতঃ প্রস্তুত নয়, যে জাতি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আত্মগঠন ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা সঞ্চার কত্তে পারে নাই, সেই জাতিকে হঠাৎ এসে একজন মস্ত বড় নেতা হঠাৎ কাঁধে তুলে নিয়ে হিমালয় শৃঙ্গ পার ক'রে স্বর্গলোকে টিপ ক'রে নিয়ে ফেলে দিয়ে চিরসৌভাগ্য আর অনন্ত যৌবনের অধিকারী ক'রে দেবেন, এরূপ ধারণা নিতান্তই অবিজ্ঞোচিত। অদৃষ্টবিশ্বাসী, অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর দেশবাসী তোমার এরূপ অবিজ্ঞোচিত মনোভাব হৃদয়ে পোষণ কত্তে পারে। এটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের কর্ত্তব্য এই মনোভাবকে দূর ক'রে দেওয়ার জন্য কার্য্যকর পন্থা গ্রহণ করা। প্রত্যেকটী মানবাত্মার নিকটে সেবাব্রতের আহ্বান পৌঁছাতে হবে এবং কর্ম্মযজ্ঞের আহুতিমন্ত্র প্রত্যেকের কাণে কাণে মন্ত্রিত কত্তে হবে। প্রত্যেকের প্রাণের বীণায় অভ্যুদয়ের দীপক রাগের আলাপ জাগাতে হবে, গমকে গমকে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় শতাব্দীর সুপ্ত চেতনাকে সন্দীপিত ক'রে তুলতে হবে। এর ভিতর দিয়ে শত শত নেতৃত্বশক্তি-বিশিষ্ট

মহামানবের যুগপৎ আবির্ভাব সম্ভব হবে এবং একদা এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে সকলের বা অধিকাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগের ভিতর দিয়ে দীর্ঘদিনের জড়তা একদিনে ঘুচে গিয়ে অনাদৃত, অবজ্ঞাত, অপাংক্তেয় জাতি জগতের জয়-সমারোহী জাতিপুঞ্জের পুরোভাগে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে অপরাজেয় পৌরুষের জয় টীকা ধারণ ক'রে দাঁড়াবে।

ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ-প্রাপ্তির পার্থক্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ-প্রাপ্তি জিনিষ দুটীর পার্থক্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রেমই প্রাপ্তি, যোগই মিলন। ভগবানকে ভালবাসাই ভগবানকে পাওয়া, ভগবানকে পাওয়াই ভগবানকে ভালবাসা। যাকে না পাওয়া যায়, তাকে ভালবাসা যায় না; যাকে ভাল না বাসা যায়, তাকে পাওয়া যায় না। যাকে পরিপূর্ণ রূপে ভালবাসা যায়, তাকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া হ'ল; যাকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তাকে পরিপূর্ণরূপে ভালবাসা হ'ল। তাঁর আর আমার পৃথক্ অস্তিত্বকে কল্পনা ক'রে সুখময় ভাবের আদান-প্রদান-ঘটিত যে দিব্য-অনুভূতি, তার নাম প্রেম; আর, তাঁর আর আমার পৃথক্ অস্তিত্বকে কল্পনার বাইরে রখে যে নিত্যসান্নিধ্য ও অভিন্ন-ভাবের যে অনুভূতি, তার নাম প্রাপ্তি। স্বরূপতঃ

পার্থক্য কিছুই নেই, যত পার্থক্য মানবীয় ভাষায় আর সম্প্রদায়গত মতামতে।

মুক্তি এবং নিত্যপ্রেম

প্রশ্নকর্ত্তা।—জীবের মুক্তি এবং ভগবানে নিত্যপ্রেম এই দুই বস্তুতে পার্থক্য কি?

শ্রীশ্রীবাবাণি বলিলেন,—ঐ একই পার্থক্য অর্থাৎ পার্থক্য শুধু কথার, শুধু ভাষার, অবস্থাগত পার্থক্য কিছুই নেই। নিত্য-প্রেমই মুক্তি, মুক্তিই নিত্যপ্রেম। মানুষের অসম্পূর্ণ ভাষায় এই চরম ও পরম অবস্থাকে বুঝাতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকেরা মুক্তিতে আর নিত্যপ্রেমে যত পার্থক্যের প্রকটনই ক'রে থাকুন, সবই পণ্ডশ্রম, কেন না, এই দুই অবস্থা এক এবং অভিন্ন।

মুক্তপুরুষের লক্ষণ

প্রশ্নকর্ত্তা—মুক্তপুরুষের লক্ষণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তিনি নিত্য-প্রেম-রস-রসিক। এইটীই তাঁর প্রকৃত লক্ষণ।

জ্ঞানে ও প্রেমে কলহ

প্রশ্নকর্ত্তা।—বৈষ্ণব আচার্য্যেরা অদ্বৈতবাদীদিগকে ভগবদ্-বহির্ম্মুখ ব'লে আখ্যা দেন, আর অদ্বৈতপন্থীরা বৈষ্ণবদিগকে

ভাবপ্রবণ কল্পনাবিলাসী ব'লে মনে করেন। এই দুইটি ভিন্ন ধারণার মধ্যে কোনটী প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটীও নয়। প্রেমিকের যা লক্ষ্য, জ্ঞানীরও তাই লক্ষ্য। প্রেমিকের যা গতি, জ্ঞানীরও তাই গতি। প্রেমিকের যেখানে পূর্ণতা, জ্ঞানীরও সেখানেই পূর্ণতা। নিরর্থক কতকগুলি দার্শনিকতার কচকচি মাঝখানে জুটে এবং ব্যক্তিগত রুচির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভূরি ভূরি সংস্কৃত বচন সৃষ্ট হ'য়ে জ্ঞানে আর প্রেমে একটা কলহ পত্তন করেছে। তোমাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। একাগ্র মনে নিরপেক্ষ চিত্তে অবিরাম সাধন ক'রে যাও, দেখ্‌বে জ্ঞান আর প্রেম যুগপৎ আবির্ভূত হ'য়ে অভিন্ন সত্তায় তোমার আস্বাদনগম্য হচ্ছে।

শিলমান্দী (ঢাকা)
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

বেলা সাড়ে নয় ঘটিকায় ভগিনী শ্রীযুক্তা সুরবালা পাল, তাঁহার ভক্তিমতী কন্যা আশালতা দত্ত, জামাতা অশ্বিনীকুমার এবং প্রফুল্লবালা প্রভৃতির দীক্ষা হইল।

নামই একান্ত শরণ

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শত যোজন দূর থেকেই আমি তোমাদের প্রাণে ঈশ্বর-ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত করব এবং শ্রীভগবানের প্রভাব ও উপস্থিতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অনুভব

করাব। আমার এই প্রতিশ্রুতিতে তোমরা বিশ্বাস রাখ। বাহিরের সহস্র মত সহস্র পথ তোমাদের নানা দিকে আকর্ষণ কত্তে চাইলেও তোমরা গৃহীত সাধনের প্রতি নিষ্ঠাকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হ'তে দিও না। জোর ক'রে নামে লেগে থাকবে। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, ইষ্টে, অনিষ্টে, উত্থানে, পতনে, মানে, অপমানে, নিন্দায়, প্রশংসায়, লাভে, ক্ষতিতে, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় অমৃতময় নামকে ইহপর জীবনের একমাত্র আশ্রয় ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে। অখণ্ড-নাম, তোমার জীবনের সম্বল, মরণের আশ্রয়, সৌভাগ্যের সহায়, দুর্ভাগ্যের অবলম্বন, উন্নতির প্রসারক, অবনতির রোধক। নামকে তোমাদের পরম শরণ, পরম তারণ, পরম পাবন ব'লে গ্রহণ কর।

ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বলাভ এই ওঙ্কারের সাধন ক'রে, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্বলাভ এই ওঙ্কারের সাধন ক'রে, শিবের শিবপদপ্রাপ্তি এই ওঙ্কারেরই সাধনা ক'রে। ইন্দ্র, যম, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ একমাত্র ওঙ্কারেরই সাধন ক'রে নিজ নিজ দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। সেই দিন এ জগতে অন্য কোনও সাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের আবির্ভাবই হয় নাই। ভারতের পরবশ্যতার যুগে, শক, গ্রীক, হূণ, পারদ, মোগল এবং পাঠান প্রভৃতি ম্লেচ্ছদের দাসত্বের

কালে যে সকল সাম্প্রদায়িক বীজের উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল, তাদের প্রতি তোমাদের ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নাই। যে মহামন্ত্রের সাধন ক'রে প্রাচীন আর্য্যঋষিরা বেদের সত্য সাক্ষাৎ করেছেন, যে মহামন্ত্রের সাধনের বলে তাঁরা জগদ্‌গুরুর আসন অধিকার করেছিলেন, যে মহামন্ত্র সেবায় বিমুখ হ'য়ে ভারতের জগদ্‌গুরুত্বের দাবী ধূলায় অবলুণ্ঠিত হ'য়ে গেল, সেই মহামন্ত্রের সাধন করার কালে তোমরা তোমাদের মনে কোনো কুণ্ঠার, কোন দ্বন্দ্বের, কোনো দ্বিধার ছন্দাংশ মাত্রও রেখ না। প্রাচীন ঋষিদের প্রাচীনতম ধর্ম্ম প্রাচীনতম সত্য আজ তোমাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ কচ্ছে। কোনও পরবর্ত্তি-মতাবলম্বীদের সমালোচনায় তোমাদের টলবার প্রয়োজন নেই।

দুই কর্ণে মন্ত্রদানের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি তোমাদের দুই কর্ণেই এক অখণ্ড-মহানামকে শুনিয়েছি। একথা শুনতে পেলে গ্রাম্য গোস্বামী-প্রভুরা নিশ্চয়ই তোমাদের সমালোচনা করবেন। তাঁরা বল্‌বেন,—এক কর্ণে দীক্ষামন্ত্র দিতে হয়, অপর কর্ণে শিক্ষামন্ত্র দিতে হয়। এই হচ্ছে তাঁদের শাস্ত্রের প্রমাণ এবং শাসন। আমরা কিন্তু একটা পাঁঠার দুই দেবতার কাছে দুইবার বলিদান মানি না, একটা নারীর যুগপৎ দুই পতির সেবা

বুঝি না, একই ব্যক্তির দ্বারা দুই মন্ত্রের সাধন হিতকর বা প্রয়োজন ব'লে জ্ঞান করি না। একই মন্ত্রের সাধন ক'রে জীবনপাত কর, একই মন্ত্রের মর্ম্মভেদ ক'রে পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কর,—এই হ'ল আমাদের লক্ষ্য, আদর্শ ও চেষ্টা। বহুমন্ত্র, বহু দেবতা, বহু গুরু, বহু পূজা এবং বহুবিচরণকারী মন আমরা চাই না। বাইরে যেমন তোমার দুইটী কর্ণ আছে, অন্তরে তেমন তোমার আর একটী কর্ণ আছে। তোমরা লোকমুখে তৃতীয় নয়নের কথা শুনেছ, এই রকম একটী তৃতীয় শ্রবণও আছে। একই মন্ত্র দুই কর্ণে শ্রবণ করবার তাৎপর্য্য এই যে, এখন থেকে প্রাণপণ সাধন ক'রে তৃতীয় কর্ণে নামের অমৃতমধুর ধ্বনি শোন্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তৃতীয় শ্রবণে যেদিন নাম শ্রবণ করবে, সেদিন নিখিল ভুবনের মত-পথের দ্বন্দ্ব সহজে মিটে যাবে।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি খানকয়েক পত্র লিখিলেন।

শিলমান্দীর বক্তৃতা

অপরাহ্ণে একটী জনসভার অনুষ্ঠান হইল। হিন্দু ও মুসলমান সর্ব্ব শ্রেণীর সজ্জনেরা সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি কতকগুলি যৌগিক আসন-মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং বংশানুক্রমিকতার উন্নতি সম্বন্ধে আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কিন্তু ধারাবাহিক কোনও নোট রাখা হয় নাই। জিনারদী হাইস্কুলের

কোনও ছাত্র মাঝে মাঝে দুই একটী কথা টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, ইহার ভিতর হইতে বক্তৃতাকালে নির্গত অনেক ভাল ভাল কথাই সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

জাতির উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে শক্তি, সামর্থ্য, বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য, আয়ু ও পটুতার পূঁজি নিয়ে বর্ত্তমানের শিশুরা ঘরে ঘরে পিতামাতার সন্তান হ'য়ে আবির্ভূত হচ্ছে, সেই পূঁজিকে বাড়িয়ে দেওয়ার উপায়ই হচ্ছে জাতির উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। শুধু অত্যুত্তম পিতার সঙ্গে অত্যুত্তম মাতার সম্মিলনকে সম্ভব করাই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হবে না, অত্যুত্তম পিতা এবং অত্যুত্তম মাতা উভয়ে যেন অত্যুত্তম সমাজে, অত্যুত্তম পরিবেষ্টনীতে, অত্যুত্তম অভ্যাস ও অনুশীলনের ভিতর দিয়ে, জীবন-যাপন ক'রে অত্যুত্তম ভাবে নিজেদের পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদগুলি সন্তানেতে সংক্রামিত ক'রে দিতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করা চাই। অত্যুত্তম মাতা অত্যুত্তম পিতাকে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ-প্রাপ্তির উপায়-রূপে গ্রহণ কর্ল্লে অত্যুত্তম সন্তান আসে না। অত্যুত্তম পিতা অত্যুত্তম মাতাকে নিজ

ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার কর্ল্লেও অত্যুত্তম সন্তান আসে না। পিতামাতার সন্তান-জননের প্রয়াসের পশ্চাতে অত্যুত্তম প্রবৃত্তির বর্ত্তমানতা থাকা চাই। ইন্দ্রিয়গত মিলন ছাড়া যে সন্তানের আবির্ভাব হবে না, এইটী সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের লোভকে দমিয়ে রেখে বিশ্বজিৎ, লোককল্যাণকৃৎ, সর্ব্বজীবপাপহৃৎ সন্তানকে লাভের মহদুদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে যে ইন্দ্রিয়গত মিলন, তার ফল ভবিষ্যৎ বংশধরের পক্ষে সুনিশ্চিত রূপে শক্তি-সামর্থ্যবর্দ্ধক। জীবনের পরিপূর্ণ সামর্থ্যের সময়ে যে পুত্রকন্যা জাত হবে, তারা যে সহজেই বলপুষ্টির মূলধন কিছু বেশী নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে, একথা বোঝাবার জন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। ঘরে যারা দুটা একটা গরু, ছাগল বা ভেড়া পালন করে, তারাও একথা বুঝ্‌তে পারে। এই জন্যই মহর্ষি সুশ্রুত বল্‌ছেন,—"তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ,"—অর্থাৎ এই কারণেই অতি কচি বয়সের মেয়েদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করাবে না। কিন্তু গর্ভগ্রহণের কে যোগ্য হয়েছে আর কে হয়নি, তা বয়স দিয়ে বলা চলে না। এক এক জনের এক এক বয়সে যৌবনের বিকাশ হয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সতেরটী রাষ্ট্রে এই জন্য কন্যার বিবাহের বয়স সম্পর্কে কোনো আইনই নেই, নয়টী রাষ্ট্রে

কন্যার বিবাহের বয়স ন্যূনতম দ্বাদশ হওয়া চাই ব'লে আইন হয়েছে। আমাদের দেশের চিকিৎসা-বিদ ঋষিরা "ঊনষোড়শ বর্ষায়াম্" অর্থাৎ ষোল বছর বয়সের কমে গর্ভাধান অনুমোদন করেন নি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের আগে কোনও পুরুষের গর্ভাধান করা উচিত নয় এবং কুড়ি একুশ বছরের আগে কোনো মেয়ের গর্ভধারণ করাও উচিত নয়। শুধু তাই নয়, গর্ভাধান করার বা গর্ভধারণ করার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনটা দৈহিক সামর্থ্য সঞ্চয়ে, বীর্য্যধারণে, বলপুষ্টি আহরণে, শুক্রশোণিতাদিগত অপব্যয় নিবারণে, রক্তদোষ-সংশোধনে, অত্যুত্তম নৈতিক জীবনযাপনে এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন।

শান্তি ও শুদ্ধির পথ

শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতায় হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্র সমূহ হইতে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতেছিল। ভাব এবং ভাষা-মাধুর্য্যেও বক্তৃতাটী সকলের চিত্ততোষকর হইয়াছিল। বক্তৃতাশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শন করিলেন।

যুবকটীর বক্তব্য ধীরভাবে শ্রবণের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সচ্চরিত্র এবং ইন্দ্রিয়জয়ী হবার জন্য তোমার যা

প্রয়োজন, তা হচ্ছে সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকে ভগবানের চরণাশ্রিত করা। ভগবচ্চরণে যে নিজেকে সমর্পণ করে, তার কামমোহ ভগবান্ নিজে দূর ক'রে দেন। ভগবান্‌কে প্রেমস্বরূপ জেনে তাঁর চরণে আশ্রয় নাও। নিজের অফুরন্ত কামনা-বাসনার পসরা তাঁর পায়ে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। নিজেকে জগতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় জেনে তাঁকে আশ্রয় কর, অনাথ জেনে তাঁকে তোমার জীবনের নাথ ব'লে গ্রহণ কর। শান্তির পথও ইহা, শুদ্ধির পথও ইহা।

নরসিংদী (ঢাকা)

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

প্রাতে সাতটায় ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি শিলমান্দী হইতে নরসিংদী আসিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি-পল্লীতে স্থাপিত বন্ধু-সেবাশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। গতকল্য শিলমান্দীর বক্তৃতার পরে বন্ধু-সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মৌলিক শ্রীশ্রীবাবামণিকে বিশেষভাবে ধরায় শ্রীশ্রীবাবামণি এখানে আসিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পুনরায় বেলা বারোটার ট্রেণেই শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা রওনা হইবেন।

সভাস্থলে সামিয়ানা টাঙ্গানই ছিল। কিন্তু বসিবার আসনগুলি যথাস্থানে আনীত হয় নাই। এই ফাঁকে শ্রীশ্রীবাবামণি খান-তিনচারি পত্র লিখিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা সুরু করিবার পূর্ব্বেই সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী কতিপয় আসন মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন। বেলা দশ ঘটিকায় বক্তৃতারম্ভ হইল।

পুরুষকার ও ভগবদ্বিশ্বাসে বিরোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা পুরুষকার বরণ কর। ভগবানের অসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে অনুশীলনের বলে সেই অমিতবল পরমেশ্বরের অফুরন্ত ভাণ্ডার হ'তে শক্তি আহরণ ক'রে নাও। ভগবান্ মঙ্গলময়, একথা চিরসত্য। কিন্তু তিনি মঙ্গলময় ব'লেই যে তুমি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে অলস জীবন যাপন কত্তে অধিকারী, তা' মনে ক'রো না। একটা জাতি নানা প্রকার নিষ্পেষণের মধ্যে থেকে থেকে এ নিষ্পেষণ অসহ্য জ্ঞান ক'রে যদি তা দূর কর্ব্বার জন্য প্রয়াস পায়, তবে কি তা' দাম্ভিকতা হবে? তা' ঈশ্বরে অবিশ্বাস হবে? ভগবান করুণাময় ব'লেই কি দেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশা বিদূরণ করা কাপট্য হবে? নিশ্চয়ই না। এই জাতীয় কুসংস্কার অন্তরে পোষণ ক'রে তোমরা অচল আলস্যে ভর ক'রে গৃহকোণে ব'সে থাক্‌তে পার না। ভগবান্ মঙ্গলময় ব'লেই তোমাদের অন্তরে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি দিয়েছেন। তোমরা সেই প্রবৃত্তিকে সার্থক করার জন্য উদ্‌যোগী হও। ভগবদ্‌বিশ্বাস ও ভগবদ্‌ভক্তির সাথে পুরুষকারের বিরোধ নেই। তুমি তাঁরই শক্তিকে নিজের ভিতরে জাগ্রত কর। তাঁরই বলে বলীয়ান্ হয়ে তুমি জগতে অসাধ্য-সাধনের ব্রত গ্রহণ কর। নিজের দর্প, অহঙ্কার ও গর্ব্বিত ব্যক্তিত্ববোধকে

ভগবানের পবিত্র ইচ্ছার অনুবর্ত্তী কর এবং নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁর একান্ত সেবকে পরিণত ক'রে এ জগতের যত দুশ্চর তপস্যা ক'রে যাও, যত দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন কত্তে থাক। পুরুষকারকে প্রবুদ্ধ কর এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবার অনুগত কর। অদৃষ্ট-নির্ভর কর্ম্ম-বিমুখ শ্রমকুণ্ঠ দুর্ব্বলেন্দ্রিয়েরা জগতে কোনো মঙ্গল সাধন কত্তে পারে নাই এবং কখনো পারবেও না। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমায় আজ উন্নত হও, সংযমের সুরভিতে জীবনকে উপভোগ কর, চরিত্রের দীপ্তিতে হও উজ্জ্বল,—ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৌভাগ্যের তখন তোমরাই হবে প্রকৃত অধিকারী।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি সভাভঙ্গ করিলেন এবং আহারাদি সমাপন করিয়া রেল-ষ্টেশনে রওনা হইলেন।

ঢাকা
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা পৌছিয়াছেন। অদ্য সূর্য্যোদয় হইতেই শুধু পত্রের জবাব দিতেছেন।

সেবাবুদ্ধি ও সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যদিও তোমরা প্রতিষ্ঠানটীকে নির্দ্দিষ্ট একটী প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে স্থাপন করিয়াছ, তথাপি এ সত্যকে কখনও বিস্মৃতির অন্তরালে যাইতে দিও না যে, তোমাদিগকে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলিতে হইবে। প্রদেশবিশেষের উপরে অপর প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন তোমাদের কল্পনার বাহিরে থাকিবে। যদিও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এই চারিজন জগৎপূজিত মহামানব কাছাকাছি সময়ে একই প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে একটা সুবিশেষ গৌরব দান করিয়াছেন, তথাপি একথা ভুলিয়া যাইও না যে, সকলের কাছ হইতে দূরে সরিয়া পৃথক্ থাকিবার চেষ্টার মধ্যে এই সকল মহতের আবির্ভাব সার্থক হইতে পারে না। তোমরা জগতের, জগৎ তোমাদের, এই ভাব এই বঙ্গদেশে যেরূপ ব্যাপক ও গভীর পরিপুষ্টি পাইয়াছে, ভারতের আর কোনও প্রদেশে তাহা পায় নাই। এই কারণেই বিশাল বিপুল ভারতের এক এক প্রান্তে প্রাদেশিকতার হলাহল এমন ভাবে উদ্গীরিত হইতেছে, যাহা বাঙ্গালীর চক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া ঠেকিতেছে। কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, কর্ম্মে, বাক্যে, চেষ্টায় ও চিন্তায় প্রাদেশিকতার ইতরজনোচিত ভেদবুদ্ধি যখন সর্ব্বত্র কেবলই বিসর্পিত হইয়া যাইতেছে, সেই সময়ে সেবাব্রতী তোমরা নীলকণ্ঠের ন্যায় এই হলাহল উপেক্ষার শক্তিতে জীর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের দেশ শুধু বাঙ্গালা নহে,

পরন্তু ভারতবর্ষ। অপরের উগ্র প্রাদেশিকতা তোমাদের প্রবাস-জীবনকে দুঃখময় এবং স্বভূমি-বাসকে ক্লেশসঙ্কুল করিতে পারে, কিন্তু যথার্থ জাতীয়তার অভ্যুদগমে এই কুয়াশার ঘন কুহেলিকা যে একদা নিশ্চিত বিদূরিত হইবে, এই বিশ্বাস রাখিয়া চল। প্রাদেশিকতার প্রচার যে দেশদ্রোহিতার নামান্তর, ইহা বুঝিবার সুবুদ্ধি একদা সকলেরই আসিবে। সাময়িক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়িয়া তোমরা তোমাদের স্থিরবুদ্ধিকে উত্তেজিত হইতে দিও না।"

আশ্রম তথা সাধনদীপ্ত জীবন

কলিকাতা-প্রবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রত্যেকটী সাধন-দীপ্ত জীবনই এক একটী মঠ বা আশ্রম। ইষ্টক-প্রস্তরাদিতে নির্ম্মিত মঠ বা আশ্রম তোমাদের গুরুতর কোনও প্রার্থনীয় নহে, সাধন-প্রদীপ্ত জীবন তোমাদের প্রার্থনীয়। কারণ, এইরূপ এক একটী আদর্শ জীবনের আশ্রয়চ্ছায়াতলেই শত শত ভাবী সাধকের জীবনের যথার্থ গঠন হয়। তথাপি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের আত্মকর্ম্ম যোগ, ধ্যান, ভজন ও জপাদি অনুশীলনের জন্য মঠ, মন্দির আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠার গৌণ আবশ্যকতাও থাকিবে। অপম্লেচ্ছ-চণ্ডালাদি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নির্ব্বিচারে ও নিরঙ্কুশ প্রযত্নে ব্রহ্মবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রসার সাধনই মঠ, মন্দির ও

আশ্রমাদির কেন্দ্রবর্ত্তিনী চিন্তা হইবে। সমগ্র জগদ্ব্যাপী ভাবী মানবসমাজের উৎকৃষ্টতর আবির্ভাবকে আনুকূল্য প্রদানের জন্য সংযম, সদাচার ও বীর্য্যধারণ-শিক্ষার সুপ্রসারই ইহাদের লক্ষ্য হইবে।"

সংসার পরিত্যাগের বৈধতা

বেলা বারোটায় শ্রীশ্রীবাবামণি নারায়ণগঞ্জ যাইবার জন্য ঢাকা ষ্টেশনে রওনা হইয়াছেন। জনৈক সংসার-পরিত্যাগেচ্ছু যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণসঙ্গ লইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বাবা, সংসার কি পরিত্যাগ করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার পক্ষে তা' কাপুরুষের কাজ হবে। সংসারে প্রবেশ ক'রেই যাই দেখতে পাচ্ছ যে, সংসার দুঃখময়, অমনি সংসার ছেড়ে তুমি যেতে পার না। সংসারী জীবন একটা গুরুতর কর্ত্তব্য-কঠিন জীবন। এ জীবনটার সকল কর্ত্তব্যের চাইতে আরো বড় কোনো কর্ত্তব্য যদি তোমাকে আহ্বান করে, তবেই তুমি সংসার ছেড়ে যেতে পার, নইলে পার না। আজ তোমার সংসারী জীবন ভাল লাগছে না ব'লে তুমি সন্ন্যাস নিলে, কাল আবার সন্ন্যাস-জীবন ভাল লাগ্‌ছে না ব'লে সংসারী হ'লে, এসবের নাম ধর্ম্মও নয়, কর্ত্তব্যও নয়,—এর নাম হচ্ছে খামখেয়ালী। অবশ্য অত্যন্ত দুঃখে যখন মানুষ পড়ে, তখন সে তার

অবস্থাটার পরিবর্ত্তন ক'রে নেবার জন্য একেবারে অধীর অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। তখন সে ভাবে,—"যাঁরা আমার মত নন, আমি তাঁদের মত কোনো প্রকারে হতে পারলেই বুঝি সুখ খুঁজে পাব।" সংসারের উৎপীড়ন সইতে না পেরে সংসারটাকে ত্যাগ ক'রে কোথাও চলে গিয়ে প্রাণ জুড়াবার আকাঙ্ক্ষা তখন প্রতিনিয়ত অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু সংসার ত্যাগ করলেই জীব সুখ পাবে, তা ত' নয়। প্রকৃত সুখদুঃখ ত' আর সংসারে নয়, সব হচ্ছে তোমার মনটার মাঝে। সুখে যার লোভ নেই, দুঃখে যার ক্ষোভ নেই, সে-ই প্রকৃত সুখী। তোমাকে গৃহে থেকেই প্রকৃত সুখ অর্জ্জন কত্তে হবে।

ভগবান্‌কে ভার দাও

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—কিন্তু ভরসা পাই না যে বাবা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি সকল নির্ভরসার বল, সকল অশরণের শরণ, সকল বিপন্নের বান্ধব, তাঁর চরণে আশ্রয় নাও। আপ্‌নি বুকে বল আসবে, মনে সাহস আসবে, হার্‌তে হারতেও সংসার-যুদ্ধে বিজয় লাভ কর্ব্বে। ভগবানকে ডেকে বল,—"ঠাকুর! আমি আর নিজেকে ব'য়ে বেড়তে পাচ্ছি না, তুমি আমার ভার নাও প্রভো; নিজের-মঙ্গল নিজে সাধন কত্তে সক্ষম হচ্ছি না, তুমি আমায় কল্যাণের পথে, শান্তির পথে, অভয়ের পথে নিজে এসে হাত ধ'রে

টেনে তুলে নিয়ে যাও।" অকপট চিত্তে ব'লে দে'খো প্রকৃতই তিনি ভার নেবেন। তিনি দয়াময়, না, ন্যায়পরায়ণ, সেই তর্কের মধ্যে যেও না। তাঁর ন্যায়বিচারও যে তাঁর দয়া ছাড়া হয় না, হ'তে পারে না এই কথাটী বেশ ক'রে বিশ্বাস ক'রে তাঁকে ডাকো। সকল ভয়-ভাবনা তিনি দূর ক'রে দেবেন।

কুমিল্লা

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

গত পরশ্ব রাত্রি সাড়ে এগারটায় শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা আসিয়াছেন। অদ্য বেলা সাড়ে দশটায় তিনি মাধাইয়া বাজার যাইবেন এবং ভাণী সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবেন।

পথের সম্বল

লোটা-কম্বল বাঁধা হইতেছে, এমন সময়ে একজন আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে এখনই একবার তাঁহার গৃহে পদধূলি দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দাঁড়াও, পথের সম্বল আগে বেঁধে নিই।

ভদ্রলোক বলিলেন,—পরে এসে বাঁধবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার সে কথা কোনো বুদ্ধিমানে রাখ্‌বে না, রাখ্‌বে মূর্খেরা। কখন যে কার সময় হয়,

কে জানে? দুনিয়ার কারো অনুরোধ বা উপরোধেই শেষের সম্বল বাঁধতে কখনো দেরি বা শৈথিল্য করা চলে না।

নবীপুর (কুমিল্লা)

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

রাধা দেবী

ভাণী সেবাশ্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠান সারিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নবীপুর আসিয়াছেন। শ্রীমান্ যোগেশ পোদ্দারের মাতা শ্রীমতী রাধা দেবী শ্রীশ্রীবাবামণির সেবা-পূজার ভার লইয়াছেন।

বিশিষ্ট জমিদারের ঘরের গৃহিণী হইয়া এবং স্বামিপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াও এই পুণ্যবতী মহিলা পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ এক সুপ্রশংসনীয় অনাসক্ত জীবন যাপন করিতেছেন।

রাধা দেবী বলিলেন,—বাবামণি, আপনি অনুক্ষণ আমার ধ্যানের বস্তু হ'য়ে রয়েছেন। সেই যে রহিমপুরের উৎসবের দিনে আপনার শ্রীমুখ থেকে হরিওঁ-হরিওঁ কীর্ত্তন নিঃসৃত হ'ল, তদবধি একটী নিমিষের জন্যও আমার কর্ণে অন্য কোনও শব্দই প্রবেশ করে না। স্বামী ডাকেন, পুত্র ডাকে, ভাসুর, ভাজ, ননদেরা ডাকেন, সকল জনের সকল কথার ভিতরে আমি অবিরাম আপনার পবিত্র কণ্ঠস্বরটাই শুনি, আর হরিওঁ হরিওঁ মন্ত্রই শুনি, জগতে আর যেন কারো কণ্ঠে কোনো স্বর নেই, জগতের কোনো বাক্যে যেন আর কোনো ধ্বনি নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে লাগিলেন।

রাধা দেবী নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—কুলগুরু মন্ত্রর দিয়েছিলেন, এখন সে মন্ত্র-তন্ত্র সব ভুল হ'য়ে গেছে। কুলগুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ কত্তে বস্‌লে আগে সংসারের হাজার কথা মনে আস্‌ত। স্বামীর কথা, পুত্রের কথা, একান্নবর্ত্তী পরিবারের দশরকম চাঞ্চল্যজনক কথা কিন্তু আপনার কণ্ঠের সেই মধুর হরি-ওঁ কীর্ত্তন শোন্‌বার পর থেকে, কুলগুরুর মন্ত্র গেছে, স্বামিপুত্রের চিন্তা গেছে, সংসারের হাজার রকমের দুশ্চিন্তা গেছে, শুধু মনে হয়—হরিওঁ ছাড়া জগতে আর কোনো বাণী নেই, আর কোনও ভাষা নেই, আর কোনো ধ্বনি নেই। অন্ধকার জগৎ যেন হঠাৎ আলোময় হ'য়ে যায়, আর তার মধ্যে কি যে দেখি আর কি যে না দেখি, তা' আমি মুখের কথায় কি বর্ণনা করব বাবামণি। বর্ণনার আমার ক্ষমতাই নেই।

উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির এমন কতকগুলি কথা অতঃপর শ্রীমতী রাধা দেবী নিবেদন করিলেন, যাহা গ্রন্থে প্রকাশ সমীচীন নহে। বলা-বাহুল্য, এখনো রাধা দেবী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই * এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা হইলেও তিনি নিরক্ষরা।

* কয়েক বৎসর পরে শ্রীমতী রাধা দেবী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"হরি-ওঁ" কথার মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'হরি' শব্দের মানেই হচ্ছে, যিনি আহরণ করেন। ওঙ্কার-রূপী মহামন্ত্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল খণ্ডকে একত্র ক'রে এক অখণ্ডে পরিণত করেন। এই জন্য ওঙ্কার-রূপ মহামন্ত্রের অপর নাম "হরি"। একমাত্র ওঙ্কারের ভিতরেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞান, সকল সত্য, সকল কুশল, সকল মন্ত্র আহৃত হ'য়ে রয়েছে। "হরি-ওঁ" এই কথাটুকুর মানে হচ্ছে এই।

"হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"হরিওঁ" কীর্ত্তন হচ্ছে মহাসমন্বয়ের কীর্ত্তন। সকল মতের সকল পথের সকল শাস্ত্রের ভেদ-বিচ্ছেদের নিরাকরণ ক'রে এই কীর্ত্তন জগতে স্থায়ী এবং সত্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, নিত্য এবং অবিনশ্বর সুখ জগতে বিলাবে। এই মহাসঙ্কীর্ত্তনের আধ্যাত্মিক প্রভাবে বিনা সূতায় মালা গাঁথা হবে, প্রাণে প্রাণে মিলন স্থাপিত হবে, বিনা চেষ্টায় ঐক্য, প্রীতি ও সরলতা প্রতিষ্ঠিত হবে, মরুভূমিতুল্য উষর হৃদয়ে স্নিগ্ধতার, কোমলতার ও সরলতার সঞ্চার হবে, পাষাণ ভেদ ক'রে প্রেমের পাদপ আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে।

মোচাগড়া আশ্রম (কুমিল্লা)
২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নবীপুর হইতে গতকল্য সন্ধ্যার পরেই শ্রীশ্রীবাবামণি মোচাগড়া আশ্রমে আসিয়াছেন। ডাক্তার দীনেশ চন্দ্র ঘোষের এবং শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দেবের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা রাত্রে আশ্রমে দীর্ঘসময় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কীর্ত্তনের পূর্ণানন্দ লাভ

অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দেব প্রশ্ন করিলেন,—কীর্ত্তনকালে পূর্ণ আনন্দ পাবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কীর্ত্তনকে অনুক্ষণ ধ্যানাবেশের অনুগত রাখাই হচ্ছে কীর্ত্তনের প্রকৃত আনন্দ পাবার উপায়। কীর্ত্তন হচ্ছে উপায়, ধ্যানাবেশ হচ্ছে লক্ষ্য। যে নামটী তোমার ইষ্টনাম, সেই নামটীর মধ্যে যাতে মনঃপ্রাণ সহজে ডু'বে যেতে পারে, তারই জন্য তোমার কীর্ত্তন প্রয়োজন। কিসের জন্য কি প্রয়োজন, সেইটীর খেয়াল রেখে, যার জন্যে যাকে প্রয়োজন, একমাত্র তারই জন্যে তাকে প্রয়োগ কল্লেই উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয়। গলা ফাটিয়ে চেঁচাবার দরকার নেই,—জেনো, কণ্ঠের মৃদুতা এবং মাধুর্য্য ধ্যানাবেশের আনুকূল্য করে। তাড়াহুড়া ক'রে শব্দোচ্চারণের দরকার নেই,—জেনো, মন্থর অথচ সুস্পষ্ট উচ্চারণ, ধীর অথচ নির্দ্দোষ লয় ধ্যানাবেশের সহায়তা করে। কণ্ঠকে বিকৃত না ক'রে, চক্ষু মুখ বিস্ফারিত না ক'রে, শ্রোতাদের

প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি না ক'রে অন্তরের প্রেমের সাথে কণ্ঠের মধু মিশিয়ে যে কীর্ত্তন, তাতেই পূর্ণ আনন্দ আসে। লম্ফ-ঝম্প চিৎকার এবং বাদ্যযন্ত্রের আতিশয্য কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যকে বিপন্ন করে। কীর্ত্তনের প্রভাব আপনা আপনি দেহ-মন-প্রাণে নৃত্য জাগে ত' নাচো, কিন্তু তা যেন লোক দেখাবার জন্য না হয় বা বাদ্যযন্ত্রের যান্ত্রিকের সঙ্গে কৃতিত্বের আড়াআড়ি করবার জন্য না হয়। বাদ্যভাণ্ডের ঔদ্ধত্য বর্জ্জন, সকল বাদ্যযন্ত্রকে কীর্ত্তনের সুরের নীচে ফেলে রাখো যেন সে বিনীত ভৃত্যের মত অনুগমনই করে, উদ্ধত প্রভুর মত আগে আগে না যায় বা চেঁচামেচি ক'রে সুরের স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে। কীর্ত্তনের সাথে সাথে অন্তরে জাগাও শুধু প্রেমমধুমাখা ইষ্টনাম, জগতের আর সকল বহির্ম্মুখ চিন্তা ও চেষ্টা বর্জ্জন কর।—এই হচ্ছে কীর্ত্তনকালে পূর্ণানন্দ লাভের একমাত্র উপায়।

স্থিরোদ্বাহ কুমারীর প্রতি উপদেশ দানের দায়িত্ব

কুমারী অবস্থাতে দীক্ষিতা একটী ধর্ম্মপ্রাণা মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়াছে। মেয়েটীর বিবাহে একান্তই অনিচ্ছা কিন্তু পিতা মাতার বিবাহ দেওয়াই মত। কুমারীর মাতা কুমারীকে শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নিয়া আসিলেন এবং কিছু উপদেশ দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতদিন ধ্যান, জপ ও উপাসনার মধ্য দিয়ে চিত্তের স্নিগ্ধতা অর্জ্জনের চেষ্টা যে ক'রে এসেছে, এবং সম্পূর্ণরূপে দৈহিক পবিত্রতা রক্ষাই যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, হঠাৎ বিবাহিত হয়ে তাকে একটা অভিনব ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। তার পক্ষে সত্য সত্যই উপদেশের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই উপদেশ দেবার দায়িত্ব কন্যার মাতার উপরে থাকা উচিত।

কুমারীর মাতা বলিলেন যে, তাঁহারা অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা বিধায় জননী হইয়াও কন্যাকে উপদেশ দিবার যোগ্যা নহেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা অশিক্ষিতাও হ'তে পার, অল্প-শিক্ষিতাও হ'তে পার, কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। তবে, তোমরা যদি সুশিক্ষিতা হ'তে, তাহ'লে নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরেও এমন অনেক উপদেশ অনুমানে দিতে পাত্তে, যা দেবার জন্য শিক্ষিত কল্পনাশক্তির এবং অভ্যস্ত অনুমান-শক্তির প্রয়োজন। প্রত্যেক রমণীরই জীবনের সমস্যা এক নয়, এই জন্যই ঠিক্ একটী রমণীর জীবনের অভিজ্ঞতার উপরে জগতের সকল রমণীকে উপদেশ দেওয়া চলে না। কিন্তু শিক্ষার প্রসার থাক্‌লে, একটী জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে শত সহস্র জীবনের ভ্রম-ত্রুটি সিদ্ধি-সাফল্য অনুমান ক'রে উপদেশ দেওয়া যায়। এই হিসাবে তোমরা শিক্ষিতা

নও ব'লে মনে মনে কুণ্ঠিতা হ'তে পার। কিন্তু তবু উপায় নেই। নিজ কন্যাকে বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তার মায়ের উপরেই থাক্‌বে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নব-বিবাহিতা বধূর শ্বাশুড়ী এই বিষয়ের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে যেচে নিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায় স্থলেই তা' হ'য়ে উঠে না; কারণ, পুত্রকে বিবাহ দিয়ে বধূকে বরণ ক'রে ঘরে তুলে আনার পরে অধিকাংশ শ্বাশুড়ীই বধূর প্রতি ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করেন। আর, মায়ের স্থান অধিকার করার ক্ষমতা বা যোগ্যতাও খুব কম শ্বাশুড়ীরই থাকে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি উল্লিখিতা কুমারী মেয়েটীকে সময়োপযোগী কয়েকটী উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

বিবাহের পরে কন্যার অসহায় অবস্থা

বাঙ্গরা গ্রাম হইতে একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণদর্শনার্থে আসিয়াছেন। তিনি সলজ্জভাবে নিবেদন করিলেন যে, পিতামাতা বিবাহ স্থির করিয়াছেন, কিছু উপদেশ চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এতক্ষণে পেয়েছি। হাজার শিক্ষিতা, সাধিকা, বিদুষী হোক্, বিয়ের পরে মেয়েরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্বামীরই অধীন। তাই মেয়েদের উপদেশ দিয়ে আর কি হবে, স্বামীর সহযোগিতার অভাব হ'লে অনেক উপদেশই

তারা পালন কত্তে পারবে না, জেনে শুনেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপদেশ লঙ্ঘন করবে। বি-এ, এম-এ, পি-আর-এস, পি এইচ-ডি যাই পাশ করুক না কেন, স্বামীর ঘরে স্ত্রীর পরিণাম অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং উপদেশ দিতে হয় ত' তোমাদেরই দেওয়া চাই।

বিবাহের বিভিন্ন দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহের অনেকগুলি দিক্ আছে। একটী হচ্ছে সাংসারিক, আর একটী হচ্ছে সামাজিক, আর একটী হচ্ছে দৈহিক, আর একটী হচ্ছে নৈতিক, আর একটী হচ্ছে আধ্যাত্মিক। প্রত্যেক দিক্ থেকে বিবাহিতের দায়িত্ব এক এক রকমের। সকল দিক্ থেকে সকল দায়িত্ব যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন ক'রে যেতে পারে, জগতে সে হচ্ছে বাহাদুর এবং সেই হচ্ছে পূজনীয় গৃহস্থ।

বিবাহের সাংসারিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার ভগ্নীর বিবাহের পরে সে ত' চলে গেল স্বামীর ঘরে, তখন তোমার বৃদ্ধা মাতার সাংসারিক শত রকমের কাজে সহায়তা করার জন্য সংসারে নূতন আর একটী স্ত্রীলোক চাই, যেই স্ত্রীলোকটী তোমার মায়ের মেয়ের বিচ্ছেদ দূর করবে, মেয়ের অভাব পূরাবে। এদেশ ত' এখানো য়ুরোপ আমেরিকার মত স্বার্থের ক্রীতদাস

হয় নি যে, ছেলেটী বিয়ের আগ পর্য্যন্ত বাপ-মায়ের ঘাড়ের মাংস চুষে বিদ্যার্জ্জন করবে, অর্থার্জ্জনের যোগ্যতা সঞ্চয় কর্ব্বে, আর আর একটী টুক্‌টুকে বউ বিয়ে করা মাত্র ভিন্ন ক'রে বাসা বেঁধে পৃথক্ হয়ে থাকবে। পিতামাতার বৃদ্ধকালে অসহায় অবস্থায় তাঁদের পরিত্যাগ ক'রে নিজের সুখের স্বাধীন খেয়াল চিরতার্থ কর্ব্বার জন্য এই যে দূরে স'রে থাকার প্রথা, এটী পশুপক্ষীর আচরণেরই অনুকরণ মাত্র, মানুষের যোগ্য নয়। সুতরাং হিন্দুর ছেলের বিয়ে করার প্রথম তাগিদ সাংসারিক। বৃদ্ধা মাতার শ্রম কমান বা বৃদ্ধ পিতার সেবাই হচ্ছে তোমার বিবাহের প্রথম সঙ্গত কারণ। সুতরাং বিবাহ ক'রে বউ ঘরে এনে তোমার প্রথম কর্ত্তব্য হবে তাকে এই সেবাবৃত্তির কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া এবং নিজেও সেবাব্রতী হ'য়ে পিতৃমাতৃসেবায় তাকে সহায়তা করা, সহযোগ দেওয়া। বিবাহের পরে পিতৃমাতৃসেবাই হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য এবং প্রধান চেষ্টা। এতকাল যদি শিক্ষার গুণে বা সঙ্গের দোষে পিতৃমাতৃসেবার বিষয়ে অবহেলা ক'রে থাক, তবে এখন থেকে পর্ব্বশিক্ষা ও পূর্ব্বসঙ্গের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কত্তে হবে এবং "পিতৃদেবো ভব" "মাতৃদেবো ভব" এই ঋষিবাক্যকে নিজের দৈনন্দিন প্রত্যেকটী আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা পশুর সমাজেই সাজে, অথবা

পশুতুল্য মানবের সমাজেই থাকে। প্রকৃত মানুষের সমাজে সাজে না বা থাকে না। এই কথা স্মরণ রেখে বিবাহরূপ মহাযজ্ঞের পরে জীবনকে সেবাব্রতের দৃষ্টান্তস্বরূপ ক'রে তোল। নিজের সেবা-ভাবকে স্ত্রীর ভিতরে সংক্রামিত কর, তোমার স্ত্রী তোমার মাতাকে তার গর্ভধারিণী এবং তোমার পিতাকে তার জন্মদাতা জ্ঞান করুক এবং অকপট চিত্তে এই দুই জনের সেবাকেই এই নূতন সংসারটীতে প্রবেশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য জেনে সেই উদ্দেশ্য পালনের জন্য প্রাণপণে ব্রতিনী হোক্। পিতৃকুলের সমৃদ্ধির গর্ব্ব ভুলে এই পরিবারের ঋদ্ধিকে নিজের ঋদ্ধি, এই পরিবারের দৈন্যকে নিজের দৈন্য, এই পরিবারের গৌরবকে নিজের গৌরব, এই পরিবারের কলঙ্ককে নিজের কলঙ্ক, এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাকে নিজের প্রতিষ্ঠা, এই পরিবারের অপযশকে নিজের অপযশ ব'লে সে জ্ঞান করুক।—এই হ'ল তোমার বিবাহের সাংসারিক বা পারিবারিক দিক্।

বিবাহের সামাজিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক সমাজেরই লোকেরা মৃত্যুর অধীন। এমন সমাজ জগতে নেই, যেই সমাজের লোকেরা অমর। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু তাদের করাল বদন বিস্তার ক'রে প্রত্যেক সমাজেরই দু-দশ-জন ক'রে লোক

ক্রমশঃ সরিয়ে নিচ্ছে। এতে সমাজ বলহীন হচ্ছে। প্রত্যেক সমাজেরই এক একটী বিশিষ্ট আদর্শ আছে। যে সমাজের আদর্শ যত উচ্চ, সেই সমাজেরই নিজ আদর্শকে জীবন্ত অবস্থায় অনন্ত ভবিষ্যৎকালব্যাপী ক'রে জগতের জন্য রেখে যাওয়ার দায়িত্ব তত অধিক। এই কারণেই সমাজ চাইবে, একটী লোকের ক্ষয় হ'লে তার স্থানে যেন দুইটী লোকের আবির্ভাব ঘটে, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সৃষ্টির বাহক একটী সুপাত্র অন্তর্হিত হ'লে যেন তার স্থলে তদ্রূপ বা ততোধিক-যোগ্য পাঁচটী সুপাত্রের অভ্যুদয় হয়। তাই সমাজের দাবী, তুমি বিবাহ কর, বংশবৃদ্ধি কর, পুত্রকন্যা উৎপাদনের ভিতর দিয়ে সমাজের ঋদ্ধি, সৌন্দর্য্য, শক্তি ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন কর। সুতরাং বিবাহের পরক্ষণেই বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে না দিয়ে তোমার কর্ত্তব্য হবে সমাজের এই দাবীকে পূরণের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হওয়া। কিন্তু একার চেষ্টায় এই কর্ত্তব্য পালনে তুমি সফলপ্রযত্ন হবে না, তাই বিবাহমাত্রই তোমার স্ত্রীকে উন্নত আদর্শের জীবন্ত প্রতিমা-রূপে গড়ে নেবার জন্য তোমাকে প্রয়াসী হ'তে হবে। তোমার ধর্ম্মের, তোমার সংস্কৃতির, তোমার কৃষ্টির সব চেয়ে উচ্চ ও মহৎ বস্তুগুলিকে এনে তার চরিত্রে রূপান্তর ক'রে তুলতে হবে। তোমার সমাজের যত দিকে যত খানি প্রত্যাশা, সব পূরণের উপযুক্ত আয়োজন তোমাদের উভয়ের জীবনে এনে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুসংবদ্ধ কত্তে হবে। তোমার সমাজ বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে

যেন তোমার এই বিবাহ-বন্ধনকে তাদের পাপামুক্তির কারণ, বন্ধনচ্ছেদের হেতু, দুর্ব্বলতা নাশের উপায়, শক্তি সঞ্চয়ের উপাদান, সমুন্নতি লাভের উপকরণরূপে স্বীকার কত্তে পারে এবং স্বীকার ক'রে গৌরবান্বিত হয়। এই হ'ল তোমার বিবাহের সামাজিক দিক্।

বিবাহের দৈহিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনুষ্যদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের লীলাক্ষেত্র। এই দেহ ধারণ ক'রে দেবতারাও এসে ঈশ্বর-দর্শন ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন ব'লে যেমন প্রসিদ্ধি আছে, এই দেহের তেমন নিতান্ত জড়, অসার ও ক্ষণস্থায়ী কতকগুলি তৃপ্তি আছে। সেই তৃপ্তির মধ্যে স্পর্শসুখ অতি প্রধান। সুন্দর গোলাপ ফুলটীকে দেখেই তুমি পরিতৃপ্ত হও না। দেখে যে আনন্দ, ঘ্রাণ পেয়ে তার চেয়ে বেশী আনন্দ। আবার, সেই ফুলটীকে মুখে বুকে গালে গলায় বুলিয়ে তোমার ততোধিক আনন্দ। পার্থিব শরীর নিয়ে যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ এই পার্থিব দেহের নানাবিধ তৃষ্ণার দাবী তোমার উপরে অল্প হোক্ বেশী হোক্ থাক্‌বে এবং সকল তৃষ্ণার দাবীর চেয়ে স্পর্শসুখের দাবী অনেক সময়ে অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। তাই, বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর দৈহিক মিলন ও আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতা একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার এবং এই মিলন অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের আত্মিক মিলনের সহায়ক,

অনেক ক্ষেত্রে আত্মিক মিলনের হন্তারক। বিবাহিত জীবনে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ দুচারজন অসামান্য ব্যক্তি ব্যতীত, প্রত্যেকেরই দৈহিক মিলন অবশ্যম্ভাবী এবং মানুষের রমণ-শক্তি যতই অসাধারণ হোক্, এই মিলনের সুখ প্রত্যেকের পক্ষেই অচিরস্থায়ী। অথচ চিরস্থায়ী মিলন-সুখকে আয়ত্ত করার প্রলোভন-রূপেই এই ক্ষণস্থায়ী মিলন-সুখের সার্থকতা। মিলনের এই ক্ষণিক সুখ যদি অঙ্গুলীহেলন ক'রে মিলনের নিত্য, অনশ্বর, অখণ্ডিত, অনন্তকালব্যাপী সুখের প্রতি প্রধাবিত কত্তে পারে, তবেই এই দৈহিক মিলন প্রকৃত মিলন-পদবাচ্য হ'তে পারে। এই কারণে, তোমাকে সকল পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ কত্তে হবে। তোমার স্ত্রীকেও সকল পূর্ব্বসংস্কার থেকে মুক্ত ক'রে নিতে হবে এবং উভয়ের পরিপূর্ণ সম্মতির ভিতর দিয়ে দৈহিক মিলনের চেষ্টাকে একটা পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সুষমার মধ্য দিয়ে বিকশিত করার ধারাবাহিক সাধনা কত্তে হবে। সে সাধনা এমন একাগ্র, এমন একনিষ্ঠ, এমন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত হবে, যেন এর ফলে নরনারীর রমণ ক্ষণসুখ-লোভাতুর দুইটী বিপরীত-লিঙ্গী পশুর মিলনেই পর্য্যবসিত হ'তে না পারে, যেন আগামী যুগের লক্ষকোটি গৃহস্থ দম্পতির জন্য নূতন রকমের দিগ্‌দর্শন তোমরা রেখে যেতে পার। য়ুরোপে যে যৌন-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হচ্ছে, তাকে আমি পশুর বিজ্ঞান-চর্চ্চা নাম দেই। তারা স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলনকে তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ কচ্ছে কিন্তু তার একমাত্র উদ্দেশ্য

হচ্ছে, পুরুষ এবং রমণীর রমণসুখটুকু আত্যন্তিক কি কর্ম্মে হয়। প্রতিমা অবলম্বন ক'রে সাধক যেমন অপ্রতিম পরব্রহ্মের তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যেতে চান, একটা কল্পিত এক্‌স্ প্রশ্ন সংখ্যাকে অবলম্বন ক'রে গণিতজ্ঞ যেমন বিশাল বিশাল সমস্যার সুনির্দ্দিষ্ট সমস্যাকে সমাধান করার দিকেই অগ্রসর হ'তে চান, য়ুরোপ এবং তৎশিষ্যদের যৌন-বিজ্ঞান-আলোচনা সেই শ্রেণীর নয়। তাদের যৌন-তত্ত্বালোচনার ফল বহুপরায়ণা গণিকার জীবনে আর সতী সাধ্বী-পতিপরায়ণার জীবনে এক এবং অভিন্ন। কিন্তু তোমাদের সুরত-তত্ত্বের অনুশীলন হবে দেহকে অবলম্বন ক'রে বিদেহ সত্যে পৌছুবার প্রয়াস, ক্ষণসুখকে দিয়ে সুরু ক'রে নিত্যসুখে পৌছুবার সাধনা, ভেলা দিয়ে সুরু ক'রে নদীর অপর পারে চলে গেলে যেমন ঈপ্সিত লাভ হেতু ভেলা পরিত্যাজ্য হয়, তেমনি যৌনসুখের ভেলাকে ধ'রে নিত্যসুখের নন্দনকাননে পৌছে যৌনসুখের লিপ্সা, তাড়না, প্ররোচনা ও প্রবৃত্তি থেকে চিরকালের জন্য নিজেকে মুক্ত ক'রে নেওয়া। এই হচ্ছে তোমাদের বিবাহের দৈহিক দিক।

বিবাহের নৈতিক দিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্পর্শসুখের লোভেই হোক্ কিম্বা বংশরক্ষার প্রয়োজনেই হোক্, জগতের অধিকাংশ নরনারীর পক্ষেই নারী-নর সঙ্গ প্রায় অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার

কিন্তু নির্ব্বিচার অবাধ সহবাস দৈহিক কুশলকে ত' বিপন্ন করেই, নৈতিক বুদ্ধিকেও ম্লান করে। এক নারীর বহুপুরুষ-সঙ্গ বা এক পুরুষের বহু-যোষিৎ-সঙ্গ ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে ত' স্থূলত বহু অকল্যাণই আনয়ন করে, কিন্তু চিত্তে তাতে যে মালিন্য আসে, তা' পশুপক্ষীরা কখনো অনুভবে আন্‌তে পারে নি, মানুষ পেরেছে। তাই, আদিম কালে নির্ব্বিচার ও অবাধ মিলন প্রচলিত থাক্‌লেও মানুষের নীতি-সমীক্ষক মন আপনা আপনি এই কুরীতি ও কদাচারের কুফলকে অনুভব ক'রে এতে লজ্জিত, ব্যথিত এবং অনুতপ্ত হ'তে লাগ্‌ল। অনেকে যে ব'লে থাকেন যে, একদল চাল-কলা-লোভী উদরসর্ব্বস্ব পুরোহিত-সমাজের সকলের মাথার উপরে ছটা ঘুরিয়ে নিজ প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য বিবাহ-রূপ বিধির প্রবর্ত্তন কর্ল্লেন, এসব কথার কোনো যাথার্থ্য নেই। একপরায়ণতার শান্তি উচ্ছৃঙ্খল বহুপরায়ণতার চেয়ে শতগুণে যে শ্রেষ্ঠ, একথা উপলব্ধি-গম্য হবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজে বিবাহ-বিধির পত্তন হয়েছে, এটা কোনও ব্যক্তি বা দলবিশেষের একটা সুকৌশল কারসাজীরই ফল মাত্র নয়। বিবহ-প্রথা প্রবর্ত্তনের নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, পুরুষ নিজ বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অন্য রমণীতে রত হবে না, নারী নিজ বিবাহিতা স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষে রত হবে না। যে উদ্দেশ্যে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য পালনের প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায় নি, কিম্বা ইন্দ্রিয়সুখের

মুগ্ধ প্রচারকদের কয়েক শতাব্দীব্যাপী যৌনতত্ত্ব প্রচারের পরেও ফুরিয়ে যাবে না। বিবাহের নৈতিক উদ্দেশ্য স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষে চিরকালই এই একই থাক্‌বে। সুতরাং, বিচার, বিবেচনা, নির্ববাচন ও পছন্দ যত-কিছু সব তোমার শেষ হবে বিবাহের আগে, বিবাহের পরে কোন অজুহাত দিয়ে স্ত্রী স্বামীর প্রতি বা স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে না। তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে ভাল না বেসে অন্য রমণীকে ভালবাস্‌তে যাও, তবে তুমি বিশ্বাসঘাতক হবে। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে ভাল না বেসে অন্য পুরুষকে ভালবাসতে যায়, তবে সে তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিকা হবে। দাম্পত্য-জীবনে বিশ্বাস-ঘাতকতার স্থান নেই। একে অন্যের প্রতি অনন্য-নিষ্ঠ হ'য়ে চল্‌বে, এই পণই হবে তোমাদের সর্ববাপেক্ষা অধিক যত্নে রক্ষণীয় পণ। পত্নীব্রত স্বামী আর পতিব্রতা স্ত্রী জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ব্যক্তি। কারণ, সন্নীতির প্রত্যক্ষ ফলই হ'ল সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, অভয় ও আনন্দ। বিয়ের পরে টাইফয়েড হ'য়ে স্ত্রীর একটী পা একটু বাঁকা হ'য়ে গিয়েছে, এই যুক্তিতে তুমি পুনর্বিবাহ কত্তে পার না, যদি তুমি পত্নীব্রত হও। শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দাও। নিজে রাজরাজেশ্বর হ'য়ে নিজে ভুবনবিজয়ী সম্রাট হয়েও, তাঁর পিতা দশরথ স্বয়ং বহু পত্নীর পাণিপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও, পিতার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সীতার অভাবে অন্য কুমারীর পরিগ্রহণের কল্পনাও রামচন্দ্রের প্রাণে স্থান পায় নি, তিনি স্বর্ণসীতা

নির্ম্মাণ করিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের কাজ সারলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে বেঅকুফ বা আহাম্মক ব'লে গাল দেন নি, এমন সমালোচক ত' বড় দেখি না, কিন্তু তথাপি জেনো, শ্রীরামই ভারতের আদর্শ, সীতাই ভারতের আদর্শ। অবশ্য, এই গেল এক দিকের কথা। অপর দিকের কথা এই যে, বিবাহ-প্রথা শুধু বহুপরায়ণতা দূর করার জন্যই সৃষ্টি হয় নি, পরন্তু অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার স্রোতে বাধা দেবার জন্যও হ'য়েছে। বহু নারীতে বা বহু পুরুষে যার অবারিত দ্বার, সে পুরুষ বা নারী প্রায় যত ইচ্ছা তত ইন্দ্রিয়চর্চ্চা কত্তে পারে। এক সঙ্গিনী শারিরিক ভাবে অপটু হ'লে অবারিত পুরুষ অপর সঙ্গিনী খুঁজে নিতে পারে। এক সংসর্গী ক্লান্ত হ'লে অবারিত নারী অপর পুরুষ খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু বিবাহিত দম্পতীর কামাচার বাইরে থেকে অর্গলিত ব'লে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হ'লে স্বামীকে প্রতীক্ষা কত্তে হয়, গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি স্নেহ-ভাবের অনুশীলন ক'রে ক'রে মনের কামভাবকে আয়ত্তে আনতে হয়; স্ত্রী পীড়িতা হ'লে তার স্বাস্থ্যের প্রতি দরদী ভাব পোষণ ক'রে মনকে স্নেহের বলে কামাতীত কত্তে হয়। স্বামী সন্তান-জননে অক্ষম হ'লে বা সাময়িক কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে গেলে স্ত্রীকে ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হয়। এভাবে বিবাহ-প্রথা কামাচারকে কৌশলে শাসন করে, সংযত করে। সুতরাং বিবাহ করার পরে শুধু যে একপরায়ণ হবে, তাই নয়,

একপরায়ণতার ভিতরেও ক্রমে ক্রমে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। পরনারীর প্রতি আসক্তি-হেতু স্ত্রীসঙ্গের যে অনিচ্ছা বা পরপুরুষের প্রতি আসক্তি-হেতু স্বামিসঙ্গে যে অরুচি, তেমন অনিচ্ছা বা অরুচি সংযম নয়। নিজ স্ত্রীকে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেও নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষ-হেতু ইন্দ্রিয়সংযম নিজ স্বামীকে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকটী স্পন্দনে ভালবেসেও উন্নততর নৈতিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ-হেতু ভোগেচ্ছাদমন,—এই হচ্ছে বিবাহের নৈতিক দিক।

বিবাহের আধ্যাত্মিক দিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বিবাহের আধ্যাত্মিক দিক সকল দিকের চাইতে মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী এবং স্ত্রী যখন পরস্পরকে ভালবাসে, তখন একে অন্যের সান্নিধ্যকে চায়। শুধু সমীপবর্ত্তী হ'য়েই তাদের তৃপ্তি হয় না, বুকে বুক, মুখে মুখ, দেহে দেহ মিলিয়ে তারা এক হ'তে চায়। কিন্তু দেহকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রেও তাদের মিলনের তৃষ্ণা মেটে না, কেন না তখন অনুভব করে যে, বুকের পাঁজরগুলি যেন মিলনের বাধাস্বরূপ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর যার সাথে যার মিলনের জন্য পরস্পর এত ব্যাকুল হ'য়ে আলিঙ্গনের পাশকে এত দৃঢ় কচ্ছে, তারা এক দেহাতীত বস্তু, বুকের পাঁজর চূর্ণ না হ'তে যেন তার সাথে

তার মিলন সাধিত হবে না। এই যে আত্মার সহিত আত্মার মিলনের অফুরন্ত অদমিত অতৃপ্ত আবেগ, এইটাই হচ্ছে বিবাহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বা আধ্যাত্মিক দিক্। এক জনের দেহের একাংশের সঙ্গে অপরের দেহের অংশবিশেষকে মিলিত ক'রে যে উন্মত্তবৎ মাতামাতি, সেইটেই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, সেটা আসল উদ্দেশ্য থেকে পরিভ্রংশ বা স্তুন্নন্দ্বজ্বদনঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের পরিপূর্ণ-মিলন সাধনের যে প্রেরণা, তাকে সম্যক্ সার্থকতা দেওয়াই হচ্ছে বিবাহের প্রকৃত এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

দেহের মিলন; শ্বাসের মিলন; আত্মার মিলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জড় চক্ষে জড় দেহটার মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া একজনের সাথে একজনের পরিচয় কি ক'রে হয়? তাই আত্মা জড়দেহ ধ'রে তোমার কাছে এলেন স্ত্রী হ'য়ে, তোমার আত্মা জড় দেহ ধ'রে তোমার স্ত্রীর কাছে গেলেন স্বামীর রূপ ধ'রে। দেহ দেহকে চিন্‌ল, কিন্তু আত্মা আত্মাকে চিন্‌লেন না, কেননা, দেহটা স্থূল, আত্মা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। কিন্তু দেহ দেহকে চিনতে গিয়ে নিজের জড়ত্ব যে এক বিষম অপবাদ এবং এক দারুণ অযোগ্যতা, এটা ক্রমশঃ ধরা পড়তে লাগ্‌ল। তখন তোমাদের পরিচয়ের সূত্র হবে শ্বাস

আর প্রশ্বাস। স্থূল চক্ষে দেহ দেখে দেহীর প্রমাণ মিলে, কিন্তু দেহে যখন অনাস্থা এল, তখন দেহ আর আত্মার মাঝে সংযোগ-সূত্র হচ্ছে শ্বাস আর প্রশ্বাস। দেহের ভিতরে যে দেহী আছেন, এইটী বুঝা যায় শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে। সুতরাং তখন তোমাদের মিলনের দূতী হবে শ্বাস আর প্রশ্বাসের ঐক্য সাধনের চেষ্টা। আধ্যাত্মিক সাধনের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে ক্রমশঃ এই কথা বুঝবে এবং তখন এই বিষয়ে উপদেশ পাবে। দেহের সঙ্গে দেহের মিলন যখন নিতান্তই নিরর্থক ব'লে জ্ঞান হবে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাসে মিলন সেধে একের আত্মা অপরের আত্মাকে চিন্‌বার পথে নাম্‌বে। এ তত্ত্ব তোমাদেরই নিজস্ব ধন, অন্য কোনও সম্প্রদায় এ তত্ত্বের ছন্দাংশ মাত্রও জানে না। একটী মাত্র শ্বাসের সঙ্গে যখন পূর্ণ পরিচয় হবে, তখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্য তার ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ কর্ব্বেন। তখন মিলন পূর্ণ হবে।

সন্ন্যাসের বিভিন্ন দিক্

শ্রীঘর হইতে একটী যুবক আসিয়াছেন, তিনিও উক্ত উপদেশগুলি মন দিয়া শুনিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেউ যদি বিবাহিত জীবন যাপনে অনিচ্ছুক হ'য়ে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে, তবে তার সম্পর্কেও কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এই সুপাত্রটীকে হাতের

কাছে পাই, তবে ত' কথা জম্‌বে এবং উপদেশ দেওয়া সার্থক হবে। আচ্ছা তবু বলি।

সন্ন্যাসের পারিবারিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা পরিবার থেকে একটা ছেলে কিম্বা একটা মেয়ে সংসার ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল, পারমার্থিক সাধনে সে জীবন বিকিয়ে দিল, ইন্দ্রিয়-সুখে বা সাংসারিক আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত না হ'য়ে একক, নিঃসঙ্গ ও আসক্তিবর্জ্জিত জীবন সে যাপন কর্ল্ল,—এটা একটা তুচ্ছ ঘটনা নয়। একটা পরিবারের ইতিহাসে এটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার মত এক মহান্ বৃত্তান্ত। এই জন্যই শাস্ত্রে এবং লোকপ্রসিদ্ধিতে রয়েছে যে, কোনও বংশ থেকে একজন ত্যাগীর আবির্ভাব হ'লে সেই বংশের উৰ্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ এবং নিম্নতন সপ্ত পুরুষ মোট চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হ'য়ে যায়।

সন্ন্যাসের সামাজিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক পরিবার থেকে একটা ক'রে সিংহবীর্য্য সন্ন্যাসী যদি বেরিয়ে যায়, তাহ'লে সমগ্র সমাজের চক্ষে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ-রূপে তাঁদের স্মৃতি জেগে থাক্‌বে এবং সজাগ প্রহরীর মত সমাজকে অতর্কিত ইন্দ্রিয়-লোলুপতার আক্রমণ থেকে রক্ষা কর্‌বে।

সন্ন্যাসের দৈহিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসী দেহ-সম্ভোগ-নিরপেক্ষ পবিত্র জীবন যাপন করে ব'লে তার দৈহিক শুচিতা অজ্ঞাতসারে গৃহীদের নিকট বরণীয় ব'লে পূজিত হয়। এর ফলে বিনা উপদেশে গৃহস্থদের ভিতরে দৈহিক সংযম সম্পর্কে সচেতন ভাব জন্মে।

সন্ন্যাসের নৈতিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসী স্বভাবতই একক ও নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনকারী ব'লে তার নীতিজ্ঞান ও নৈতিক যুদ্ধ একমাত্র নিজেকে অবলম্বন ক'রেই চলে। অপরের ভালমন্দতে তার যাওয়ার রুচি কম, খাঁটি সন্ন্যাসীর সাধারণ মেজাজই হচ্ছে,—"অরতির্জন সংসদি"। পশ্চিমা গাঁজাখোর সাধুদের পর্য্যন্ত দেখ্‌বে, স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁরা কত নির্ব্বিকার, নিঃস্পৃহ ও অনাসক্ত, তাঁরই ধূনির আলোকে ব'সে সন্ধ্যার পরে রূপবতী পথিক রমণী আটার পিণ্ড চট্‌কাচ্ছে কিন্তু সাধুর চক্ষে চপলতা নেই, তেরছা চাউনি নেই, নারী-মূৰ্ত্তিটি বারংবার দর্শনের জন্য অন্তরে আকুলি-ব্যাকুলি নেই। তার সাধন অবিরাম নিজের অন্তরকে শাসনে রাখা, পরচর্চ্চায় তার অবসর নেই, পরপ্রসঙ্গে তার ফুরসুৎ কম।

সন্ন্যাসের আধ্যাত্মিক দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসীর জীবনের যত সংযোগ-বিয়োগ সব মুখ্যত একজনের সঙ্গে, যাঁকে সে নিজের আরাধ্য ব'লে জানে এবং যাঁর সাথে নিজের অভেদত্ব উপলব্ধি করার জন্যই যত হোম, যাগ, তপস্যার অনুষ্ঠান করে। সেই একজনাকে জানলেই তার সকল জানা হ'ল, সেই একজনাকে পেলেই তার সকল পাওয়া হ'ল। দেহ দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না, নিজের আত্মাকেও সে স্পষ্ট বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তাই সে দেহ ও আত্মার মধ্যে সংযোগের সেতুস্বরূপ যে শ্বাস ও প্রশ্বাস অবিরাম ছুটেছে, তার মধ্য দিয়ে অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার সাথে ভাব জমাবার ব্রত নিয়েছে।

কলিকাতা

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নামটী না ভুলে যাই

শ্রীশ্রীবাবামণি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন,—

তোমাতে যখন নির্ভর করি
তখনি অভয় পাই, *

* অখণ্ড-সংহিতা'য় প্রকাশিত সকল সঙ্গীতগুলিই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের স্বরচিত। এই সকল গান বিনানুমতিতে কেহ প্রকাশের অধিকারী নহেন।

তোমারে যখনি করিহে স্মরণ
তখনি ভাবনা নাই।
নির্ম্মল তুমি, নিত্য শুদ্ধ,
নিখিল পুণ্য, অপাপবিদ্ধ,
তব উজ্জ্বল নামের অনলে
কলুষ হয় যে ছাই।
স্নিগ্ধ তোমার অখণ্ড-নাম
তপ্ত পরাণে অসীম আরাম,
তুমি যে কেমন তখনি বুঝিগো
যখনি ও নাম গাই।
ওগো অনন্ত পরমানন্দ
হৃদয়পদ্মে হে মকরন্দ,
এইটুকু দয়া রাখিও আমারে,
নামটী না ভুলে যাই।

জীবনের প্রধানতম বিপত্তি

"এইটুকু দয়া রাখিও আমারে, নামটী না ভু'লে যাই" এই পদটুকু শ্রীশ্রীবাবামণি বারংবার গাহিতেছিলেন, এই সময়ে একজন ভক্তের সমাগম হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দেখ্, ভগবানের পরমপবিত্র নাম ভুলে যাওয়াই জীবনের সবচেয়ে বড় বিপত্তি। নাম ভুলে থাকাই সব চেয়ে বড় দুঃখ, সব চেয়ে বড়

সন্তাপ। সর্ব্বসন্তাপহারী নামকে কণ্ঠের হার কর, হৃদয়ের রত্ন কর। নামকে জান অন্ধের যষ্টি, নামকে জান নয়নের তারা, নামকে জান সীমন্তিনীর সীঁথির সিন্দুর, নামকে জান ললাটের জয়টীকা।

কলিকাতা
২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

বহু পত্র লেখা হইয়াছে। একজন কলেজের ছাত্র কোনও কোনও পত্রের অনুলিপি রাখিয়াছেন।

অখণ্ড-মন্দিরের আকৃতি

ত্রিপুরা রহিমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরিকল্পনা করিয়া স্থায়ী ভাবে তোমরা যখন অখণ্ড-বিগ্রহের অর্চ্চনার মন্দির গড়িবে, তখন তাহা সমত্রিভুজাকৃতি করিয়া গড়িবে, ইহা আমার একটা রুচি জানিও। ত্রিভুজের তাৎপর্য্য এই যে, তোমার অর্চ্চনার স্থান ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে লইয়া। ত্রিকোণের তাৎপর্য্য এই যে, তোমার অর্চ্চনার বিগ্রহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে লইয়াই অথচ ইহাদের অতিক্রম করতঃ তদূর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়া। গায়ত্রী পড়িবার কালে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ত' বল? তোমাদের মন্দিরের গঠনের সহিত তাহার ভাব-সমন্বয় থাকিয়া যাইবে। ত্রিকোণাকৃতি মন্দিরের ব্যবহারিক সুবিধা এই হইবে যে,

বিগ্রহ যদি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর নিকটে বেদীর উপরে স্থাপিত হন এবং ত্রিভুজের পাদদেশ যদি থাকে উপাসকদের ঠিক্ সম্মুখে, তাহা হইলে এক সময়ে উপাসকদের সমাবেশ অনিশ্চিতরূপে বর্দ্ধিত হইলেও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ চন্দ্রাতপে আবৃত করিয়া আসনের পর আসন বিছাইয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

উপাসনা-মন্দিরের বিগ্রহ

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"উপাসনা-মন্দিরের মধ্যে একমাত্র ওঙ্কার ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহ থাকিবেন না। কিম্বা পূজিত হইবেন না। এই বিষয়ে একনিষ্ঠার চ্যুতি ঘটিলে তোমাদের গুরুতর আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, কৃষ্ণ, রাম, মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি প্রাচীন ও পরবর্ত্তী মহাপুরুষ-গণের মূর্ত্তি সাধনের ভাবোদ্দীপক বা রুচিবর্দ্ধক বলিয়া যাহারা মনে করিবে, তাঁহারা মন্দিরের বহির্দ্দেশে যে কোনও স্থানে ইঁহাদের প্রতি-মূর্ত্তির সম্মাননা করিতে পারেন। কিন্তু পূজার বিগ্রহের স্থানে ওঙ্কারই এক এবং অদ্বিতীয় থাকিবে। দেশ-প্রচলিত নানা কুলপরম্পরাগত মজ্জাগত সংস্কার-সমূহের সহিত বৃথা কলহে শক্তিক্ষয় বা কালক্ষয় ক্ষতিকর বিবেচনায়ই আমি এইটুকু উদারতা প্রদর্শন করিতেছি পরন্তু আমার অন্তরের অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু এক ওঙ্কার হইতেই উল্লিখিত

সুপ্রাচীন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, তখন ওঙ্কারের অর্চ্চনাকালে মন যাহাতে কোনও প্রকারেই একনিষ্ঠাচ্যুত বা অন্যনিষ্ঠ না হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে করণীয়। তোমাদের এক এক জনের এক এক প্রকারের পূর্ব্বপোষিত সংস্কার রহিয়াছে, যেই সংস্কার শৈশব হইতেই হৃদ্দেশে আরোপিত হওয়াতে সহসা সমূলে উৎপাটন করিলে কাহারও কাহারও হৃৎপিণ্ড শতধা ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া বিপজ্জনক দশার উৎপত্তি ঘটিতে পারে। আমার উদারতা প্রকৃত-প্রস্তাবে তোমাদের কাহারো কাহারো পক্ষে সম্ভাবিত সেই বিপত্তির কথা ভাবিয়া মাত্র। নতুবা সর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, সকল অতীত ভুলিয়া গিয়া, সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাতহীন হইয়া, সকল দুর্ব্বলতা ও দ্বিধাকে পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে একনিষ্ঠ প্রযত্ন লইয়া অখণ্ড-নামের একটী মাত্র পরমসত্তায় নিজেকে ডুবাইয়া দাও, ইহাই আমার অন্তরের ব্যাকুলতম আকাঙ্ক্ষা ও নিগূঢ়তম অভীপ্সা।"

উপাসনা-কালীন স্থান-বণ্টন ও আসন

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপাসনা-কালীন উপবেশন-স্থান বণ্টনের মধ্যে বংশগত

মর্য্যাদা বা কাঞ্চনগত কৌলীন্যকে প্রবেশ করিতে দিও না। যাঁহারা সুরদক্ষ, স্তোত্রবিশারদ ও সুকণ্ঠ, স্বভাবতই তাঁহারা উপাসনা-পরিচালক আচার্য্যের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সান্নিধ্যে বসিবেন। অপর সকলে যিনি যেমন যেমন আসিবেন, তিনি তেমন তেমন বসিবেন। পুরুষ ও মহিলাদের বসিবার মিশ্রিত ব্যবস্থা করিবে না। স্থানাভাবপ্রযুক্ত বা অচিন্তিতপূর্ব্ব কারণ বশতঃ কখনও মিশ্রিতভাবে বসিবারই ব্যবস্থা যদি হইয়া যায়, তাহা মার্জ্জনীয়, কিন্তু সাধারণতঃ মহিলাদের বসিবার স্থানটুকু অন্ততঃ একহস্ত পরিমিত একটী ব্যবধান-চিহ্ন দ্বারা পৃথক্ করা হইবে। সাধু, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, ঋষি, তপস্বী, বানপ্রস্থীরা একদিকে পৃথক্ হইয়া বসিয়া পড়েন, পড়িবেন, কিন্তু উপাসনা-কালে কে গৃহী, কে গৃহত্যাগী, কে ধনী, কে দরিদ্র, কে ব্রাহ্মণ, কে চণ্ডালবংশজাত প্রভৃতির উপরে কোনও গুরুত্ব আরোপ না করাই সঙ্গত হইবে। প্রণামকারী বিনম্রবুদ্ধি শুদ্ধ ও সম্ভব-পক্ষে স্নাত যে-কোনও ব্যক্তি যে-কোনও ব্যক্তির সহিত এক পংক্তিতে উপাসনা করিবেন। ব্যক্তিগত উপাসনায় প্রত্যেকের আসন ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, একজনের আসন, মালা প্রভৃতি পারতপক্ষে অপরে স্পর্শ করিবে না কিন্তু সমবেত উপাসনাকালে বিস্তীর্ণ ঢালা আসনে একের পরে এক সারিতে সকলে বসিয়া যাইবেন এবং ছুঁৎমার্গকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবেন।"

উপাসনা-কালীন পরিধেয় বস্ত্রাদি

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"উপাসক মাত্রেরই পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্পর্কে নিজ নিজ রুচি প্রধান থাকিবে। কিন্তু শুভ্রবর্ণে-ই সর্ব্ববর্ণের সমন্বয় বলিয়া বস্ত্র-উত্তরীয় প্রভৃতি শ্বেত-বর্ণই প্রশস্য হইবে। উপাসনা-কালীন হস্ত ও পদদ্বয় বস্ত্রাভ্যন্তরে সম্ভবমত আবৃত থাকিবে।"

স্তোত্রাদির সুর

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্তোত্রাদির সুর সুনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সঙ্ঘমধ্যে কোনও প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির আবির্ভাব হইল, আর তিনি নিজ সুরজ্ঞানের মাপকাঠিতে স্তোত্রাদির সুরকে ঢালিয়া সাজাইলেন,—এইরূপ হইতে দিও না। সুর যাহা রহিয়াছে, তাহাই চিরকাল রহিবে, ইহার মধ্যে নূতন কোনও পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। সুর অন্তরের ভাবসমৃদ্ধির পরিপুষ্টিকারক জানিবে। ঋষির অন্তরের পরিপুষ্টির বিচার সঙ্গীতের ওস্তাদেরা করিতে সমর্থ নাও হইতে পারেন।"

উপাসনার লয় এবং যন্ত্র-সঙ্গৎ

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপাসনার স্তোত্রসমূহের সুরে নির্দ্দিষ্ট লয় ও মান

রহিয়াছে, প্রত্যেকের কর্ত্তব্য তাহা যত্নের সহিত শিক্ষা করা। অনুত্তেজিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে উপাসনার স্তোত্রাদি গীত হইবে এবং এমন সুধীর সুশান্ত লয়ে হইবে যেন তাহা ধ্যানাবেশের সহায়ক হয়। দ্রুতধাবনজনিত তালোল্লাস উপাসনার স্তোত্রোচ্চারণের উদ্দেশ্য নহে। কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিশিয়া গভীরতম রস-সমন্বয় সৃষ্টি করিবে এবং কোনও যন্ত্রের দ্বারা তাহার সহিত সঙ্গৎ করা হইবে না।"

করকেন্দ, (মানভূম)
৯ আষাঢ়, ১৩৪১

অদ্যপ্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি ধানবাদ হইতে করকেন্দ কলিয়ারীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বক্‌সীর বাসায় আসিয়াছেন। বিকালের লরিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুনকী ফিরিবেন।

অবসাদ কেন আইল রে

কালীবাবুর বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেতারখানা এক কক্ষে রাখিয়া কক্ষান্তরে বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির হঠাৎ সেতার বাজাইবার কৌতুহল হইল। পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি কখনও সেতার বাজান নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ সেতারের উপর হাত বুলাইতেই বাজাইবার কায়দা হাতে আসিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি সেতার বাজাইতে বাজাইতে মৃদু কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

অবসাদ কেন আইল রে
মলিন কেন রে আনন?
গিয়াছে জীবন যাক্ না বহিয়া,
থাক' তুই নামে মগন।।
নামের সাধনে লভিবি শান্তি,
ঘুচিবে পিপাসা, ঘুচিবে ভ্রান্তি,
দগধ পরাণ জুড়িয়া হাসিবে
অমল কমল-কানন।।
ক্ষণিকের দিন ক্ষণিকে ফুরায়,
প্রেমিকের তাতে কিবা আসে যায়?
প্রেমের পরশে নামের হরষে
জগত-সেবার সাধন।।

সঙ্গীতের বিপত্তি

সেতার-বাদন-সহকৃত মৃদু কণ্ঠে গীত সেই সঙ্গীত শ্রবণে ওস্তাদপ্রবর শয্যা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—রেখাব, গান্ধার, ধৈবত, কোমল, কড়িমধ্যম, আরোহণ ও অবরোহণে নিখুঁত এমন বিশুদ্ধ মূলতান রাগ আপনি শিখলেন কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সেতার-বাজনা শিখেছি যেথায়।

ওস্তাদজী বলিলেন,—মহাপুরুষের শক্তিই আলাদা।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রতিবাদের কণ্ঠে বলিলেন,—না, না, আমি কিন্তু একথা বল্‌ছি না যে, আমি রাগ-রাগিণী নিজে নিজে শিখেছি।—সঙ্গীতে আমার অধিকার অতীব অল্প। এক সময়ে সঙ্গীতের চর্চ্চা সুরু করেছিলাম। তানপুরা নিয়ে গলা সাধতাম এবং কোনও একটা নূতন সুর বা রাগিণী পেলে বা কোনো রাগিণীর কোনো একটা নূতন ঢং কোথাও দেখ্‌তে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পদ রচনা ক'রে তার মধ্যে তাকে ধ'রে রাখ্‌তাম এবং তাই কখনো কখনো গাইতাম। একদিন কমলাসাগর ষ্টেশনে ব'সে আছি ট্রেণ ধর্‌ব বলে, কয়েকজন লোক আমার হাতে তানপুরা দেখে জবরদস্তি করে, ধর্ল্লেন যে, গান গাইতেই হবে। গান ধর্ল্লাম,—"মানুষ খুঁজিয়া মরে মানুষেরই মন।" কোন্ সময়ে ট্রেণ এল আর চলে গেল, টেরও পেলুম না। গানের শেষে শ্রোতারা সব যার যার স্থানে চলে গেলেন, পরের ট্রেণের প্রতিক্ষায় আমি একাকী সেই নির্জ্জন ষ্টেশনে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, যে সঙ্গীত কর্ত্তব্যকে এভাবে ভুলিয়ে দেয়, ট্রেণ মিস্ করায়, সেই সঙ্গীতের চর্চ্চা আর করা উচিত কিনা। আর একদিন অন্য একস্থানে গান কত্তে বসেছি, হঠাৎ এক তব্‌লাওয়ালা এলেন সোজা বেশ্যা-গৃহ থেকে অস্নাত অপবিত্র অবস্থায় গানের সঙ্গে তাল বাজাতে, চক্ষু তাঁর রক্তবর্ণ, মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই দিন ভাবলুম যে, নাঃ সঙ্গীত ছেড়েই দিতে হবে। এর

কিছুদিন পরে একদিন একটী পল্লীগ্রামে একজন অনুরক্ত সদ্‌ব্যক্তিকে নিয়ে গান গাচ্ছি, আমি গেয়ে যাচ্ছি আর উনি তব্‌লায় ঠেকা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বাইরের একটী গ্রাম থেকে জন কয়েক খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এলেন দেখাশুনা কত্তে। এর মধ্যে একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক, যাঁর এক কন্যা সম্প্রতি বহু ব্যক্তির নিকটে অসামান্যা তপস্বিনী ব'লে পূজা পাচ্ছেন, হঠাৎ তব্‌লা-বায়া কেড়ে নিয়ে নিজে বাজাতে সুরু কর্ল্লেন। প্রথম বাদকটী ভক্ত লোক, তিনি শুধু বোল বাজিয়ে তালের ঠেকাটী দিয়ে যাচ্ছিলেন, জানা সত্ত্বেও রং-পরণের কারীকুরি ধরেন নি, কারণ, আমাদের কাছে গান হচ্ছে একটা সাত্ত্বিক সাধনা, এর ভিতরে রাজসিকতা প্রকাশের অবসর নেই। কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোক তব্‌লাবায়া নিয়ে বাদ্য-বিদ্যার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কত্তে লাগলেন। যখন গানটী শেষ হ'ল, তখন তিনি নিদারুণ ভঙ্গীতে তেহাই বাজিয়ে শম দিলেন এবং তব্‌লা ছেড়ে পূর্ব্ব বাদকের প্রতি অহঙ্কৃতের দৃষ্টিতে মুহুর্মুহু তাকাতে লাগ্‌লেন। হঠাৎ এরকম একটা বিসদৃশ ব্যবহারে বেচারী অপমান ও মনের দুঃখে যেন মাটীতে মিশে গেলেন। আমার মনে কষ্ট হ'ল। আমি দর্পীর দর্প চূর্ণ করার জন্য একটা শক্ত তালের গান ধর্ল্লাম। দর্পী বাদক একের পর আর ক'রে অনেক তালেরই ঠোকা দিয়ে শেষে যখন আর হালে পানি পাচ্ছেন না, তখন আমি আমার অনুগত ব্যক্তিটিকে তব্‌লা ধর্‌তে বল্লুম। তাঁর এসব

জানাই ছিল, প্রায়ই আমার সঙ্গে সঙ্গত হ'ত, সুতরাং তব্‌লার মুখে যেন খই ফুট্‌তে লাগ্‌ল। যে গো-বেচারীকে এতক্ষণ নিতান্ত অজ্ঞ বা নিরেট ব'লে মনে ক'রে অবজ্ঞা করা হচ্ছিল, তার এই অদ্ভুত গুণপণা দেখে আগন্তুক ওস্তাদ ভদ্রলোক খুবই অপ্রতিভ হ'লেন এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের সাম্‌নে তিনি বিশেষ ভাবে অপদস্থও হলেন। এই ঘটনার পর থেকেই আমার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প এল যে, সঙ্গীতের চর্চ্চার আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনই সকল সঙ্গীতের সেরা। এর পরেও একটা ঘটনা আছে, যা মুখ ফুটে আমি কাউকে কখনো বল্‌ব না। সঙ্গীতের সংসারে অনেক নামী নামী ওস্তাদ অন্যের পরিশ্রম ও গবেষণার ফলকে নিজের আবিষ্কার ব'লে বারোটা বৎসর ধ'রে চালিয়ে যান, এরূপ ঘটনাও আছে। তাই, ঠিক করলাম তানসেন হ'য়ে লাভ নেই, সাধু হরিদাসের নিষ্কাম জীবন যাপনই পরম শ্লাঘ্য।

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৯শে আষাঢ়, ১৩৪১

নেতা হওয়ার মানে

আশ্রমের কতিপয় কর্ম্মীকে লইয়া নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের কথা হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নেতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়

তার সেবাবুদ্ধি দিয়ে। শুধু হুকুম কর্লেই নেতা হয় না। কিম্বা নির্ব্বিচারে যাকে-তাকে তুই-তুমি ব'লে হাঁকা-হাঁকি কর্লেও কর্ত্তা হয় না। তোমার সেবাবুদ্ধিতে যদি তোমার সহকর্ম্মীরা অভিভূত হ'য়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি থাকে তোমার ভিতরে এমন শক্তি, যার বলে দশজনকে একত্র ক'রে একটা কাজে লাগান যায়, যার বলে ক্ষুদ্রের কাছ থেকে ক্ষুদ্র কাজ, বৃহতের কাছ থেকে মহৎ কাজ আদায় করা যায়, যার বলে রক্তচক্ষুর শাসনে নয় পরন্তু স্নেহময় ভালবাসার বলেই অলসকে আলস্য ছাড়্তে, দ্বিধাগ্রস্তকে সংশয় ছাড়্তে বাধ্য করা যায়, তবে গিয়ে তুমি নেতা হবে। নেতা হবার সখ অনেকেরই থাকে, কিন্তু নেতা হওয়ার মানে যে সহস্র সহস্র জনের সেবক হওয়া, একথা কয় জনের মনে থাকে?

নেতার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিপীলিকার কাছ থেকে পিপীলিকার যোগ্য আর ঐরাবতের কাছ থেকে ঐরাবতের যোগ্য কাজ আদায় করা হচ্ছে নেতার লক্ষণ। ইন্দুর-আরসোলাকেও উপেক্ষা না ক'রে তাদের কার কি দেবার আছে, কর্ব্বার আছে, তা' আদায় করা, তা' করিয়ে নেওয়া নেতার লক্ষণ। আমার মনোমত সহকর্ম্মী হ'ল না ব'লে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা, নেতার এক নিদারুণ

অযোগ্যতা। সহকর্ম্মীরা নিম্নদরের কর্ম্মী ব'লে তাদের কোনো কাজ ছুঁতে না দেওয়া আর নিজেই একা সব কাজ কত্তে পারি ব'লে অহমিকা পোষণ করা, প্রকৃত নেতৃত্বগুণের বিরোধী। সহকর্ম্মীদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত থাকা কিম্বা অবিরাম তাদের দোষ খুঁজে বেড়ান, নেতার পক্ষে সদ্‌গুণ নয়। কোনো সহকর্ম্মীর সঙ্গে কলহ হ'য়ে গেলে জিংলাপোড়া সাপের মত তাকে দংশন ক'রে একোবারে বাঁশঝাড়ের আগায় ব'সে তার শ্মশানের আগুন না দেখা পর্য্যন্ত নাম্‌ব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করা, নেতার পক্ষে নিদারুণ অযোগ্যতা। সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কখনো মতভেদ বা মনোভঙ্গ হ'লে, দোষ যারই হোক্, সেই সব সহকর্ম্মী নিজেদের ত্রুটী স্বীকার ক'রে পুনরায় বন্ধুত্ব কামনার পথে অগ্রসর হ'লে যে ব্যক্তি সকল কথা বিস্মৃত হ'য়ে অবিলম্বে প্রীতি স্থাপনা করে না, সে ব্যক্তি কর্ম্মীসমাজের চণ্ডাল এবং কোনো কালেই নেতৃস্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য নয়। সহকর্ম্মি-বিশেষের কোনও বিপদে আপদে যদি অপ্রত্যাশিত সাহায্য-সহায়তা চারিদিক থেকে আসে, কিম্বা সহকর্ম্মি-বিশেষের চরিত্রগত মধুরতার জন্য যদি বহু ব্যক্তি তার প্রতি গভীর ভাবে স্নেহাকৃষ্ট হয়, এতে যে ব্যক্তি অন্তরে আনন্দ অনুভব না ক'রে বরঞ্চ পরশ্রীকাতরতার জ্বালা অনুভব করে, সে ব্যক্তি কর্ম্মি-সমাজের চামার এবং কোনো কালেই নেতৃপদ লাভের যোগ্য নয়।

পাকা নেতার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহস্থের ঘরে পাকা গিন্নীরা কি করেন জান? লাউ-তরকারী রান্না করেন, কিন্তু লাউয়ের খোসাটাকে যত্ন ক'রে রেখে দেন, পরের দিন খোসা-চর্চ্চড়ী হবে। আলুর ডাল্না রাঁধেন, কিন্তু আলুর চোক্লাগুলো রেখে দেন, পরের দিন চোক্লা ভাজা কর্ব্বেন ব'লে। পাকা গিন্নীর হাতে অপচয়ের যোগ্য কোনো বস্তুই নেই, নিকৃষ্টতম জিনিষকেও তিনি কোনো না কোনো রূপান্তরে নিয়ে পরিবেশনের যোগ্য করেন। বাঁধা-কফির শক্ত পাতাগুলি তিনি ফেলে দেন না, শিলায় পেষণ ক'রে দুটী পোস্ত দানা দিয়ে অপূর্ব্ব দেবভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করেন, কুমড়োর দানাগুলির খোসা খুলে নিয়ে তিল দিয়ে বেটে উপাদেয় বড়া করেন, ফুলকফির শক্ত ডাঁটাগুলিকে তিনি আলু, বেগুন, কুমড়ার সহযোগে সুখসেব্য তরকারিতে পরিণত করেন, পাকা নেতার লক্ষণ হচ্ছে এই। বানর-সেনাকে ব্যূহবদ্ধ ক'রে কি শ্রীরামচন্দ্র মহাযুদ্ধ চালান নি? চন্দ্রগুপ্ত আর শিবাজী ত' পার্ব্বত্য লোকদের এনে গ'ড়ে পিটে দক্ষ সৈন্যদলে পরিণত করেছিলেন। বুদ্ধি এবং নিপুণতার তারতম্য জগতে থাক্বেই কিন্তু যেমন বুদ্ধির বা যেমন নিপুণতারই লোক এসে জুটুক, তাকেই তার যোগ্য কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দিতে পারা হচ্ছে পাকা নেতার লক্ষণ।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে আষাঢ়, ১৩৪১

আশ্রমের একজন কর্ম্মী শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠ ও আশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিচালন-ব্যবস্থা কি হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি ত' আর অনন্তকাল এই পাঞ্চভৌতিক দেহে বিরাজ করিবেন না।

মঠ ও আশ্রম-সমূহের ভবিষ্যৎ

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোমরা ত' বাবা একই সংসার থেকে সবাই বে'র হ'য়ে আস নি! এক এক জনের বংশ-সংস্কার এক এক রকম। তাই, তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মিলনের ছন্দটী ত' আগে জ'মে উঠুক, আশ্রমগুলির ভবিষ্যৎ-পরিচালনার ব্যবস্থার কথা তখন ভাব্‌ব। আরো এক কথা, তোমরা কেউ কেউ সংসার ছেড়ে এসেছ নিতান্তই হুজুগে। কেউ কেউ এসেছ, সংসারের দায়িত্ব দেখে তা' পালন সম্পর্কে অন্তরে বিপুল উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়ে। কেউ কেউ এসেছ, সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি অন্ধ অনুরক্তি নিয়ে কিন্তু এই জীবনের ক্লেশ ও মহিমা, দায়িত্ব ও মর্য্যাদা সম্পর্কে কোনোও ধারণা না রেখে। কেউ কেউ আমৃত্যু জীবসেবা-মূলক কর্ম্মময় জীবন যাপনের পবিত্র উদ্দেশ্যে এসেছ। কেউ কেউ বা অকৈতব ভগবৎ-প্রেমের প্লাবন অন্তরে উপলব্ধি ক'রে ছুটে এসেছ এখানে। কেউ হয় ত' এখন নিতান্তই

ভিজা বিড়াল, কিন্তু কর্ত্তৃত্বটী হাতে পেলেই একেবারে শার্দ্দুল-মূর্ত্তি ধরবে। কে কি উদ্দেশ্যে এসেছ, কিছুকাল গেলে তা' তোমাদের নিজেদের কাছে ধরা পড়্বে এবং সমাজে তোমাদের যার জন্য যে স্থানটী নির্দ্ধারিত রয়েছে, তোমাদের নিজ নিজ চিত্তসংস্কার অনুযায়ী ঠিক্ সেই সেই স্থানে তোমরা ফিরে যাবে বা লেগে রইবে। তখন আমি নির্দ্ধারণ কত্তে পার্ব্ব যে, একটী মঠ বা আশ্রমকে অপর সকল মঠ বা আশ্রমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ক'রে, ভবিষ্যৎ পরিচালন-ব্যবস্থা করা উচিত, না সকল মঠ বা আশ্রমের মিলিত-মতে গঠিত একটী মণ্ডলীর উপরে যাবতীয় মঠ বা আশ্রমের পরিচালন-ভার অর্পণ করা উচিত, অথবা প্রত্যেকটী মঠ বা আশ্রমকে স্বাধীন গঠনতন্ত্র দিয়ে যাওয়া উচিত। এই বিষয়ে এখন আমি কিছুই চিন্তা করি নি। প্রত্যেকটী মঠ বা আশ্রম সম্পর্কে আমার ভবিষ্যৎ-বোধ একোবারে অনাসক্ত। কোনো আশ্রম হয় ত' আদৌ থাকবে না, এমন কি একটাও হয় ত' থাক্‌বে না, থাক্‌বার হয় ত' প্রয়োজনও জগতে কিছু থাক্‌বে না। এই হচ্ছে আমার দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমি আশ্রমের পর আশ্রমে কুলীর মত ভূতের বেগার খাটছি। বৃহত্তর কর্ত্তব্য বা বৃহত্তম উদ্দেশ্যের পরিপন্থী দেখ্‌লে আমি হয় ত' যে-কোনও সময়ে যে-কোনোও আশ্রম যে কাউকে যে কোনও সর্ত্তে দান ক'রে নিজে পুনরায় এক বৃক্ষতলে ব'সে সকল নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা শ্রীভগবানের চরণ-সেবার

উদ্দেশ্যে অনন্যাশ্রয় জীবন যাপন কত্তে পারি। এই সব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ এত অল্প যে, তোমাদের কারো যদি এসব বিষয়ে কোনো মতলব থাকে, তবে জোর জবরদস্তিতে আমার কাছ থেকে যা আদায় করার ক'রে নাও।

মঠ বা আশ্রমাদি পরিচালনে গৃহস্থ ভক্ত ও ত্যাগী কর্ম্মী

প্রশ্ন হইল,—মঠ বা আশ্রমাদির কার্য্য-পরিচালনার ব্যাপারে তৎসংশ্লিষ্ট গৃহস্থ ভক্ত এবং গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদের কার উপরে কার কিরূপ অধিকার থাকা উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, মানুষ মাত্রেরই একটা কর্ম্মক্ষেত্র প্রয়োজন, এখন তুমি ত্যাগীই হও, আর গৃহস্থই হও। গৃহস্থদের নিজ নিজ পুত্র-কলত্র-পরিবৃত সংসারটিই প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, অন্যান্য সকল কর্ম্ম-ক্ষেত্র এই একটী ক্ষেত্রেরই স্বার্থকে নিয়ত অনুবর্ত্তন করে। ত্যাগীদের কর্ম্মক্ষেত্র বা সংসার হচ্ছে মঠ বা আশ্রম। পরন্তু গৃহস্থদের পক্ষে মঠ বা আশ্রমগুলি অবসরের চিত্ত-বিনোদন-ক্ষেত্র, শোক-দুঃখের বা আশাভঙ্গের সান্ত্বনা সংগ্রহের কেন্দ্র, উচ্চাশা উদ্দীপনা ধর্ম্মোৎসাহ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার-ঘর। সুতরাং মঠ বা আশ্রম-সমূহের ভিতরে কোনও কারণেই গৃহস্থেরা গিয়ে নিজ নিজ কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব, নেতৃত্ব, অধিকার, দাবী বা জিগীষাকে প্রতিষ্ঠিত

ক'রে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীদের স্বাতন্ত্র্যের উপরে হস্তক্ষেপ করুক, অন্ততঃ আমি ত' এরূপ ব্যবস্থা কামনা করি না। তবে, একজন বা একদল ত্যাগি-নামধারী ব্যক্তি যদি ত্যাগের আদর্শের অবমাননা ক'রে মঠ বা আশ্রমকে নিজ নিজ নীচ ইন্দ্রিয়পরিতর্পণের উপকরণ-রূপে ব্যবহার করে, তবে তাদের অপসারিত ক'রে ত্যাগী-নামের উপযুক্ত সদ্‌গুণান্বিত এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে মঠ বা আশ্রম তুলে দিতে অধিকারী, যাঁর বা যাঁদের দ্বারা উক্ত মঠ বা আশ্রমের চিরাচরিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুশীলন অব্যাহত-ভাবে চল্‌তে পার্ব্বে। গৃহস্থ মাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত আশ্রমগুলিকে এমন ভাবে সহায়তা করা, যাতে এর অন্তর্ভুক্ত ত্যাগী কর্ম্মীরা অল্প আয়াসে আশ্রম-স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত কত্তে পারেন। আবার ত্যাগী-মাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত, আশ্রমগুলিকে এমনভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করা, প্রথমতঃ যাতে গৃহস্থ ভক্তদের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কুশলের কোনও বিঘ্ন উৎপদিত না হয়, দ্বিতীয়তঃ যাতে গৃহস্থ ভক্তদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ অকুশলের মূলোৎপাটন হয়, এবং তৃতীয়তঃ যাতে আশ্রমগুলির সংস্পর্শ সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, উত্থানে-পতনে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় গৃহীদের মনে ধর্ম্মোৎসাহ, সৎ-প্রেরণা, সদাচার, সান্ত্বনা, অভয় ও আনন্দ বিতরণের সহায়ক হয়। মঠ এবং আশ্রমাদি সম্পর্কে গৃহস্থ ভক্ত এবং ত্যাগী কর্ম্মীদের মধ্যে এইটিই হবে পারস্পরিক সম্পর্ক।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮শে আষাঢ়, ১৩৪১

একটী ভ্রমণ-তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং তদনুযায়ী শ্রীশ্রীবাবামণি আগামী কল্য আশ্রম ত্যাগ করিবেন।

একত্র প্রসাদ গ্রহণ

সকল কর্ম্মীদেরই আহারের জন্য ডাকা হইয়াছে। কিন্তু একজন কর্ম্মী ছুতানাতা করিয়া দেরী করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহস্থের সংসারে খাবার ডাক পড়া মাত্র সবগুলি লোক এক সঙ্গে এসে খেতে না বসলে কুললক্ষ্মীদের অতিশ্রমে প্রাণান্ত ঘটে। কিন্তু তবু কতকগুলি মূর্খ সংসারীকে দেখা যায়, যারা সময় পার ক'রে খাবে, রন্ধনকারিণী বা পরিবেশন-কারীদের অসুবিধার কথা একবারও ভাব্‌বে না। আশ্রমগুলিতে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদেরও খাবার ডাক পড়া মাত্র আসা উচিত। সকলে মিলে একত্র প্রসাদ গ্রহণ করাকে গৌরবের ও আনন্দের ব্যাপার ব'লে গণ্য করা উচিত।

খাদ্য, বস্ত্র, শয্যায় সমব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকলের সঙ্গে একত্র ব'সে আহার করায় তাঁর অসুবিধা হ'তে পারে, যিনি কোনও একটা নিশ্চিত ব্রত নিয়ে আছেন। যথা, দীর্ঘকাল মৌন বা একান্ত সাধন-ভজন প্রভৃতি। কিন্তু অন্যান্যের পক্ষে ছোটখাট

কোনো অসুবিধার সম্ভাবনা থাক্‌লে তাকে উপেক্ষা করাই উচিত। সহকর্ম্মীদের একত্র মিলে সানন্দে প্রসাদ-গ্রহণে যদি অরুচি আসে, তবে অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, অন্তরে আত্মাভিমান ঢুকেছে। সকল সমকর্ম্মীরা যে ভোজ্য-পানীয় তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ কচ্ছেন, গুরুতর শারীরিক কারণ ব্যতীত শুধু নিজের একটা বিশেষত্ব প্রমাণের জন্য তা' ছাড়া অন্যরূপ ব্যবহার করার চেষ্টাও সাধু-সংসদে অত্যন্ত নিন্দনীয় জান্‌বে। সকলে যা' খায়, মিতব্যয়িতার নাম ক'রেও তুমি তা' থেকে আলাদা হ'য়ো না; ঐগুলি সব জঘন্য খাদ্য, একথা ব'লেও তাদের থেকে পৃথক হবার চেষ্টা ক'রো না। কারণ, এই জাতীয় চেষ্টায় সঙ্ঘের ঐক্যের মূলদেশ আহত হয়। খাদ্য যদি জঘন্য হয়, তবে যাতে সকলের পক্ষেই শরীরপোষক বলবর্দ্ধক খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, সেজন্য প্রয়াসী হও। খাদ্যে যদি অমিতব্যয় দেখ, তবে সকলের পক্ষেই যাতে মিতব্যয় প্রবর্ত্তিত হ'তে পারে, তার চেষ্টা কর। খাদ্যে, বস্ত্রে, শয্যায় বা অপরাপর ব্যবস্থায় সকলের সমত্ব না থাক্‌লে সে সঙ্ঘ দীর্ঘকাল আত্মকলহ এড়িয়ে চল্‌তে পারে না।

পুরুলিয়া

২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১

জীবনের জটিলতার নিদান

যুবকেরা উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। একজনকে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পান, তামাক, চা, চুরুট, গাঁজা, ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য, বিলাসিতা, আলস্যমূলক তাস-পাশা-দাবা প্রভৃতি খেলা, বাচালতা এবং স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি এসব বর্জ্জন করবে। এতে দেখ্‌বে জীবন-যাত্রা কত সহজ কত সরল হ'য়ে আসে। তোমাদের জীবনের যত জটিলতা, তার অধিকাংশই ত' বাবা তোমাদের নিজেদের দ্বারা সযত্নে সৃষ্ট ও সমাদরে পুষ্ট।

বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনে তোমরা যে জীবিকাকেই আশ্রয় কর না কেন, বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা সর্ব্বাবস্থাতেই কর্ব্বে। জাপানের রিক্সাওয়ালারা নাকি রিক্সা টানার ফাঁকে ফাঁকে অবসর পাওয়া মাত্র বসবার আসনের নীচ থেকে খবরের কাগজ খুলে নিয়ে পড়তে থাকে। কলকাতায় পশ্চিমা পান-বিড়ি-বিক্রেতাদের দেখা যায় যে, গ্রাহক যখন থাকে না, তখন তারা তুলসীদাসী রামায়ণ খানা খুলে নিয়ে সুর ক'রে ক'রে পড়ে। তোমরা কোনও অবস্থাতেই বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা ত্যাগ ক'রো না।

জগতের গুরু হও

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি

তোমাদের সম্পর্কে অন্তরে কি কামনা পোষণ করি জানো? আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে এক একজন জগদগুরু হও। একদা ভারত নিখিল জগতের গুরু ছিল, আজ সে নিখিল জগতের শিষ্য হয়েছে বল্লেও ভুল বলা হয়, আজ সে নিখিল জগতের ক্রীতদাস হয়েছে। এই দাসত্ব, এই পরানুকরণ, পরেচ্ছার এই অর্থহীন অনুবর্ত্তন, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরসেবার জন্য বাধ্যকর জীবন-গ্রহণ,—এই দৈন্য থেকে, এই লজ্জা থেকে, এই পরাভব থেকে তোমরা ভারতকে উদ্ধার কর। জগতের উপরে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে তোমরা রক্তশোষী, বিত্তশোষী, শান্তিশোষী উপদ্রবে পরিণত হও, এ আমার কামনা নয়। কিন্তু নির্ব্বীর্য্য ক্লীবের মত উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থেকে থেকে নিজের ঘরে ব'সে সুদূর দেশের অধিবাসী জাপানী, মার্কিনী, জার্ম্মেণী প্রভৃতি বিদেশীর লাথি খেয়ে যে মরছে,—এই দুর্দ্দশার দ্রুত অবসান আমি চাই। তারই জন্য তোমাদের ভিতরে অবিলম্বে জগদুদ্ধারকারী বিশ্বগুরুর অচিন্তনীয় শক্তির আজ আবির্ভাব প্রার্থনা কচ্ছি।

চেনা আর না-চেনা

একটী যুবক বলিলেন,—বাবা, আপনি পুরুলিয়াতে এত কাছে আশ্রম করেছেন, কিন্তু এই পুরুলিয়ার লোকেরা বলতে গেলে আপনাকে কেউ চেনেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এই পুরুলিয়া সহরের বুকের উপরে ব'সে যারা দেশ ও সমাজের সেবার জন্য বুকের রক্ত ঢালছেন, তাঁহাদের চেনেন কয় জনে? সুতরাং আমাকে বড় কেউ চেনেন না ব'লে দুঃখ ক'রো না। চেনা আর না-চেনা ত' বাবা দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। নিকটের সর্ব্বত্যাগীদের যাঁরা চিন্‌লেন না, দূরের লোকদের চেনার দাবী তাঁদের কাছে ক'রো না। আরও একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, মানভূমে আমি একজন চাষা মাত্র, চাষীরা ছাড়া অন্যেরা আমাকে চিনবেন কেন?

বন্ধুর মর্য্যাদা

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বন্ধু- বান্ধবের সংখ্যাবৃদ্ধি সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষতিকর। খেলার মাঠের বন্ধুতা অনেক সময়ে পড়াশুনার শত্রুতা করে, রেষ্টুরেণ্টের বন্ধুতা অনেক সময়ে জীবনোন্নতির ব্যাঘাত করে। তোমার চেয়ে যিনি অধিক সৎ, অধিক সত্যবাদী, অধিক সচ্চরিত্র, অধিক উচ্চকাঙ্ক্ষ, অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ, এমন লোক ছাড়া অন্যকে বন্ধুর সম্মান দিও না। সদ্ব্যবহার করবে জগতের সকল লোকের সাথে, অশিষ্ট বা অভদ্র হবে না একজনেরও সঙ্গে। কিন্তু বন্ধুর নির্ভর কদাচিৎ দু-এক-জনের উপরে দেবে এবং বন্ধু ব'লে যাকে মানবে, তার বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রাণ দেবে।

সভ্যতার মাপকাঠি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে সভ্যতার মাপকাঠি কি জানো? বন্ধু-বৎসল বন্ধু, পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান, পতিব্রতা পত্নী আর উৎকোচে অনাদরকারী রাজভৃত্য, বিশেষতঃ পুলিশ।

সম্প্রতি নাকি জনৈকা প্রগতি-পন্থিনী মহিলা কোনও পত্রিকাবিশেষে হিন্দু নারীদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে কটূক্তিপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। একটী যুবক সেই প্রবন্ধটীর মর্ম্ম স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই সব বিষয়ে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক হিন্দু-সংসার বালিগঞ্জের ফ্লাটে বা চৌরঙ্গীতে অবস্থিত নয় এবং সব হিন্দু মহিলারাই বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারের স্ত্রী বা কন্যা নয়। সুতরাং বিশাল হিন্দু-সমাজের পুরমহিলাদের প্রকৃত দুঃখ কোথায় এবং তার প্রতীকারের বাস্তব পন্থা কি, তা' আবিষ্কার করা এসব লেখক-লেখিকাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। এজন্যই তাঁরা অনেক বিষয়ে কল্পনার জাল বোনেন এবং সেই মায়াময় বস্তুকেই সত্য আলেখ্য জ্ঞান ক'রে হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত হাত-পা ছুঁড়ে গালি দিতে থাকেন। এসব অবাস্তব প্রবন্ধে বিশেষ মূল্যদান তোমাদের উচিত নয়। তবে, এসব প'ড়ে এই কর্ত্তব্যে তোমাদের সুস্থির হওয়া উচিত যে,

বর্ত্তমান ভারতের নারী-জাতির সুখ, শান্তি ও উন্নতির প্রকৃত বিঘ্নগুলি কি, নিজেরা অপক্ষপাত চোখে সমাজের প্রত্যেকটী স্তরে তা প্রত্যক্ষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ কত্তে হবে এবং গুরুতর প্রতিক্রিয়া বা আকস্মিক উদ্বেগ সৃষ্টি ব্যতীতই অতি দ্রুত তার প্রতিকারের যে পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তা' খুঁজতে হবে। পন্থা যখন বুঝে নিলে, তার পরে আর আলস্যে ব'সে থাকা চল্‌বে না।

শিষ্যের দোষে গুরুর লাঞ্ছনা

কুমিল্লা জিলান্তর্গত কোনও পল্লীগ্রামের জনৈক দীক্ষিত শিষ্যকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্র লিখিলেন। তাহার অংশবিশেষ নিম্নরূপ। যথা,—

'অমৃতময় নামের অবিরাম সেবারূপ পবিত্র কর্ত্তব্য হইতে নিমিষের জন্যও বিচ্যুত হইও না। এই বিষয়ে প্রখর লক্ষ্য রাখিবে। সংসারের সহস্র হট্টগোলের ভিতরেও নামে অব্যাহত ভাবে লাগিয়া থাকিও। তোমরা নিশ্চয়ই চাহ যে, জগৎ আমাকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করুক। কিন্তু তোমাদের জীবন দেখিয়াই যে লোকে আমাকে বিচার করিবে, ইহা ভুলিয়া যাইও না। জগতের অনেক ত্রিলোকোদ্ধারক্ষম মহাপুরুষ নিজেরা সম্পূর্ণরূপে দোষাতীত হইয়াও শিষ্যানুশিষ্যদের জীবনের দোষাবহ আচরণের জন্য কলঙ্কভাজন হইয়াছেন। শিষ্যের দোষে গুরু, পুত্রের দোষে পিতা, কন্যার দোষে

মাতা, পত্নীর দোষে পতি, আশ্রিতের দোষে আশ্রয়দাতা, ছাত্রের দোষে শিক্ষক এ জগতে অনেক লাঞ্ছনা পাইয়াছেন।"

এখনই নামজপ সুরু কর

"কাজ কমিবে, অবসর হইবে, তার পরে দয়াল ঠাকুরের নাম লইবে, এই বুদ্ধি ছাড়িয়া দিও। যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে, ততক্ষণ মানুষের আর কাজ কমে না। কাজ যতই কমাইতে, গুছাইতে, শৃঙ্খলিত করিতে যাও না কেন, দুদিন পরে পরেই অপ্রত্যাশিত এক এক অবস্থা আসিয়া নূতন নূতন সঙ্কট, জটিলতা ও গূঢ়গ্রন্থি রচনা করিবে। সুতরাং নামের সেবারূপ সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী কাজটুকুকে ভবিতব্যের উপরে ভারার্পিত না করিয়া এখনি সুরু কর। কোন্ নিঃশ্বাসটীর পরে আর হয়ত নিঃশ্বাস ছাড়িবে না, কোন্ হৃৎস্পন্দনটির পরে আর হয়ত হৃৎস্পন্দন ঘটিবে না, চক্ষুটী কোন্‌বার নিমীলিত করিবার পরে পুনরায় তাহা উন্মীলনের সম্ভাবনা থাকিবে না, তাহা কি জান? সুতরাং এখনি, অবিলম্বে, বিনা ওজরে, বিনা আলস্যে সকল কার্য্যের, সকল দায়িত্বের, সকল কর্ত্তব্যের মধ্যখানে নামজপ সুরু কর।"

বাঁকুড়া

২৬শে আষাঢ়, ১৩৪১

শ্রীশ্রীবাবামণি বাঁকুড়া আসিয়াছেন। কৃষি-বিভাগের

পরিপ্রদর্শক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়ের বিশেষ আমন্ত্রণেই বাঁকুড়ায় তালিকা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ আরও কয়েকজনও হেমবাবুর সহিত শ্রীশ্রীবাবামণিকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিলেন,—প্রেমেন্দ্র বাবুর উদ্যোগে এখানে সেন্ট্রাল টাউন-হলে আপনার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

অপরাহ্ণে হেমবাবুর গৃহেই কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন।

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেকটী মানুষকে তার প্রতিভাযোগ্য উৎকৃষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সাধারণ উপাদানে গঠিত মানুষকেও অনুশীলনের গুণে উৎকৃষ্টতর নিপুণতায় মণ্ডিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা। অতীত বা বর্ত্তমান যে কোনও শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিচার ক'রে তার মূল্য-নিরূপণ কত্তে হ'লে এইটাই হবে মানদণ্ড। ভবিষ্যতের জন্য কোনও শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী কত্তে ব'সেও, এইটীই হওয়া উচিত প্রত্যেকের আদর্শ।

শিক্ষার ব্যয় অপব্যয় নহে

অপর এক কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার

জন্য ব্যয়কে কখনই অপব্যয় জ্ঞান করা উচিত নয়। শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যয়। পিতার কর্ত্তব্য তাঁর উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। রাজার কর্ত্তব্য তাঁর রাজস্বের অর্দ্ধেক প্রজাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। শিক্ষার জন্য যে ব্যয়, তা' সদ্ব্যয়। এই উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করা যায়, তা' আবার সমগ্র সমাজের মঙ্গলরূপে ফিরে আসে।

ভূস্বামীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে ভূস্বামী ব'লে যাঁরা অভিমান কর্বেবন, তাঁদের এই অভিমানের মূল্য দিতে হবে। যতটুকু ভূমির উপরে যিনি নিজেকে ভূস্বামী জ্ঞান করেন, ততটুকু ভূমির উপরে বিচরণকারী প্রত্যেকটী প্রাণীর মঙ্গলামঙ্গল তাঁকে দেখ্‌তে হবে। গ্রামের, জনপদের, প্রদেশের বা একটা সমগ্র দেশের মালিক ব'লে যিনি নিজেকে মনে করেন, তাঁকে গ্রামের, জনপদের, প্রদেশের বা একটা সমগ্র দেশের কুকুর-বিড়াল, ছাগল-ভেড়া, গো-মহিষ থেকে সুরু ক'রে প্রত্যেক নরনারীর হিতচিন্তা কত্তে হবে। এটী তাঁর ভূস্বামিত্বের ঋণ, এটী তাঁর সেলাম এবং খাজনা পাবার অধিকারের মূল সর্ত্ত। এজগতে ভূমির কোনও স্থায়ী মালিক নেই, ভূমিস্থ প্রাণিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধন যিনি করেন,

তিনিই ভূমির উপরে অধিকার স্থাপনের সঙ্গত দাবীদার। অপরের দাবী শুধু জুলুমবাজী। একদিন জগতের সব ভূস্বামীকেই দুনিয়াদারীকে সেলাম ঠুকে পরকালের পথে প্রয়াণ কত্তে হবে। প্রত্যেক ভূস্বামীরই আখেরের কথা ভাবা কর্ত্তব্য।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার স্থানে স্থানে আশ্রম-স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবদ্‌বিমুখ মানব-মানবীর মনে ঈশ্বর-চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার আর দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্যই হ'তে পারে না। কিন্তু নিজে না জাগ্‌লে ত' আর অপরকে জাগানো যায় না। তাই, নিজের অন্তরের সমগ্র প্রসুপ্ত শক্তিকে একনিষ্ঠ ঈশ্বর-সাধনের দ্বারা সম্যক্‌-রূপে জাগিয়ে তোলার সহায়করূপে আশ্রম-কর্ম্মীদের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা আগে প্রয়োজন। ভারতের বহু সহস্র বর্ষের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ইতিহাস এক মহাসমন্বয়ের ইতিহাস। আর্য্য-দ্রাবিড়ের মিলন, আর্য্য-অনার্য্যের মিলন, আর্য্যদের ভিতরে শক, হূণ, পারদ, পুলিন্দ এবং গ্রীকের অতর্কিতে মিশে যাওয়া, তারপরে কয়েকশত বছর ধ'রে হিন্দু-মুসলমানের ঘোরতর অস্ত্রা-অস্ত্রি সত্ত্বেও ক্রমিক কৃষ্টিগত ঐক্যের পথে অগ্রগমন,—এ সবই ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশেষত্ব কিন্তু এই বিশেষত্বের আত্মপ্রকাশ সম্ভব

হয়েছিল শুধু ঈশ্বর-চেতনার প্রবোধনকে সকল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মূল ব'লে গ্রহণ করাতে। ভারতের অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শুধু একমাত্র ঈশ্বর-চেতানার ক্রমবিকাশকে নিয়ে। এই ক্রমবিকাশকে ধ'রে রাখা এবং ধারাবাহিক ভাবে পরিপোষণ করাই হচ্ছে আশ্রমাদি স্থাপনের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মহীন সভ্যতার পরিণাম

প্রশ্ন হইল,—ধর্ম্ম ব্যতীত কি সভ্যতার উন্নতি এবং বিকাশ সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা সম্ভব, কিন্তু সেই উন্নতিকে এবং সেই বিকাশকে স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ধ'রে রাখবার জন্য আবার ধর্ম্মেরই প্রয়োজন। এই ত' ইয়ুরোপ-আমেরিকা এক দেদীপ্যমান বা চোখ্-ঝল্সানো সভ্যতার পত্তন করেছে, কিন্তু "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" কথাটাকে অগ্রাহ্য করার দরুণ এই বিপুল সভ্যতা নিদারুণ ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণে পরিণত হয়েছে এবং "মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্" কথাটাকে উপেক্ষা করার দরুণ জাতিতে জাতিতে কদিন পরে পরেই এমন এক এক আত্মনাশা কলহ হচ্ছে যেন দুই অজগর সর্প কর্ত্তৃক পরস্পরের সমগ্র শরীর ব্যাদিতবদনে চূড়ান্ত নৃশংসতার সহিত ভক্ষণ। ধর্ম্মহীনতার ভিতর দিয়ে যে সভ্যতা, সমৃদ্ধি, আর সুখ, তা

শুধু বর্ব্বরতা আর দুর্ব্বৃত্ততারই পত্তন করে, শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ বা অভয়ের কারণ কখনো হ'তে পারে না।

জনতা বনাম সেবকের সঙ্ঘ

অতঃপর সেবা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবা-প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই কর্ম্মীদের মনে রাখ্তে হবে যে, সাধারণ জনতায় আর সেবকদের সঙ্ঘে তফাৎ আছে। সাধারণ জনতার কোনও শৃঙ্খলা থাকে না, প্রত্যেকটী ব্যক্তির উদ্দেশ্যের কোনও একতানতা থাকে না, লক্ষ্যের কোনও ঐক্যমত থাকে না। অতএব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ইচ্ছা বা অভিপ্রায় তাদের কর্ম্ম দ্বারা পরিপূরণ পায় না। হৈ-চৈ, চীৎকার, কোলাহল ও অর্থহীন বাচালতা জনতার ধর্ম্ম কিন্তু নীরব, একাগ্র, সুধীর, সুস্থির কর্ম্মসম্পাদন সেবকের ধর্ম্ম। উচ্ছৃঙ্খল জনতার ফলাফলে দৃষ্টি থাকে না, কাজ করে তারা ঝোকের বশে, খেয়ালের চরিতার্থতার জন্য এবং বিপদ এলেই দেখ্তে না দেখ্তে ছত্রভঙ্গ হয়, বুক পেতে বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, ভয়ের কারণ না ঘটা পর্য্যন্ত সে যেমনি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া, ভয়ের কারণ অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তেমনি ভীরু, তেমনি দ্রুত-পলায়নপর। কিন্তু সেবকের সঙ্ঘ বাহাদুরী দেখাবার জন্য তাল ঠুকে কখনো বিপদের মুখে ছুটে যায় না, শত বিপদ, শত বিঘ্ন সে দূরে দূরে রেখে চলে। বিপত্তির

সঙ্গে লড়াই দিতে গিয়ে সে শক্তিক্ষয় করে না, হিসাব ক'রে ওঠে, বসে, পা ফেলে, কিন্তু সেবাব্রতের মধ্যপথে অপ্রত্যাশিত বিপদ কিছু এসে সুমুখে দাঁড়ালে তার পা টলে না, বক্ষ দুরু দুরু ক'রে কাঁপে না, শৃঙ্খলার শক্তিতে সে চরম দুঃখকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে দ্বিধাহীন পরিতৃপ্তিতে বুক পেতে সয়ে নেয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান, সৎসাহস, আদর্শের প্রতি অনুপম আনুগত্য, সঙ্ঘের মহত্ত্ব সম্পর্কে অবিচল আস্থা এবং সঙ্ঘের আদর্শের নিশ্চিত জয়বত্তা সম্পর্কে অবিনশ্বর বিশ্বাস তাকে মৃত্যুর করাল মুখব্যাদানের মধ্যেও মৃত্যুঞ্জয় ক'রে তোলে।

সেবকের শ্রেষ্ঠতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৈনিকের যেমন ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সাহস ও চরিত্রবলের পরীক্ষা সব সময়েই ঠিক্ যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, পরন্তু যুদ্ধাবসানে নিশ্চিন্ত বিশ্রামকালেই, সেবকেরও চরিত্র-পরীক্ষার সময় তার কর্ম্মাবসরে। সংগ্রামে যে দুর্ম্মদ, বিশ্রামেও সে আলস্যের অপরাজিত কিনা,—এইখানেই সেবকের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। গুরুতর দায়িত্ব পড়লে হঠাৎ সাংঘাতিক কর্ম্মী, আর ছোট কাজ হাতে পড়্লে করে উপেক্ষা, অনাদর আর অবহেলা,—এটী সৎকর্ম্মীর লক্ষণ নয়। পরিশ্রমে ও বিশ্রামে, কর্ম্মকোলাহলে ও কর্ম্মবিরতিতে, প্রকাণ্ড দায়িত্বের স্থলে ও দায়িত্ববর্জ্জিত সাধারণ অবসরে সর্ব্বদা যিনি একাগ্র, উদগ্র, সানন্দ ও উদ্যত, তিনিই কর্ম্মীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্যহীন কর্ম্মী ও নেতার নেতৃত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মী হওয়া সহজ, কিন্তু তাদের নেতা হওয়াই অতীব কঠিন। যেখানে সহকর্ম্মীদের মধ্যে অকারণে বা তুচ্ছ কারণে অনৈক্য, সেখানে নেতা হওয়ার মত বিড়ম্বনাও কিছু নেই। সমলক্ষ্য ব্যক্তিদের অসম শক্তি থাক্‌তে পারে, কারো প্রচণ্ড সামর্থ্য, কারো বা স্তিমিত বল থাক্‌তে পারে কিন্তু তাতে নেতার ক্লেশ কমই হয়। যে যেমন যোগ্য, নেতা তাকে তেমন কাজে লাগিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। যে যেমন যোগ্য, তার মতন ক'রে কাজ সৃষ্টি ক'রে তার ভিতরে কর্ম্মীটিকে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই নেতার প্রধান দায়িত্বের উদ্‌যাপন হ'ল। কিন্তু সেবা প্রতিষ্ঠান-সমূহে যে সব কর্ম্মীরা আসেন, তাঁরা অনেকেই জানেন না যে, কে কেন এই প্রতিষ্ঠানে এসে যোগ দিলেন। হাটুরে লোকেরাও হাটে আসার আগে একবার মনে মনে হিসাব ক'রে নেয় যে, হাটে গিয়ে কোন্ কোন্ জিনিষের খোঁজ নেবে, আর কোন্ কোন্ জিনিষ কিনতে হবে। সেই অনুযায়ী পয়সা-কড়িও তারা ট্যাকে ক'রে নেয়। কিন্তু আমি যা' দেখ্‌ছি, আমাদের দেশের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকাংশ সেবক আস্‌ছেন নিতান্তই না জেনে যে, কেন তাঁরা এসে এক একটা সেবা-সঙ্ঘের কর্ম্মীদের সংখ্যা ফাঁপিয়ে তুল্‌ছেন।

হয় ত এ'র কারণ দেশব্যাপী দারিদ্র্য, হয় ত' এর কারণ গার্হস্থ্য জীবনের ব্যাপক অপূর্ণতা, হয়ত এর কারণ অধিকাংশ যুবকের উপার্জ্জনে অক্ষমতা, হয় ত এ'র কারণ আমাদের মজ্জাগত পরমুখাপেক্ষিতা, অথবা হয় ত' এ'র কারণ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা। অথবা সকলগুলি কারণই মিলে একটা জগা-খিচুড়ী পাকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নিজেদের মনকে না জেনে যে সেবকেরা এসে সেবা-সঙ্ঘগুলিকে ভর্ত্তি ক'রে ফেল্‌ছেন, এর ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, সহকর্ম্মীদের ভিতরে সমলক্ষ্যতা না থাকায় অবিরাম কলহ-কচায়নে এক একটা প্রতিষ্ঠানের পরিবেষ্টনী যেন নরকের অনলের ন্যায় প্রতপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এ অবস্থায় চোস্ত নেতাও নিতান্তই মেড়ার শৃঙ্গে প্রহত হীরকখণ্ডের মত ধারহীন, তেজোহীন, শক্তিহীন। সমলক্ষ্য পাঁচ জন কর্ম্মীকে দিয়ে নেতা জগতে অসাধ্য সাধন কত্তে পারেন, কিন্তু অসম-লক্ষ্য লক্ষ লোক দিয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ কত্তে সমর্থ হন না। এজন্যই প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই কর্ম্মীদের মধ্যে লক্ষ্যের সমত্ব, আদর্শের সমত্ব, জীবন-যাপন-প্রণালীর সমত্ব, সুখ-সুবিধার সমত্ব, সুযোগ ও উৎকর্ষের সমত্ব স্থাপনের চেষ্টা হওয়া উচিত।

সমত্ব ও মমত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমত্ব থেকে মমত্ব আসে,

মমত্ব থেকে সমত্ব আসে। সমত্ব ঐক্য স্থাপন করে, মমত্ব অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যে আর অভিন্নত্বে তফাৎ আছে। ঐক্য হ'ল নিজ ব্যক্তিগত সত্তাকে পৃথক্ রেখেও আদর্শের আলিঙ্গনে একে অপরের সন্নিহিত হওয়া। অভিন্নত্ব হ'ল আদর্শের নিবিড়তম আকর্ষণে নিজ নিজ পৃথক্ সত্তাকে ভুলে গিয়ে প্রত্যেকে নিজেদিগকে এক বৃহত্তর সত্তার অংশ-বিশেষ ব'লে জ্ঞান করা এবং একের সঙ্গে অপরে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হওয়া। সমত্ব ব্যক্তিত্বগুলিকে বিভাজ্য রেখেই এক ক'রে দেয়। মমত্ব বিভিন্ন ব্যক্তিগুলিকে অবিভাজ্য সত্তায় পরিণত করে।

ভগবৎ-সেবা ও প্রকৃত মমত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এই মমত্ব জাগতিক বস্তুসমূহের প্রতি অহং-মমাদি বোধ থেকে জগ্রত হয় না, এই মমত্ব জাগে ভগবৎ সম্পর্কে অহং-মমাদি বোধের উদ্দীপনার ফলে। ভগবানকে আপন ব'লে জানলে জগতের সকল কিছুই আপন হ'য়ে যায়, তখন আর পর কিছু থাকে না। এক এক সঙ্ঘের ভগবৎ-বিষয়িণী রতির ধারা ও প্রণালী পৃথক্, এই জন্য নিজ নিজ সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি এই আপনত্বটা আগে অনুভূত হয়। সুতরাং সঙ্ঘকে শক্তিশালী, প্রাণবন্ত, সফল ও মধুমণ্ডিত কত্তে হ'লে সকলকে অকপটে ভগবদাশ্রয়ী হ'তে হবে। ভগবচ্চরণে অহং-বিনাশ ব্যতীত

জগতে শান্তিময় সঙ্ঘ বা সঙ্ঘময় শান্তির প্রত্যাশা করা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বাঁকুড়া

২৭শে আষাঢ়, ১৩৪১

অদ্য অপরাহ্ণে স্থানীয় সেন্ট্রাল টাউন-হলে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রথম বক্তৃতা হইল। শ্রোতা খুব বেশী হয় নাই, হলের দু-তৃতীয়াংশ মাত্র শ্রোতায় পূর্ণ হইয়াছে। বক্তৃতা খুবই উৎকৃষ্ট হইল। দুঃখের বিষয় বাঁকুড়ার একটী বক্তৃতারও কোনও নোট রাখা হয় নাই।

বক্তৃতা ও ব্রহ্মাভিনিবেশ

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি হেমবাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিতেছেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—অপূর্ব্ব যুক্তিনৈপুণ্যের সঙ্গে ভাষা-সৌষ্ঠবের এই অনর্গল সংমিশ্রণ কি ক'রে সম্ভব হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—শব্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মেতে একান্ত অভিনিবেশ হ'লে তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়, বক্তাকে নিজের ইচ্ছাতে কিছুই কত্তে হয় না। ব্রহ্মাভিনিবেশ যেখানে অপূর্ণ, বক্তৃতা এবং বক্তা সেখানে অপূর্ণ।

বাঁকুড়া

২৮শে আষাঢ়, ১৩৪১

কল্যকার বক্তৃতায় বিদ্বজ্জন-সমাজে একটা প্রবল

আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য প্রাতে জিজ্ঞাসু ও দর্শনার্থীর একটা বিপুল ভিড় হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর-নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ-বংশীয় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের ওস্তাদ শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে প্রণত হইলেন। বিষ্ণুপুর বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় উচ্চ-সঙ্গীতের পীঠস্থান।

বক্তৃতা ও সঙ্গীত

ওস্তাদ বলিলেন,—কাল আপনার যে মধুময় সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌লাম, তা' জীবনে ভুলবার নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—সঙ্গীত?

ওস্তাদ বলিলেন,—হাঁ বাবা, সঙ্গীত। ওকে বক্তৃতা বলা ভুল। স্বর-লহরীর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আরোহণ আবার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অবরোহণ, অবিচ্ছেদ নৃত্যের তালে ছন্দে ছন্দে সুরের পর সুর স্পর্শ ক'রেই ক্রমবিকাশ,—এ'কে যদি সঙ্গীত না বলি, ত' সঙ্গীত বল্‌ব কাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এখন বুঝ্‌লাম। তুমি কি গাইয়ে ওস্তাদ?

ওস্তাদ স্বীকার করিলেন যে, বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্যদের নিকট তিনি বহু বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে শিক্ষার্থীদিগকে উচ্চসঙ্গীতের পাঠ দিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে তুমি বুঝ্‌বে। হাঁ,

বক্তৃতাও সঙ্গীত, তবে কেমন সঙ্গীত জানো? যে মহাসঙ্গীত অনাদি অনন্ত কাল ধ'রে বিনা কণ্ঠে বিনা যন্ত্রে বিনা বায়ুস্পন্দনে অবিরাম অবিচ্ছেদ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে আপনা আপনি গীত হচ্ছে ব'লেই এজগতে এত ভাষা, এত শব্দ, এত গান, এত ছন্দ, এত ঝঙ্কার, এত সুর ও এত বাদ্যের উদ্ভব সম্ভব হ'য়েছে, সেই একটীমাত্র সঙ্গীতেরই সব অংশ মাত্র।

ওঙ্কার সঙ্গীত

ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু সে সঙ্গীত বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে মহাসঙ্গীত হচ্ছে, পবিত্র ওঙ্কার, যে ওঙ্কারকে জেনেছিলেন ব'লেই একদা তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা 'ব্রাহ্মণ' এই গৌরবজনক আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সকল বাহ্য আনুকূল্যের নিরপেক্ষ হ'য়ে যে সঙ্গীত আপনা আপনি গীত হয় এবং যেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা অনন্ত থেকে কোটি বিশ্ব অনন্ত-পানে অফুরন্ত বিচিত্র গতিতে অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছে, যা' থেকে কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি আর পুষ্টি, এবং যে মহাসঙ্গীতের মধ্যেই চিরনিবৃত্তি, সেই ওঙ্কার-সঙ্গীত। জড়কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে যত সুর, যত ধ্বনি, যত মীড়, যত গমক, যত আরোহণ, যত অবরোহণ অনুক্ষণ শুনছ, সেই সহস্র-বৈচিত্র্য-ময়ী সুরমূর্চ্ছনা বাবা শুধু ওঙ্কার-সঙ্গীতেরই ক্ষীণতর প্রতিফলন মাত্র।

ওঙ্কার সর্ব্বস্বরের সমাবেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার জড় শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণের অতি সীমাবদ্ধ শক্তি ধারণ করে। তাই, সেই অনন্ত-ধ্বনির কণামাত্র শ্রবণ ক'রেই কর্ণ তোমার ক্লান্ত, হীনবল ও নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তবু সেই বিশাল অখণ্ড অবিচ্ছেদ ওঙ্কারের জড়-জিহ্বাগ্রাহ্য উচ্চারণের ভিতরেও সপ্তস্বর খেলা কচ্ছে। ওম্ শুধু ওম্ নয়, ওম্ মানে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'র সম্পূর্ণ সমন্বয়। ওম্ শুধু সুরসপ্তকই নয়, সুরসপ্তকের মধ্যবর্ত্তী যতগুলি কোমল, অনুকোমল, অতি কোমল, তীব্র, অনুতীব্র, অতি তীব্র শ্রুতি আছে, সবগুলি শ্রুতির পরিপূর্ণ সমাবেশ। মানব-কণ্ঠে এ সমাবেশের উচ্চারণগত প্রতিফলন অতি অসম্ভব ব্যাপার। এ জন্যই বলা হয় যে, ওঙ্কাররূপী ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হন না। কিন্তু ওঙ্কার এই অত্যাশ্চর্য্য সমাবেশ ও অত্যদ্ভুত সমন্বয়। এই জন্যই ওঙ্কারের সাধন সর্ব্বসঙ্গীতের মূল তত্ত্বের, মূল উৎসের, মূল মহিমার সাধন।

বাঁকুড়ার দ্বিতীয় বক্তৃতা

অদ্য রথের দিন। নিকটবর্ত্তী রাজপথে এক বিরাট রথের মেলা হইয়া থাকে। এজন্য অনেকেরই আশঙ্কা ছিল যে, গতকল্যকার ন্যায় অদ্যও শ্রোতা কম হইবে। কেহ কেহ অদ্য বক্তৃতা বন্ধ রাখিতেও পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু

অপরাহ্নে বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া দেখা গেল যে, সেণ্ট্রাল টাউন হল একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, হলে লোক ধরিতেছে না এবং হলের বাহির হইতে বক্তৃতা শুনিবার জন্য অন্ততঃ তিন চারি শত লোক বাতায়ন-পার্শ্বে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সর্ব্বদাই ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে যাইয়া থাকেন, বক্তৃতারম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই সভাস্থল নিদারুণ ভাবে জনাকীর্ণ হওয়াতে অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে সভামঞ্চে গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

অদ্যকার বক্তৃতা আত্মদর্শনের বক্তৃতা। রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে,—দেহ রথের ভিতরে নিজের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিলে আর জন্মমৃত্যুজরার কষ্ট থাকে না, নিবিড় সুখ, নিবিড় তৃপ্তি, নিবিড় আনন্দ, প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত ও দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমা শান্তি লভ্য হয়, সুতরাং নিজেকে চিন, নিজেকে জান, নিজের নিজত্বকে জগতের সহস্র বিপত্তির বিভ্রান্তির মাঝখান হইতে খুঁজিয়া বাহির কর, এই ছিল অদ্যকার দিনের বক্তৃতার বিষয়। বক্তৃতা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল, কেহ অশ্রু-স্বেদ-পুলক-কম্পে আবেশিত হইল, নিবাত-নিষ্কম্প অবস্থায় ধ্যানসুস্থির মূর্ত্তিতে কেহ অচল বিগ্রহের ন্যায় বসিয়া রহিল, কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কেহ আনন্দোজ্জ্বল-দীপ্ত-দৃষ্টিতে বক্তার

পবিত্র মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল মধুনিঃস্যন্দিনী দিব্য বাণীধারা বর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি যখন সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রোতাদের কাহারও স্থান বা কাল সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই রহিল না।

দুর্ভাগ্য যে, বক্তৃতার কোনও স্মারক-লিপি রক্ষিত হইতে পারে নাই।

বাঁকুড়া
২৯শে আষাঢ়,১৩৪১

চরিত্র-বল

প্রাতে কয়েকটী যুবক উপদেশার্থে আসিয়াছেন।

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বদা মনে মনে এই সঙ্কল্প কর্ব্বে,—কোনো অবস্থাতেই আমি মুস্‌ড়ে পড়ব না, মেরুদণ্ড সবসময়ে সরল এবং সবল রাখ্‌ব, দুঃখবিপদ যতই আসুক, ঘাব্‌ড়ে যাব না, স্ফীত বক্ষে নিজ কর্ত্তব্যের পথে এগিয়ে যাব। দ'মে যাবার কারণ আছে, দ'মে যাচ্ছি না, ভীত হবার কারণ আছে, তবু ভীত হচ্ছি না,—এরই ত' নাম চরিত্র-বল। সর্ব্বদা সঙ্কল্প কর্ব্বে,—চরিত্রবলে বলীয়ান্ হব, নির্ভীক হব, সৎসাহসী হব, জীবনের প্রতি রণক্ষেত্রে অপরাজিত থাক্‌বার জন্য অবহেলে মৃত্যু-বরণ কর্‌ব।

পাপ-কার্য্যে আসক্তি কমাইবার উপায়

অপর একজন যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার ভিতরে পরমব্রহ্ম হরি বিরাজ করেন, এই বিশ্বাসটীকে অটুট রাখ্‌বে। তুমি কথা বল তাঁর শক্তিতে, হাট-চল তাঁর শক্তিতে, কাজ কর, বিশ্রাম নাও, জাগ্রত হও, নিদ্রা যাও, উঠ এবং বস, সবই একমাত্র তাঁরই শক্তিতে। অনুক্ষণ এইরূপ চিন্তা কত্তে কত্তে দেখ্‌বে, তোমার পাপকার্য্যে আসক্তি আপনি কমে যাচ্ছে।

সহজতম যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের প্রত্যেকটী শ্বাস এবং প্রশ্বাসের পশ্চাতে ভগবৎ-শক্তির উপস্থিতি সর্ব্বক্ষণ চিন্তা কর্ল্লে বিনা ক্লেশে যোগ-সাধন হয়। এইটীই হচ্ছে সহজতম যোগ। পরমমহিমান্বিত পরমেশ্বর তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মুখপানে না তাকিয়ে অবিরাম তোমাতে শ্বাস আর প্রশ্বাস-বায়ুর গতাগতি বিধান করছেন। এর ভিতর দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব তোমার নিকটে অনুক্ষণ প্রমাণিত হচ্ছে। এই শ্বাস আর প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মহামহিমান্বিত নামকে স্মরণ করাই হচ্ছে কলি-যুগের অশ্বমেধ, কলিযুগের রাজসূয়, কলিযুগের মহাক্রতু। তোমরা অপর যোগ-যাগে সময় ক্ষেপ না ক'রে এই মহাযজ্ঞে আত্মবিসর্জ্জন দাও।

নিষ্কলুষ জীবন, নিষ্পাপ জীবিকা

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের লক্ষ্য হউক নিষ্কলুষ-জীবন, তোমাদের আদর্শ হউক নিষ্পাপ-জীবিকা। দশজনে পাপের পথে দুনিয়ার লোকের কাছে বড় হয়েছে ব'লে তোমরা সেই ক্ষণিক চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ো না। অসত্যের পথে যে লৌকিক অভ্যুদয়, তাকে ঘৃণা কত্তে শিখ, তাকে অনাদর কত্তে সমর্থ হও। হৈম-পর্য্যঙ্ক-শায়িতা বার-বিলাসিনীর কোলের শিশু হ'য়ে জন্ম গ্রহণ কত্তে জগতে কে গৌরব বোধ করে? তোমরা কেউ অলক্ষ্মীর সন্তান হ'য়ো না, পাপের শিশু হ'য়ো না।

কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনে দৃঢ়তা

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার উপরে যদি কোনও কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব পড়ে, তাহ'লে সে দায়িত্বকে উদ্‌যাপনে প্রাণ দিতে স্বীকার থাক্‌বে, তবু শিথিল-প্রযত্ন হবে না। মহৎ কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব মানুষের কাছে রোজ রোজ আসে না কিম্বা জনে জনেও আসে না, সুতরাং মহৎ কর্ত্তব্যের দায়িত্ব পেলে মনে মনে সৌভাগ্য জ্ঞান কর্ব্বে এবং এই সুযোগকে অসফল হতে দেবে না। তোমার উপরে যাঁরা গুরু-কর্ত্তব্যের ভার দিয়েছেন, তাঁরা তোমাকেই এ

কার্য্যের যোগ্যতম পাত্র ব'লে জ্ঞান করেন। তা' নইলে এ ভার তাঁরা অন্যকেও অর্পণ কত্তে পাত্তেন। তাঁরা যে তোমাকে যোগ্য ব'লে মনে মনে বিশ্বাস করেছেন, তাঁদের সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও তোমাকে অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে কার্য্য সম্পাদন কত্তে হবে। ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে যে পরাঙ্মুখ হয় না, তার উপরে ক্রমশঃ বৃহত্তর কর্ত্তব্যের দায়সমূহ ন্যস্ত হয় এবং এভাবেই ক্রমশঃ একজন নগণ্য সাধারণ ব্যক্তি জগৎপূজ্য অসামান্য মহাপুরুষে পরিণত হয়।

বৃহত্তম কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—জগতে মানুষের যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর-সাধনের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য আর কিছু নেই। ভগবানের সেবাই জীবর বৃহত্তম দায়িত্ব, বহত্তম কর্ত্তব্য, বৃহত্তম অধিকার ও বৃহত্তম সৌভাগ্য। এই বৃহত্তম সৌভাগ্যের সম্পর্কে অন্ধ অচেতন থাক্‌লে কিন্তু চল্‌বে না বাছা।

অর্থপিশাচের ধ্যানজপ

অপর একজন যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধ্যান-জপ চিত্তের প্রশান্ততা আনয়ন করে, আত্মস্বরূপ দর্শনের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু অর্থপিশাচের

কখনো ধ্যান-জপ সফল হয় না। নিজের নাড়ীকে যে টাকার তোড়ার মধ্যে পুতে রেখেছে, তার ধ্যানজপ নামে মাত্র হয়, কাজে কিছুই হয় না। এই জন্যেই ধনবান্ মাত্রেরই দানব্রত গ্রহণ করা উচিত। নিজ জন্মবারে কিম্বা দীক্ষার বারে অথবা গুরুবারে, কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মান্য উৎসবাদির তিথিতে অর্থ-পিপাসা নাশের সঙ্কল্প নিয়ে দান করা কর্ত্তব্য। এই দানের উদ্দেশ্য হবে, অর্থলিপ্সার নাশ, মান-সম্মান লাভ নয় বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা নয়। এক একটী মুদ্রা হস্ত থেকে হস্তান্তরে পতিত হবে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌তে হবে—"হে অর্থ, তোমাকে নিয়ে আমার যত চিত্ত-মালিন্য, তোমার সংশ্রবে এসে আমার যত জড়-মুগ্ধতা, সব তোমার সাথে সাথে চ'লে গিয়ে আমাকে শুদ্ধচেতা ও নির্ম্মলেন্দ্রিয় করুক।" প্রতি নির্দ্দিষ্ট দিনে ভাবের অনুশীলন কত্তে কত্তে যখন মন আপনি কতকটা ক্লেদনির্ম্মুক্ত হ'য়ে আস্‌তে থাক্‌বে, ধ্যানজপ জম্‌বে তখন। তার আগে নয়।

ধনের দাস ও ভগবানের দাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তপঃপরায়ণ সাধুসন্তেরা ধনবান্ ব্যক্তিদের অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। ধনীরা জানেও না যে, তারা কত অবজ্ঞার পাত্র। চতুর্দ্দিকের মোসাহেবেরা যখন ভিমরুলের পালের মত ব'সে অবিরাম

গুণ-গুঞ্জন করে, তখন ধনীদের মাথা ঘু'রে যায়। তারা ভাবে যে, জগতের প্রত্যেকটী জীবই বুঝি তাদের স্তাবক হ'য়ে জন্মেছে এবং তাদের স্তাবকতা করাই বুঝি দুনিয়ার লোকের একমাত্র কৃতকৃত্যতা। এই ভ্রমের বশে তারা অনেক সময়ে অনুগ্রহ ক'রে সাধুদের দান কত্তে যায়, অমুক মঠে চাঁদা দেয়, অমুক আশ্রমে ভূমি দেয়, অমুক প্রতিষ্ঠানে দালান-ইমারত তু'লে দেয়। কিন্তু এরা জানে না যে, ঈশ্বর-পরায়ণ সন্তেরা এসব ধনীদের স্তাবকতা করা বা তোয়াক্কা রাখা নিতান্তই অনর্হ কাজ ব'লে গণ্য করেন। তাঁদের জীবন ভগবানের দাসত্ব করবার জন্যে, ধনের দাসত্বের জন্য নয়। প্রকৃত বৈষ্ণব বিষয়ী দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে পথ চলেন, যেন বিষয়ীর বিষাক্ত ছায়ার স্পর্শে নিজ ইষ্ট-ধ্যানানুরত মন বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত না হয়। নিষ্কিঞ্চন সাধুরা রাজা, মহারাজা বিষয়ীর পাপপরিম্লান মুখমণ্ডলের ধ্যান ক'রে স্বীয় ইষ্টের ধ্যান থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিরত না হ'তে হয়।

লক্ষ্য রাখ পরমধনে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধন ছাড়া জগতে চলা অসম্ভব, কিন্তু তার জন্য পরমধনে বঞ্চিত হবার মত নিদারুণ দুর্ভাগ্য আর কি আছে? জীবনধারণের জন্য, মানুষের মত বেঁচে থাক্‌বার জন্য যে ধনের আবশ্যকতা, তাতে অনাদর ক'রো না কিন্তু লক্ষ্য রাখ পরমধনে।

অযোগ্যের আস্ফালন

অপর একজন যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজ চরিত্র থেকে আস্ফালন জিনিষটাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে দাও। যখনি দেখ্‌বে যে, আস্ফালনের প্রবৃত্তি এসেছে, তখনি বুঝবে যে, তোমার যোগ্যতার চেয়ে অযোগ্যতা বেশী। যোগ্য ব্যক্তি নীরবে নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'রে যায়, লোকের সসম্ভ্রম সপ্রশংসা দৃষ্টির পানে সে তাকিয়েও দেখে না, কেউ কিছুটা কম ক'রে ভাব্‌লে কি না, অথবা কাউকে কিছুটা বেশী ক'রে ভাবান যায় কি না, এসব বিষয়ে মন দেওয়ার তার অবসর নেই। পরন্তু, অযোগ্য ব্যক্তিই নিজ যোগ্যতার অভাবটাকে আস্ফালনের আবরণে ঢেকে রাখ্‌তে চেষ্টা করে। চরিত্র-মধ্যে আস্ফালন-প্রিয়তা এসে পড়ছে দেখ্‌লেই খুব সাবধান হবে এবং একদিকে কঠোর আত্ম-পরীক্ষায় মন দেবে, অপর দিকে অবিরাম ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়ে নিজের অহংকে এবং অযোগ্যতাকে বিনাশ করবার জন্য যত্নবান্ হবে।

কর্ম্মমাত্রেই সম্যক মনোযোগ

অপর একজন যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সবাই কিন্তু যোগী হ'তে পারে না। কেউ পারে

না রুচির অভাবে, কেউ পারে না উপযুক্ত প্রতিবেশ-প্রভাবের অভাবে, কেউ পারে না যোগদর্শী মহাপুরুষের উপদেশের অভাবে। কিন্তু বৈষয়িক অবৈষয়িক যে কাজটাই তোমরা যে যখন কর, তখন কর্ম্মমাত্রেই সম্যক্ মনোযোগ দেবার চেষ্টা তোমরা কত্তে পার। এই যে যে-কোনও কাজে মনকে একনিষ্ঠ ক'রে ডুবিয়ে দেওয়ার অনুশীলন, একে তোমরা যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান ব'লে মনে ক'রো।

অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে কাজই ধর, অর্দ্ধপথ থেকে ফিরো না। একেবারে শেষ না দেখে, একেবারে চূড়ান্ত না ক'রে কোনো কাজকে ছেড়ো না। শেষ পর্য্যন্ত দেখে নেওয়ার এই যে প্রবৃত্তি, সাহস বা ধৈর্য এইটাই হচ্ছে যোগাভ্যাসের দ্বিতীয় সোপান। যোগপথের আশ্রয় যতদিন না পাও, ততদিন এই দৃঢ়তার অনুশীলন ক'রে যাও। পরে যখন সত্যি সত্যি যোগপথ পাবে, তখন দেখ্‌বে যে পূর্ব্বের অনুশীলন তোমার কত কাজে আস্‌ছে।

বাঁকুড়ার তৃতীয় বক্তৃতা

শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না বিধায় অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কিছুই আহার করিলেন না। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পরেই প্রবল কম্প দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির জ্বর আসিল। কম্বল

মুড়ি দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি শুইয়া পড়িলেন। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ কি বাবা বক্তৃতা বন্ধ থাক্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বন্ধ থাকাই হয়ত উচিত, কিন্তু আরও দু-এক ঘণ্টা দেখে নেওয়া সঙ্গত।

জ্বরের বেগ কতকটা কমিতেছে মনে করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ঠিক্ সময় মত সভাস্থলে সমাগত হইলেন। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নাই। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা দিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু শরীরকে সামলান যাইতেছে না দেখিয়া টেবিলের উপরে শরীরের ভার দিতে হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা সুরু করিবেন, ঠিক এমনি সময়ে এক অঘটন ঘটিল। একজন শ্রোতার মৃগী রোগ ছিল। তিনি হঠাৎ এক লম্ফ দিয়া উঠিয়াই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন এবং অপর শ্রোতাদের গায়ের উপরে যাইয়া বিক্রম সহকারে হস্তপদাদির আকুঞ্চন-প্রসারণ করিতে লাগিলেন। একটা হট্টগোল সুরু হইয়া গেল। মৃগী-রোগীকে সভাস্থল হইতে টানিয়া বাহির করা হইল এবং এক পার্শ্বকক্ষে নিয়া জল-সিঞ্চন ও বীজনের দ্বারা সুস্থ করার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই ভাবে গোল-মালের ভিতর দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এই অর্দ্ধ-ঘণ্টা সময় শ্রীশ্রীবাবামণি চেয়ারে

বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং ইতিমধ্যে প্রবল জ্বর কতক নামিয়া আসিল, শ্বাস-প্রশ্বাস কতকটা স্বাভাবিক হইল।

বরদা কান্ত রায়

অদ্যকার বক্তৃতাস্থলে অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ এবং বাঁকুড়া ব্রাহ্মণসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত রায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা শুনিতে আসিলেন এবং কলিকাতা হইতে সমাগত নিখিল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার একজন প্রচারক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহিত মঞ্চের অতি সন্নিকটে আসন-পরিগ্রহ করিলেন। ইহা দেখিয়া স্থানীয় একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক, যিনি প্রত্যহ সভাস্থলে নিয়মিত ভাবে আসিতেছেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যুদার মতাবলীতে একান্তই আকৃষ্ট হইয়াছেন, বক্তৃতারম্ভের ঠিক্, পূর্ব্বক্ষণে শ্রীশ্রীবাবামণিকে কাণে কাণে বলিয়া গেলেন,—"ইঁহারা অতীব সংরক্ষণ-পন্থী এবং আপনার বক্তৃতার প্রতিবাদ করিতেই ইঁহারা আসিয়াছেন।" শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল এবং পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"আমার পার্থিব শরীর আজ প্রবল ভাবে জ্বরাক্রান্ত, কিন্তু জ্বরের জন্য আমি কর্ত্তব্য-পালনে ক্রটী করিলে আপনাদের নিকটে অপরাধী হইতে হইত। বিশেষতঃ অদ্য এই সভাস্থলে এমন সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শুভাগমন হইয়াছে,

যাঁহাদের মর্য্যাদা অতিক্রম করা অসাধ্য। এই বিবেচনায়ই আজ সভা বন্ধ রাখা হয় নাই।" শ্রীযুক্ত বরদাবাবু আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, জ্বরের তাপে শরীর পুড়িয়া যাইতেছে। বক্তাকে ধন্যবাদ-প্রসঙ্গে তিনি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—"পূজ্যপাদ স্বামী মহারাজের উপদেশ শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, অতীব রুক্ষ ভাষায় আমাদের অন্যায়কে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলেও তিনি দেশকে, সমাজকে, জাতিকে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই আসিয়াছেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। প্রতিভার সহিত ঐকান্তিকতা ও যোগ্যতার সমাবেশ আমরা অতি অল্পই দেখিয়া থাকি এবং শ্রীশ্রীস্বামীজীর বাক্যে ও কার্য্যে তাহারই আশ্চর্য্য সমন্বয় ও প্রতিফলন দেখিতেছি। তাঁর মত ব্যক্তির জীবন মূল্যবান্, অতীব মূল্যবান্। এই জীবন অতীব তুচ্ছভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। বিবেকানন্দ অকালে চলিয়া গেলেন, স্বরূপানন্দকে অকালে যাইতে দেওয়া উচিত হইবে না। পূজ্যপাদ স্বামীজীর নিকটে করযোড়ে আমার নিবেদন, তিনি যেন দেশের মুখপানে চাহিয়া, আমাদের দিকে তাকাইয়া অসুস্থ শরীর নিয়া এইরূপ গুরুতর শ্রম করিতে বিরত থাকেন।"

শ্রদ্ধেয় বরদা বাবু এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তৎপর দিবস ব্রাহ্মণ-সভা-গৃহে পদধূলি দানান্তর অভিনন্দন-গ্রহণ ও

বক্তৃতা-দানের জন্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ করিতেও ছাড়িলেন না। সভাস্থলে তুমুল হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

বাঁকুড়া

৩০শে আষাঢ়, ১৩৪১

অদ্য জ্বর সারিয়াছে কিন্তু একজন দর্শককেও শ্রীশ্রীবাবামনির চরণ দর্শন করিতে দেওয়া হইল না।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মণ-সভা

বেলা দুই ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত রায় মহাশয় গাড়ী নিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিকে ব্রাহ্মণ-সভায় যাইতে হইবে। ছটাক খানিক বার্লির জল পান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণ-সভায় রওনা হইলেন।

লোকপূজ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সচন্দন ফুল-মাল্য হস্তে শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিলেন।

ব্রাহ্মণ চিরকালই ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদত্ত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণ চিরকালই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপণ-লিপ্সু বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের শত পুত্র হত্যা ক'রে এক রজনীতে যখন তাঁর আশ্রমকুটীরের পশ্চাদ্দেশে বশিষ্ঠ-নিধনের উদ্দেশ্যে শাণিত তরবারি হস্তে সুযোগের প্রতীক্ষা

কচ্ছেন, এই সময়ে বশিষ্ঠ তাঁর সাধ্বী পত্নী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন,—অয়ি সাধ্বি, বল দেখি, আজকের এই চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা-রজনীর দিব্য জ্যোৎস্নার মত বিশ্বতোবিকশিত অতুলন তপস্যা কার? অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—কার প্রভো? বশিষ্ঠ বল্‌লেন,—এরূপ উজ্জ্বল, এরূপ ব্যাপক, এরূপ অপ্রতিম তপস্যা একমাত্র বিশ্বামিত্রের। চিরশত্রু বিশ্বামিত্রের তপোবিভূতির এরূপ অবিমিশ্র প্রশংসা করা একমাত্র বশিষ্ঠের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-নামধারী অব্রাহ্মণ নয়। সমাজের শত অসাম্যের নির্ভীক সমালোচক এবং সহস্র ত্রুটীর নির্ম্মম আঘাতকারী আমাকে ব্যাধবৎ সশস্ত্র দেখেও আপনারা যে আজ ব্রাহ্মণসমাজের অভ্যর্থনা-মণ্ডপে পরমস্নেহে মহাসমাদরে আহবান করেছেন, তারও একমাত্র কারণ এই যে, আপনারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নামের অমর্য্যাদাকারী মিথ্যা যজ্ঞোপবীতধারী নন। ব্রাহ্মণ চিরকালই ব্রাহ্মণ, চিরকালই গুণদর্শী ও ক্ষমাশীল। তদনন্তর শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, বংশগত ব্রাহ্মণত্বের ঐতিহ্য, সমাজে অব্রাহ্মণ-বংশজাত ব্যক্তির তপোলব্ধ ব্রাহ্মণত্বের স্থান কোথায়, ব্রাহ্মণের সম্মান ও অধিকার হ্রাস পাইল কেন এবং কি করিলে ব্রাহ্মণ পুনরায় তাঁহার উচ্চ মহিমায় আরূঢ় হইতে পারেন, এই সকল বিষয়ে কিঞ্চিন্ন্যূন এক ঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান

করিয়া হেমবাবুর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপরাহ্নে পুনরায় টাউন-হলে সভা হইল। অদ্যই শ্রীশ্রীবাবামণির এখানকার শেষ বক্তৃতা। হলে বা হলের বাহিরে জনতার ভিড় অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি মাত্র একটী ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াই বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। অনেকেই দুঃখিত হইলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির শরীর আজ জ্বরমুক্ত হইলেও দুর্ব্বল।

বাঁকুড়া

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশ চন্দ্র দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন।

নিজালয়

অবিনাশ বাবু কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আলোচনার পরে অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং নিজালয়ে শ্রীশ্রীবাবামণিকে আমন্ত্রণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সুনিশ্চিত আলয় হচ্ছে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম, আমি আপনার আমন্ত্রণের বিনিময়ে সেই আলয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ কচ্ছি। ভগবৎ-পাদপদ্মের নিত্যকাল সেবাই আমাদের প্রকৃত

জীবিকা এবং সেই পাদপদ্মের অক্ষয় ছায়াতলই আমাদের নিজালয়।

বাঁকুড়া

৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১

দাম্পত্য সংযমে স্নেহ-ভালবাসার স্থান

একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী যদি সংযমী হ'তে চায়, তবে স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে হবে। স্ত্রী যদি সংযমিনী হ'তে চায়, তবে স্বামীটীকে সঙ্গে টেনে নিতে হবে। তবেই হবে আদর্শ সংযম-সাধনা। যে স্বামী এই আদর্শ-সংযমের সাধন কত্তে চায়, সে তার স্ত্রীকে নিজের অভিপ্রায়ের অনুকূল ক'রে গড়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্নেহ-আদর-ভালবাসা ছাড়া কি কাউকে কখনো গড়া যায়? পাঠশালার গুরু-মশাই শুধু চাবুকের দাপটে কাউকে গড়েছেন? এমন কথা কখনো শুনেছ?

ফাঁকা দাম্পত্য প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকালকার যুবকদের দাম্পত্য প্রেমটা নিতান্ত ফাঁকা জিনিষ ব'লেই অত জাঁকালো। বিবাহের পূর্ব্বে এরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেনি, শুধু আড্ডা

মেরেই বেড়িয়েছে। প্রেমের পুঁজি পাবে কোথায়? প্রেম চপল বস্তু নয়, প্রেম গভীর, উজ্জ্বল, সুন্দর এবং প্রশান্ত। প্রকৃত প্রেমের পুঁজি নেই, এই জন্যই এরা নকল প্রেমের উচ্ছ্বাসটাকে আমদানী ক'রে, প্রেমিকা, নববধূর চখে ধূলা দিতে চায়। দুদিন পরে এই কৃত্রিমতার মুখস যখন খুলে যায়, ভিতরের শূন্যতাময় নগ্ন মূর্ত্তি যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন সরলা বালিকা-বধূ নিজের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে প্রাণের যাতনায় পাগল হয়।

স্বামিস্ত্রীর সমযুক্ত তপস্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনে যারা আত্মগঠনের পূর্ণতা সাধন কত্তে পারে নি, তাদের পক্ষে বিবাহের পরে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পরিপূর্ণ সম্মতির উপরে নূতন ক'রে জীবন-গঠনের চেষ্টা সুরু হওয়া প্রয়োজন। কত লোকে কত কুবুদ্ধি দেবে, কিন্তু তাতে কর্ণপাত ক'রো না। স্বামি-স্ত্রীতে মিলে প্রাণপণে সাধন-ভজন কর আর সংযম রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা রাখ। সংযমটার উপরে যতটা জোর দেবে, সাধন-ভজনের উপরে জোর দেবে তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ, চেষ্টা ক'রে অনেক সময়ে সংযম রক্ষা করা যায় না, যৌবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-তাড়না দুই কূল ভেঙ্গে চুরে নামিয়ে দেয়, কিন্তু সাধন-ভজন একনিষ্ঠ ভাবে চললে সংযম আপনা আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। স্বামিস্ত্রীর

সমযুক্ত তপস্যাই হচ্ছে সর্ব্বকুশলের আকর, সর্ব্বমঙ্গলের আলয়, সর্ব্বসুখের নিদান। এই কথাটী কখনো ভুলবে না।

সোণামুখী (বাঁকুড়া)
৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১

কথকতা-প্রথার উৎপত্তি

অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটীকায় শ্রীশ্রীবাবামণি সোণামুখী শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে পৌছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি শুনিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন যে, এই বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার হইতেই নাকি প্রসিদ্ধ "কথকতা" প্রথার উৎপত্তি হয়। এই বংশে একজন পরম ভাগবত গার্হস্থ্যাশ্রমী সুপণ্ডিত মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, যিনি ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মের প্রচার করিতেন। কিন্তু নিকটের একজন বিশিষ্ট গুণবান্ গীতাভিনয়কারী ছিলেন, যাঁহার যাত্রাগান শুনিবার জন্য দলে দলে লোক চলিয়া যাইত বলিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিবার লোক মিলিত না। এজন্য এই মহাপুরুষ নিজের অসামান্য প্রতিভা-বলে কথকতা-প্রথার সৃষ্টি করেন এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যার এমন এক অভিনব পদ্ধতি বাহির করেন যে, লোকেরা যাত্রাভিনয় না শুনিয়া দলে দলে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতে লাগিল। এই মহাপুরুষের শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই পরবর্ত্তী কালে নিখিল বঙ্গে কতক-ঠাকুররূপে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন,—তবে ত' না জেনে একটা তীর্থস্থানেই এসে পড়েছি।

গৃহস্বামীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌছিতেই মালতী-লতিকা গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্প আন্দোলিত করিয়া যেন অভিনন্দন জানাইতে লাগিল।

সোণামুখী (বাঁকুড়া)

১০ই শ্রাবণ, ১৩৪১

অদ্য দ্বিপ্রহরের পরে সোণামুখী হাইস্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। গতকল্য বেশ বৃষ্টি গিয়াছে, অদ্যও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তথাপি স্কুলের মাঠেই বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। ছাত্রগণ ব্যতীতও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট অভিভাবক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন।

বাঁচার মত বাঁচ

প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ নিয়োগী এম-এ মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যদ্ভুত কর্ম্মময়-জীবন সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু বলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি মেঘমন্দ্রে ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীতের ঋষি, তপস্বী ও মহাপুরুষেরা যখন দীর্ঘকাল দাম্পত্য সংযম প্রতিপালনের পরে সন্তানোৎপাদন করেছিলেন, সেই দিন এই প্রার্থনা তাঁরা করেছিলেন, তাঁদের বংশ যেন অক্ষয় হয়, অমর হয়, দীর্ঘজীবী

পুত্রকন্যার আবির্ভাবের কারণ হয় এবং এই বংশের পুত্রকন্যারা জগতের নানা দিকে নানা দেশে বিস্তারিত হ'য়ে যেন নিজ নিজ তপস্বী পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবরক্ষা করে, প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করে। সেই সকল অমিততেজা অতুল-বীর্য্য যশস্বী ঋষি-মুনিদের তোমরা বংশধর। তোমাদের আজ স্মরণে রাখতে হবে, শুধু কোনো রকমে জগতের কোণে মাথা গুঁজে বেঁচে থাকাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তোমাদের বাঁচার মত বাঁচতে হবে। পূর্ব্বপুরুষদের প্রার্থনা তোমাদের জীবনে সার্থকতা অর্জ্জন করুক, তাঁদের কামনা তোমরা পরিপূরণে সমর্থ হও।

পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দানের পরে সভাভঙ্গ হইল। অদ্যই রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা রওনা হইলেন।

কলিকাতা

১১ই শ্রাবণ, ১৩৪১

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি কালীঘাটে গঙ্গাতীরে বাঁধান সোপান-শ্রেণীর উপরে উপবেশন করিয়া আছেন। কতিপয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশ শ্রবণের জন্য বসিয়া আছেন।

ভগবান্ স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-রহিত

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্ স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় সত্তা, তবে তোমরা যে কেউ তাঁকে মা ব'লে ডাকো, কেউ বা বাবা

ব'লে ডাকো, তার কারণ এই যে, এই জগতের সাধারণ সম্বন্ধগুলির তুলনায় জীবাত্মা তাঁর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধকে খুঁজে বে'র কত্তে চায়। দয়িত-ভাবে যে তাঁর উপাসনা, তাও এই অনর্থ জগতের কান্ত-কান্তা ভাবের তুলনাতেই। এই জগতে কেউ যদি কারো পুত্র বা পিতা না থাক্‌ত, কেউ যদি কারো মাতা বা কন্যা না থাক্‌ত, কেউ যদি কারো কান্ত বা কান্তা না থাক্‌ত, কেউ যদি কারো প্রভু বা সেবক না থাক্‌ত, তাহ'লে ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ অন্বেষণের কালে পিতা ব'লে, মাতা ব'লে প্রভু ব'লে বা হৃদয়নাথ ব'লে সম্বোধন কেউ কত্ত না। এই জগৎ অনিত্য হ'লেও নিত্য জগতের ছায়া অবলম্বনেই রচিত। এই জন্যই ভগবানের সঙ্গে যে তোমার নিত্যসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের ছায়া এসে এই জগতের সকল সম্বন্ধীর সাথে সম্বন্ধের বেলায় প্রতিফলিত হ'য়েছে। তবে, সাধারণ ছায়াতে তফাৎ এইটুকু যে, কায়াতেই স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব প্রভৃতি থাকে, ছায়াতে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব কিছুই থাকে না কিন্তু নিত্যকায়া পরমেশ্বরের অনিত্য ছায়া এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, এ স্থলে কায়াতে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব কিছুই নেই, অথচ ছায়ায় দেখ কতজন স্ত্রী কত জন বা পুরুষ সেজে বিচরণ কচ্ছে। জীবের স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্বের উপরে এই পার্থিব জগতের সৃষ্টি-প্রসার নির্ভর কচ্ছে, এই জন্যই এখানে কেউ স্ত্রী হবেন, কেউ পুরুষ হবেন, এজন্যই

এখানে স্ত্রীত্ব আর পুংস্ত্ব জীবের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু পরমেশ্বর স্বকীয় সৃষ্টি-প্রসারের জন্য পুংস্ত্ব-স্ত্রীত্বের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁর ইচ্ছাই সৃষ্টির বিকাশ বা উপশমের পক্ষে যথেষ্ট, এইজন্য তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় লিঙ্গাতীত। তাঁকে তুমি মা ব'লে ডাক্‌লেও তিনি স্ত্রীচিহ্নবিশিষ্ট নন, তাঁকে তুমি বাবা ব'লে ডাকলেও তিনি পুংচিহ্নবিশিষ্ট নন, এই একটা কথায় খেয়াল রেখে তাঁকে ভালবাসলে, ধর্ম্মের ভিতরে পঙ্কিলতা প্রবেশ কত্তে পারে না।

নিজ স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব বিস্মরণের উপায়-স্বরূপে লিঙ্গপূজাদি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে পুরুষ ব'লে জেনে তোমরা যে তাঁর লিঙ্গপূজা কচ্ছ, ভগবানকে স্ত্রীরূপধারী ব'লে জ্ঞান ক'রে তোমরা যে যোনিপূজা কচ্ছ, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানের পূজা নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য জগতের সকল পুরুষত্ব তাঁতে আরোপ ক'রে নিজের পুরুষত্ব ভুলে যাওয়া, জগতের সকল স্ত্রীত্ব তাঁতে আরোপ ক'রে নিজ স্ত্রীত্বের অভিমান সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়া। তান্ত্রিকের শিব-শক্তি-পূজার এটী একটী মস্ত রহস্য। বাহ্য আচরণ দর্শনকারী চক্ষু এই লিঙ্গপূজার বা এই যোনিপূজার তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম হয়। কিন্তু নিজের

পুরুষত্ব-বোধের তাড়নায় যে সাধক জগন্ময় লালসার লেলিহান অনলশিখায় নিয়ত দগ্ধ হ'য়ে পরিত্রাণ পাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার পক্ষে ভগবানকেই একমাত্র ভোগেশ্বর ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অর্চ্চনা ক'রে নিজের ভোগসুখগ্রহণক্ষমতার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দেওয়ার পক্ষে এটী অন্যতম সহজ পথ। জগতের যত ভোগেন্দ্রিয়, সকলের লিঙ্গী একমাত্র তিনি। ভোগেন্দ্রিয়ের নিজস্ব কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নিজস্ব কোনও সার্থকতা নেই, নিজস্ব কোনও ভোগাস্বাদনী ক্ষমতা নেই, নিজস্ব কোনও চেতনা নেই এবং স্বরূপতঃ নিজস্ব কোনও অস্তিত্বই নেই। এই হ'ল তান্ত্রিকদের অনেকের লিঙ্গপূজা বা যোনি-পূজার অন্তর্নিহিত রহস্য ও উদ্দেশ্য।

জগতের সকল স্ত্রী ও সকল পুরুষের স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব বিস্মরণে লিঙ্গপূজাদি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লিঙ্গপূজাদির আরও একটা দিক্ আছে। পুরুষত্ব-অভিমানী ব্যক্তি যখন যোনি-প্রতীকের পূজা করে, তখন ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট প্রতীকের ভিতরে সমগ্র ব্রহ্ম-ভাব আরোপ করার ফলে জগতের স্ত্রীমাত্রেরই প্রতি তার ভোগজগতের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত উদাসীন ভাব

প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীত্ব-অভিমানিনী ব্যক্তি যখন লিঙ্গ-প্রতীকের পূজা করে, তখন ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট প্রতীকের ভিতরে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাধিষ্ঠান ধ্যান করার ফলে জগতের পুরুষমাত্রেরই প্রতি তার ভোগবুদ্ধিহীন ভোগগন্ধহীন অনাসক্ত শান্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে বল্‌তে শোন যে, কামুক পুরুষ ও কামুকী নারীরা নিজ নিজ কামবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা এবং যোনিপূজার উদ্ভাবন করেছিল, আর আমাদের দেশের সাধন-না ক'রে সিদ্ধ দেশকে-না-চিনে-স্বদেশহিতৈষী পাঠ না-ক'রে পণ্ডিত কতকগুলি লোক যে তার প্রতিধ্বনি ক'রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গোল্লায় দিচ্ছে—এরা কেউ এ দেশের ধাত জানে না, প্রকৃতি জানে না, এই দেশের জাতীয় লক্ষ্যই যে ভগবল্লাভ, তা জানে না, নিজ নিজ অদূরদর্শী দৃষ্টির অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'য়ে বামন হ'য়ে চাঁদের বেড় মাপবার জন্য হাত বাড়ায়।

যোনিপূজা ও লিঙ্গপূজার দুইটী দিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে স্ত্রী ব'লে জানা বড়ই মারাত্মক ব্যাপার, যদি না পরমপুরুষকে একমাত্র পুরুষ ব'লে সঙ্গে সঙ্গে জেনে মেনে নেওয়া যায়। নিজেকে পুরুষ ব'লে

জানা বড়ই মারাত্মক ব্যাপার, যদি না জগন্মাতাকেই একমাত্র স্ত্রী ব'লে সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করা যায়। একদল লিঙ্গপূজা বা যোনিপূজা করেছেন, নিজ নিজ পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্ব বিস্মৃত হবার জন্য। কারণ, নিজের স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব স্মরণের উপরেই জগতের যত চাঞ্চল্যকর অনিত্য খেলার বিভীষিকাময় আবর্ত্ত চলেছে। এক্ষেত্রে পুরুষরাই লিঙ্গপূজা করেছেন, নারীরাই যোনিপূজা করেছেন। কিন্তু আর একদল লিঙ্গপূজা বা যোনিপূজা করেছেন, এই জগতের কোনও প্রাণীকে পুরুষ বা স্ত্রী ব'লে যাতে কল্পনামাত্রও না আসে, তারই জন্য। কেন না নিজেকে পুরুষ ভেবে অপরকে স্ত্রী ব'লে জানতে গেলেই ভোগবুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, নিজেকে স্ত্রী ভেবে অপরকে পরুষ ব'লে জানতে গেলেই বাসনার উত্তাল-তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হ'য়ে অনিত্য সুখের পশ্চাদ্ধাবন-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এজন্য এক্ষেত্রে পুরুষেরা যোনিপূজার এবং স্ত্রীরা লিঙ্গপূজায় রত হয়েছেন।

রক্তমাংসের লিঙ্গ এবং যোনির পূজা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেখানে সাধক সাধিকার পার্থিব সম্পর্ক বিবাহিত স্বামী বা বিবাহিতা পত্নী, সেখানে তান্ত্রিক সাধকেরা রক্তমাংসের লিঙ্গ বা যোনিকে পূজা কত্তেও

কুণ্ঠিত হন নি। এই পূজা ভোগ পরিতর্পণের জন্য নয়, অথবা ইংরাজিতে যাকে বলে exhibitionism বা কামদৃশ্য দর্শনের বা প্রদর্শনের আকৃতি, তাও নয়, কিম্বা ভোগবুদ্ধির অনলে ইন্ধন দিয়ে তার রসনাকে অধিকতর লেলিহান করবার জন্যও নয়। যেখানে রক্তমাংসের সম্বন্ধকে সকল সমাজে সম্ভ্রমের সঙ্গে নতমস্তকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, সেখানেও যাতে রক্তমাংসের ক্ষুধা নিজের দাবীকে জোর ক'রে পেশ না কত্তে পারে, রক্ত এবং মাংস নিজ নিজ প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতি বিস্মৃত হ'য়ে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মী চেতনার উপরে যাতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, তারই জন্য এই রক্তমাংসের ইন্দ্রিয়কে রক্তমাংসাতীত নিত্য ব্রহ্মবিগ্রহ ব'লে পূজা। এই পূজায় চিরকালই মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের বিপদ প্রচুর ছিল, এবং থাকবে কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন গ্রীস, ব্যাবিলোন, য়্যাসিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের ইন্দ্রিয়-পূজার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন, ভারতের সাধক সাধিকা সেই উদ্দেশ্যে কখনো যোনির বা লিঙ্গের পূজা করেন নি। ভারতীয় ইন্দ্রিয়ের জীবনে শৈশব ছিল না, তা নয়। কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদগণের সকল আবিষ্কারের বহু লক্ষ বৎসর অতীতে সেই শৈশব পার হ'য়ে গিয়েছে। এই জন্যই ভারতীয় তান্ত্রিক সাধকদের পূজার্চ্চনার বিচার তাদের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতীয় শিষ্যেরা ত' প্রতিধ্বনিতেই সুপটু সুতরাং তাদের মতামত আরও অগ্রাহ্য।

বৈষ্ণবের মধুর রস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তান্ত্রিকের সাধনা বীরের সাধনা, কিন্তু এ সাধনা বিপদেরও সাধনা। এই বিপদকে অতিক্রম ক'রে কি সাধক চলতে পারবে না? পারা কি তার উচিত নয়? তন্ত্রের তত্ত্ব ও রস যাঁরা বংশানুক্রমে নিজেদের ভিতরে আয়ত্ত ও পুঞ্জিত করেছিলেন, তাঁদেরই বংশাবলীর ভিতর থেকে এই প্রশ্নের সদুত্তর এল। তন্ত্রের তত্ত্ব এদেশের রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই একদিন বৈষ্ণব সাধক বল্লেন—"জগতে ভোক্তা দুই জন নেই, একমাত্র রসেশ্বর ভগবানই সকল ভোগের ভোক্তা, জীবের কর্ত্তব্য একমাত্র সেই রসেশ্বর ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনের উপকরণ রূপে নিজেকে তাঁর অভিপ্রায়ের চরণে সঁপে দেওয়া; নিজসুখলোভ, নিজভোগপ্রার্থনা, নিজ তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁকে সুখী করা, তাঁর তৃপ্তি সাধন করা, তাঁর সর্ব্বতোভাবে পরিতর্পণ করা ছাড়া আর জীবের কোনও কৃত্য নেই; তিনিই আমার পরম দয়িত প্রাণেশ্বর, তিনিই আমার সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বেশ্বর, তিনিই আমার পরম গতি পরমেশ্বর এবং আমি নিজ মুক্তি, নিজ মোক্ষ, নিজ নির্ব্বাণ বা নিজ স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তাঁকে চাই না,—তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়, আমি তাঁর পরিতৃপ্তির উপকরণ মাত্র; তিনিই সর্ব্ব ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ, আমি তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের

জন্যই মাত্র নিজেকে তাঁর দাসীরূপে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছি; সর্ব্বসুখ তাঁর, তিনি সুখবান্‌ ও পরিতৃপ্ত হ'লেন, এইটাই আমার সুখ বা পরিতৃপ্তি, অন্য কোনও পরিতৃপ্তি আমার নেই।" বৈষ্ণবের এই মধুর বাণী লিঙ্গপূজা এবং যোনিপূজার প্রয়োজনকে খর্ব্বিত ক'রে দিল। কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনাদি অনন্ত কালে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সকলেই তাঁর প্রকৃতি মাত্র,—এই তত্ত্ব প্রচারের ফলে লিঙ্গ-পূজা ও যোনিপূজার জরুরী তাগিদ ক'মে গেল। বৈষ্ণবদের মধুর-রসের কৃতিত্ব এখানে অবশ্যস্বীকার্য্য। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের দুর্নিবার তাড়না দমন ক'রে মনকে কামাতীত অত্যুচ্চ প্রেমের স্তরে নিয়ে তোল্‌বার পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণবের এই কৃষ্ণ-সুখচিন্তা এক অত্যাশ্চর্য্য উপায়।

মধুর সাধনার ব্যবহারিক অসুবিধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীব-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি, এই অনুধ্যান প্রত্যেক মানবের পক্ষে সম্ভব নয়, বা স্বাভাবিকও নয়। জগতে যতগুলি সাধন-পথ আছে, সবই এক এক প্রকৃতির লোকের জন্য বিশেষ ক'রে বিহিত হ'য়েছে। নারী নিজেকে যত সহজে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি ব'লে ভাবতে পারে, পুরুষ তত সহজে পারে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার অধীন

যে দেহটার সেবার জন্য দিনে কয়বার ক'রে অন্ন, জল ও শয্যার শরণাপন্ন হ'তে হয়, শীতাতপলজ্জা নিবারণের জন্য যে দেহটার উপরে সর্ব্বক্ষণ বস্ত্রাবরণ রক্ষা কত্তে হয়, সেই দেহটাতে বাস ক'রে একটা পুরুষ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের নারী ব'লে চট্ ক'রে সহজ চেষ্টায়ই ভেবে ফেল্‌বে, এটা ছেলেখেলার মত তুচ্ছ তেমন একটা নিতান্ত নগণ্য বা সাধারণ ব্যাপার নয়। আবার বিবাহিতা নারী, স্বামীর সঙ্গে থাকে, সাংসারিক সহস্র প্রয়োজনে নানা ভাব ও ব্যবহারের আদান-প্রদান কত্তে গিয়ে স্বামীর স্বামিত্ব যাকে শত বার স্মরণ কত্তে হয়, তার পক্ষেও নিজেকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তা ব'লে জ্ঞান করা নিতান্ত নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার নয়। আর, নারী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা ব'লে ভাব্‌তে সমর্থ হ'লে তার ফলে নারীর সৌন্দর্য্যই শতগুণ বর্দ্ধিত হয়, কারণ প্রেম-পেলব কোমলতাই নারীর শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু যে পুরুষকে সংগ্রাম ক'রে জীবিকা অর্জ্জন কত্তে হয়, যে পুরুষকে পৃথিবী অনিত্য জেনেও অনিত্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অনিত্য পুত্র-কন্যা-কলত্রের অনিত্য উদরের অনিত্য জ্বালা বিদূরণের জন্য প্রতিযোগিতাসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে রণং দেহি ব'লে বীরবিক্রমে গাণ্ডীব ধারণ কত্তে হয়, যে পুরুষকে নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারের জন্য ভীমসেনের ন্যায় ঘূর্ণায়মান গদাহস্তে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে দৃঢ়পদে প্রবেশ কত্তে হয়, যে পুরুষকে

দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভৈরব-গর্জ্জনে আস্ফালন কত্তে কত্তে অনলোদ্গাররত কামানের সাম্‌নে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াতে হয়, সেই পুরুষের পক্ষে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা ব'লে জ্ঞান করার অভ্যাস শুধু কঠিনই নয় পরন্তু পরস্বাপহরণপ্রয়াসী দানবচরিত্রজাতিপুঞ্জের পরিবেষ্টনে বাস ক'রে এই মনোভাবের অনুশীলন ব্যবহারিক হিসাবে দস্তুরমত আত্মহত্যা। গীতার অর্জ্জুন আর ভাগবতের শ্রীরাধা দুই জন দুই স্তরের সাধক। গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের পক্ষে নিজেকে নিত্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা ব'লে ধারণ করা কঠিন কাজ, শুধু কঠিন নয়, পরন্তু যেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অর্জ্জুনকে দিয়ে জয় করিয়ে নেওয়া শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রায়, যেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুন যেন হেরে না যান, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ", শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন,—"যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ", সেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যমই এতে মাটি হ'য়ে যেতে পারে। পুরুষকে নারী-ভাবানুপ্রাণিত করার প্রয়াসের ভিতরে এইখানে রীতিমত একটা বিপদ রয়ে গেছে। যে দেশ স্বাধীন নয়, সে দেশে ধর্ম্মচর্চ্চা নিরাপদ হ'তে পারে না। সে দেশে নিত্য নূতন সমস্যার মুখে ধর্ম্মের অধিকাংশ বহিরঙ্গ-অনুশীলন বারংবার ব্যাহত হ'তে পারে। রাজপথ দিয়ে নগর-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে না বেড়ালেও ভক্তের ভক্তি-সাধনা বাধে না, কেন না, অন্তরঙ্গ-নামজপ থেকেই ভক্তিকল্পলতা

অনন্ত বিস্তারী প্রসার পেতে পারে। কিন্তু তথাপি রাজপথে নাম-সঙ্কীর্ত্তনও ভক্তিবর্দ্ধক কার্য্য, ইহাও ভক্তি-সাধনের অন্যতম অঙ্গ। যে দেশে স্বাধীনতা নেই, সেই দেশে রাজপথেও হরিনাম কীর্ত্তনের ভক্তিযাত্রা নিয়ে বহির্গত হওয়া সকল সময়ে নিরাপদ বা শান্তিবর্দ্ধক হয় না। এই কারণেই পুরুষের ভিতরে মনোভঙ্গিমার যেই পরিবর্ত্তন প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে পুরুষকে গাণ্ডীব ধারণ ক'রে দেশ, সমাজ, জগৎ ও ধর্ম্মের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালনে অপটু কর্ব্বে, তার অনুশীলন নির্ব্বিচারে সর্ব্বযুগে প্রত্যেক মানব কর্ব্বে কি না, কত্তে পারে কি না, এই কথা নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং মতভেদ অনিবার্য্য।

যোগীর প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুক্র-শোণিতের মিলন-সঞ্জাত এই দেহে, পিতৃবীর্য্য এবং মাতৃরজের সমন্বয়ে উদ্ভূত এই নরতনুতে, পিতৃশক্তি এবং মাতৃশক্তি যে বিদ্যমান, একথা নিয়ে পৃথিবীতে কারো সঙ্গে কারো মতভেদ নেই। যে দেহ মাতৃশক্তির আধিক্য নিয়ে এসেছে, তাই নারী-দেহ হয়েছে, যে দেহ পিতৃশক্তির আধিক্য নিয়ে এসেছে, তাই নর-দেহ হয়েছে। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই যুগপৎ এই একটা দেহে বিরাজিত, একজনের আধিক্যের সূচনা নির্দ্দিষ্ট কয়েকটা দৈহিক চিহ্ন ও বিশিষ্টতা দিয়ে মাত্র হচ্ছে, কিন্তু অপর জন

প্রচ্ছন্ন ভাবে এই দেহমধ্যেই বিরাজ কচ্ছেন। পুরুষের যে প্রকৃতি-সংসর্গের প্রণোদনা, তার কারণ প্রকৃতি তার মধ্যে স্বল্পতর ভাবে রয়েছেন, এই প্রকৃতির পরিপূর্ণতা চাই, দুজন সমান হ'য়ে মিশলে আর স্রোত ও তরঙ্গ থাক্‌বে না। দুটো স্থান যখন উচ্চতায় অসমান হয়, তখনি একস্থানের জল গড়িয়ে অন্য স্থানে পড়ে। নারীর যে পুরুষ-সংসর্গের প্রণোদনা, তারও কারণ এই যে, তার মধ্যে পুরুষ স্বল্পতর ভাবে রয়েছেন, এই পুরুষের পরিপূর্ণতা চাই, তবে অন্তরের ভিতরে প্রকৃত মিলনানন্দের সঞ্চার হবে এবং বাইরে গিয়ে এক দেহের সাথে অন্য দেহের মিলন সাধনের জড় আসক্তি থাক্‌বে না। দেহ তোমার পুরুষের হোক্ কি নারীর হোক্, এটা এক্ষেত্রে প্রায় অবান্তর। তোমার দেহের ভিতরে নিত্যপুরুষ শিব বিরাজ কচ্ছেন, নিত্যপ্রকৃতি ভগবতীও বিরাজ কচ্ছেন, শিবের সাথে শক্তির পরিপূর্ণ মিলন-সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ তার নিজের ধর্ম্মে তোমার উপরে নানা দৌরাত্ম্য কর্ব্বে। তোমার দেহের ভিতরে নিত্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যা প্রকৃতি শ্রীরাধা বিরাজ কচ্ছেন এবং সেই দুই জনের পরিপূর্ণ মিলনের মধ্য দিয়েই তোমার জীবন থেকে দেহধর্ম্মের আস্ফালন দূর হবে। শ্রীরাম রাজধানী অযোধ্যায় নাই, শ্রীসীতা বাল্মীকির তপোবনে নাই, তাঁরা তোমারই দেহের ভিতরে এবং তাঁদের পরিপূর্ণ মিলনানন্দের মধ্য দিয়েই তোমার পরম শান্তি, চরম অভয়, তাঁদের পরিপূর্ণ মিলনানন্দের মধ্য দিয়েই

উপর থেকে জড়জগতের সকল প্রভাবের অপসারণ। এইটী হ'ল যোগীদের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের বিচার।

শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী শিবশক্তি বা রাধাকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চর্ম্মের চক্ষে সেই পুরুষ আর সেই প্রকৃতিকে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি উপলব্ধি করার উপায় এই জড় দেহটার মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে। তা' হচ্ছে তোমার শ্বাস আর প্রশ্বাস। প্রকৃতি জীবনের খেলা খেলছেন নিঃশ্বাস-রূপে, পুরুষ মরণের খেলা খেল্‌ছেন প্রশ্বাস-রূপে। প্রকৃতি-পুরুষের এই লীলাখেলার মাঝখানে মনকে ডুবিয়ে দিয়ে অবিরাম অহর্নিশ ভগবানের পবিত্র নাম জপ ক'রে যাও, প্রকৃতি-পুরুষাত্মকে ব্রহ্ম, অথবা আরো শুদ্ধ ক'রে বলতে হ'লে প্রকৃতি পুরুষাতীত ব্রহ্ম নির্নিমেষ স্থিরতার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। তখন দেখ্‌বে, জগল্লিঙ্গ জগদ্‌যোনি একাধারে তোমারি ভিতরে সম্মিলিত। নিত্যা রাধা যে নিত্যকৃষ্ণের জন্য কেঁদে মরছেন, আর নিত্য কৃষ্ণ যে নিত্যা রাধাকে নিয়ে নিত্য রমণ কর্ব্বার জন্য ব্যগ্র হচ্ছেন, সে ব্যথা তোমারই এই দেহটার ভিতরে।

কলিকাতা

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪১

রবিবার বলিয়া স্কুল-কলেজের অনেক ছাত্রই

শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদর্শনে আসিয়াছেন। কাহারও কাহারও জিজ্ঞাস্য আছে।

ভক্ত পূজার লাভ

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবদ্‌ভক্তগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, তাঁদের ত্যাগ, তপস্যা, সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য এবং ঈশ্বরানুরক্তির সপ্রশংস আলোচনা, তাঁদের উন্নত চরিত্রের উৎকর্ষ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ,—এ সকল ভক্তিবর্দ্ধনের সহায়ক। প্রকৃত ভক্তদের সংসর্গজাত সুকৃতি নাশ করে ভয়কে, ভাবনাকে, শোক, মোহ, দুর্ব্বলতাকে, আসক্তি, যশঃস্পৃহা, কপটতাকে, পরশ্রী-কাতরতা এবং সাধনে অরুচিকে। এগুলি হচ্ছে ভক্তপূজার লোভনীয় লাভ।

ভক্তপূজার অর্থ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ভক্তপূজা বল্‌তে এই বুঝো না যে, ভক্তদের ছবি এনে ঘরে টানিয়ে রোজ তাতে ফুলের মালা চড়ালেই তাঁর পূজা হ'ল। ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করাই হচ্ছে প্রকৃত ভক্তপূজা। অনেকে নিজেরা ভক্ত ব'লে মান পাবার জন্য পুণ্যচরিত ভক্তদের লোক-দেখান পূজা ক'রে থাকেন। সে পূজার নাম ভক্ত-পূজা নয়, সে পূজার নাম আত্মপূজা। প্রকৃত ভক্তপূজার সাথে আত্মপূজার কোনও

আপোষ নেই। নিজেকে লোকলোচনে প্রতিষ্ঠিত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে ভক্তপূজা হয় না, হয় স্পর্দ্ধার পূজা, অহমিকার অর্চ্চনা, দর্পের পদসেবা।

কাহার স্মৃতিপূজা শ্রেষ্ঠ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষগণের স্মৃতি-পূজা শ্রেষ্ঠ, না, যাঁরা কর্ম্মে, সমাজসেবায়, স্বদেশহিতৈষণায় মহৎ, তাঁদের স্মৃতিপূজা শ্রেষ্ঠ? ভক্তেরা কিন্তু কর্ম্মী প্রভৃতিকে বড়ই হেয় জ্ঞান ক'রে থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক এক উদ্দেশ্যে এক এক জনের স্মৃতিপূজা শ্রেষ্ঠ। জগতে ভগবদ্‌ভক্তেরা না থাক্‌লে মানুষের অস্তিত্বের কোনও অর্থই থাকত না। এই কারণে তাঁরাই জগতে শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই নির্ব্বিচারে সর্ব্বপূজ্য। কিন্তু শিবাজীর মত ধর্ম্মরক্ষক মহাবীর জগতে না থাক্‌লে অনেক ভগবদ্‌ভক্তেরই আবির্ভাব কঠিন হত। রাণা প্রতাপ, শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীরামকৃষ্ণের মত ভগবদ্‌ভক্ত না হ'তে পারেন, কিন্তু এইরূপ তেজস্বী ক্ষত্রবীর জগতে না থাক্‌লে জীবকুলের ধর্ম্মরক্ষা সম্ভব হয় না। এজন্য এঁরাও পূজ্য, এঁদেরও কীর্ত্তি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য উচ্চ কোটির সাধক না হ'তে পারেন, কিন্তু এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ যদি জগতে প্রচার না কর্ত্তেন, তাহ'লে শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব কয়জনে বুঝত, কয়জনে জানত? সুতরাং বিবেকানন্দকে

একজন কর্ম্মযোগী বা ধর্ম্মপ্রচারক সমাজহিতৈষী মাত্র ব'লে জ্ঞান ক'রে নাসিকা কুঞ্চিত না ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরও স্মৃতির পূজায় তোমার লাভ আছে। বিপিন চন্দ্র পাল বা অশ্বিনী কুমার দত্তের ধর্ম্ম-জীবনের কোন্ অংশ তোমরা জান? সুতরাং একমাত্র রাজনৈতিক নেতা ব'লেই এঁদের অবজ্ঞা কর্ত্তে পার না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধর্ম্মজীবনে কত উন্নত ছিলেন, তা জান্‌বার তোমাদের অবকাশ হয় নি ব'লে তাঁকে শুধু স্বদেশ-মন্ত্রের প্রচারক ব'লে জ্ঞান করা ভুল করা হবে। তোমরা যাঁদের সমাজ-সেবক বল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিরাট বিরাট সাধক, কিন্তু তাঁদের কর্ম্মজীবনের তীব্র উজ্জ্বলতায় তোমাদের চোখ্ এমন ভাবে ঝলসে গেছে যে, তাঁদের সাধন-জীবনের আশ্চর্য্য অবস্থা-সমূহ বিস্মৃতির ছায়াতলে আত্মগোপন ক'রে আছে।

কর্ম্মি-সমাজের প্রতি ভক্তদের ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুগে যুগে সমাজ-সেবকেরা এবং রাজনীতিক কর্ম্মীরা সমাজের ও রাষ্ট্রের তারকেন্দ্রকে সমতায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে থাকেন। তাঁরা সমাজের ও রাষ্ট্রের অবিচারের মাত্রা হ্রাসের চেষ্টা না কর্ল্লে ভগবদ্-ভক্ত মহাপুরুষদের অনেকের পক্ষেই একাধারে ভক্ত ও কর্ম্মী হ'তে

হত। একদল লোক কর্ম্মীর কর্ত্তব্যটী ক'রে যাচ্ছেন ব'লেই আর একদল লোক সহজে ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলন কত্তে পাচ্ছেন। নতুবা ভক্তনামধারী অনেক ভদ্রলোককেই হজরত মহম্মদ কিম্বা গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায় এক হস্তে শাণিত কৃপাণ এবং অপর হস্তে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়ে আবির্ভূত হ'তে হ'ত। ধর্ম্মাচরণকারীর চতুর্দ্দিকে যখন গুপ্তঘাতকের ছুরিকা ঘুরে বেড়ায়, তপ্ত রুধিরের উল্লাসে যখন ধর্ম্মদ্বেষীদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা চল্‌তে থাকে, তখন যদি সেই অনাচারে, সেই অবিচার, সেই অত্যাচার দমনের জন্য সমাজ-শক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি মাথার উপরে না থাকে, তা হ'লে পর্ব্বত-গুহায় এবাদৎনিরত মহম্মদকে এবং বনে জঙ্গলে তপস্যায় নিবিষ্ট গোবিন্দ সিংহকে নিজ হস্তে অস্ত্রধারণ কত্তে হয়। একদল লোক সমগ্র শক্তি দিয়ে ভক্তদের ভক্তি-সাধনায় বিঘ্নগুলি যে দূর ক'রে দিচ্ছেন, একথা স্মরণ ক'রে নিজ নিজ ভক্তিবাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ভদ্রলোকদের পক্ষে কর্ম্মী, সমাজহিতৈষী ও রাজনীতির সেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য।

কীর্ত্তিলাভের লোভ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কীর্ত্তিলাভের লোভ চরিত্রের একটা অতি বিষম দুর্ব্বলতা। কিন্তু কীর্ত্তিলোভ অনেক নিষ্ক্রিয় নিষ্কর্ম্মা লোককে সৎকর্ম্মে উদ্যত করে, অনেক কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে কুক্রিয়া-

বর্জ্জনে এবং সুক্রিয়ার অনুশীলনে প্রণোদিত করে। এই কারণেই কীর্ত্তিলাভের লোভ সর্ব্বথাই নিন্দনীয় নয়। এর একটা ভাল দিকও আছে।

খ্যাতির প্রকারভেদ ও কৌলীন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, কীর্ত্তি যদি লাভ কত্তে হয়, ভগবদ্‌-ভক্ত-রূপে কীর্ত্তি লাভই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অহমিকা, নিজ কর্ত্তৃত্ববোধ প্রভৃতির প্রাচুর্য্যহেতু যদি জীবনে ভক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ না ঘটে, তবে জনহিতৈষী-রূপে কীর্ত্তি-লাভ তার নীচে। দানের খ্যাতি, জন-সেবার খ্যাতি, বিদ্যাবিতরণের খ্যাতি, ধর্ম্মপ্রচারের খ্যাতি, এসব খ্যাতি ভগবদ্‌ভক্ত হওয়ার খ্যাতির চেয়ে নিকৃষ্ট। কিন্তু এগুলি অনুত্তম খ্যাতি নয়। বিদ্যাবত্তার খ্যাতি তারও নীচে। ধনবত্তার খ্যাতি সর্ব্বনিম্নে। আর, রূপ-যৌবনের খ্যাতি নিম্নাধিক নিম্নে।

খ্যাতির অসারতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে খ্যাতি কতক অর্জ্জিত হ'লেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাতে খ্যাতির লোভ ক্রমশঃ ক'মে যায়। সৎকর্ম্মে প্রণোদনা দেবার জন্য খ্যাতিলোভের প্রয়োজন আছে কিন্তু এ লোভকে কেবলি বাড়িয়ে চল্‌লে বিপদের আর অন্ত নেই। জীবনের সকল সার্থকতা অতিমাত্রায় খ্যাতিলোভের কাছে এসে ভস্ম হ'য়ে যায়। সুতরাং কথঞ্চিৎ

খ্যাতি অর্জ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের খ্যাতিপ্রতিপত্তির নশ্বরত্ব চিন্তা কত্তে সুরু করবে। এ জগতে একদা কত কত খ্যাতিমান্ কীর্ত্তিমান নারী-পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু আজ তাদের কথা কারোরই স্মরণে নেই। একদা যে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি প্রত্যহ সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চারণেরা যুক্ত-করে গান কত্ত, আজ তেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরশার্দ্দূলের নাম পর্যন্ত আমরা কেউ জানি না। পাহাড়ের গুহা খুঁড়ে দশ লক্ষ বছরের পুরাতন কবরের মাঝ থেকে আজ দু-একজন কীর্ত্তিমানের নাম খুঁজে বের করা হচ্ছে। সসাগরা ধরিত্রীর কত কত অধিশ্বর নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সৎকীর্ত্তির গাথাসহ পথের ধূলিতে মিশে গেছেন, আর কেউ কখনো তাদের নাম জান্‌বে না, ধাম জান্‌বে না, কীর্ত্তি-কাহিনী জান্‌বে না। বিদ্যার অধিশ্বর, জ্ঞানের সম্রাট, তত্ত্বের বারিধি, ধনের কুবের, দানের শৌণ্ড, বুদ্ধির সাগর কত কত মহারথ অধিরথ অতিরথের দল এ জগতে এসে যশের বিভায় জগৎকে আলোকিত, পুলকিত, উচ্চকিত ও স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে চলে গেছেন, কিন্তু সে যশ, সে কীর্ত্তি, সে খ্যাতি, সে প্রশংসা নিতান্তই অস্থায়ী, নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর, নিতান্তই অনিত্য। কেউ তাদের মনে রাখ্‌লো না। এই কথা ভেবে নিজের খ্যাতির লিপ্সাকে দমন কর্ব্বে।

নিত্যপ্রভুর সহিত নিত্যসম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার সঙ্গে তোমার

নিত্যপ্রভুর যে সম্বন্ধ, সদাপ্রভু পরমেশ্বরের চরণে তোমার যে সত্যিকার আত্মসমর্পণ, তার মধ্যে কোনো প্রকারে কোনো ফাঁক না ঢোকে, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দিকে মন দাও। খ্যাতি, কীর্ত্তি, প্রতিষ্ঠা ও যশ অনিত্য, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ নিত্য, ক্ষয়হীন, অমর। সেই নিত্য-সম্বন্ধ-জ্ঞানকে নিজের ভিতরে জাগ্রত কর। এইখানেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা।

সকল রূপরসাদিতে ভগবৎ-সান্নিধ্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নয়ন তোমার বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রয়াসী ত'? তাতে দোষ কি? এই বহির্জ্জগৎ তাঁরই সৃষ্টি, যিনি সুন্দরতম। বাইরের জগতে যত রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি সবই ত' তাঁর কাছ থেকে এসেছে। তাঁর কাছ থেকে এসেছে ব'লেই এরা এত মনোজ্ঞ, এত মনোরম, এত মনোহর। বাইরের দৃশ্যে চিত্ত চঞ্চল হয়? তাতে ভয় পাবার কিছু নাই। এ দৃশ্যাবলীর পশ্চাতে জগৎপ্রভুর চিরসুন্দর রূপ রয়েছে। সকল রূপে, সকল রসে, সকল শব্দে, সকল স্পর্শে, সকল গন্ধে, সর্ব্বসময় তাঁর মধুময় অস্তিত্বকে উপলব্ধির চেষ্টা কর। দেখো, সকল বিভ্রাট এতেই প্রশমিত হবে।

অন্তরের সৌন্দর্য্যের বিনাশ নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, জড় জগতের যত সৌন্দর্য্য, সবই কালক্ষোভ্য। এর বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে। চিজ্জগতের সৌন্দর্য্য নিত্য-নব-নবায়মান, তার বিকাশ-বৈচিত্র্যের শ্রীবৃদ্ধি আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই। যার বিকাশ আছে, বিনাশ নেই, সেই অমৃতময় সৌন্দর্য্যের আগার যাতে তোমার অন্তশ্চক্ষের সমক্ষে নিরর্গল হ'য়ে খু'লে যায়, তার জন্য অবিরাম সৌন্দর্য্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের চরণে ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা জানাও। এতে জড়-বস্তুর সৌন্দর্য্যের বাহ্য চটকের দাপট তোমার কাছে হ্রাস পাবে, অন্তরের সৌন্দর্য্য মৃদুমধুর অনুভূতির হিল্লোলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সুস্মিত হাস্যে আস্য-বিকাশ কর্‌বে।

জীবকে ভালবাসা ও ভগবানকে ভালবাসা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে ভালবাসা আর জগৎকে ভালবাসা বা জগতের জীবকে ভালবাসা ঠিক এক কথা নয়। ভগবানকে ভালবাস্‌লে ভগবানের জীবের প্রতি ভালবাসা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু জীব যে ভগবানেরই জিনিষ, এই কথা ভুলে গিয়ে যদি জীবকে ভালবাস, তবে সেই জীবপ্রেম কখনই ভগবৎপ্রেমের

পর্য্যায়ে উন্নীত হবে না। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—স্বামী বিবেকানন্দের এই কথার তোমরা এ'রকম মানে ক'রো না যে, জীবের ভিতর দিয়ে যে ভগবানই তোমার সেবা পাবার দাবী জানাচ্ছেন, এই কথা ভুলে গিয়ে কতকগুলি লোককে এনে পেট ভ'রে খিচুড়ী খাওয়ালেই বা ঔষধ-পথ্য-আশ্রয় দিলেই ভগবানের সেবা হ'য়ে গেল। বিবেকানন্দজীর ভাষাতে যাই থাকুক, ভাব নিশ্চয়ই তা' হ'তে মহত্তর। তা যদি না হ'ত, তাহ'লে দুনিয়া জোড়া হাসপাতালগুলিকে ঈশ্বর-সেবার মন্দির ব'লে মনে করা যেত। যে হাসপাতালে বা অন্নসত্রে ঈশ্বর-সেবাকে মূল লক্ষ্য ক'রে চিকিৎসাকে বা অন্নদানকে তার উপায় বা উপলক্ষ্য-রূপে গ্রহণ করা হয় বা হয়েছে, বলা চল্‌বে যে, মাত্র সেই স্থানেই জীবে-প্রেমের ফলে ঈশ্বর-প্রেম বর্দ্ধিত হয় বা হয়েছে। জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে না দেখে, সেবার মধ্যে ঈশ্বরকে লক্ষ্য না ক'রে, যে জীব-সেবা, তা সব সময়ে ঈশ্বর-প্রেমের সহায়ক নয়।

সেবাধর্ম্ম ও ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুনিয়ার সেবাধর্ম্ম ভক্তিধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক স্থলে নিকৃষ্ট এবং কতক স্থলে ভক্তিধর্ম্মের সহযোগী। "জীবের ভিতরে ভগবান্ আছেন এবং ভগবানই আমাকে নিয়ত সেবাপরায়ণ রাখ্‌বার জন্য কখনো ক্ষুধার্ত্ত-

বেশে, কখনো তৃষ্ণার্ত্ত-বেশে, কখনো রোগার্ত্ত-বেশে, কখনো নিরাশ্রয়-বেশে আমার চখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এসে আমার অন্তরের কারুণ্যরসকে উদ্বেলিত করেন",—এই ভাব থেকে যে সেবাধর্ম্মের অনুশীলন, তা ভক্তির বর্দ্ধক, ভক্তির সাধক বা ভক্তির অঙ্গ। আর, "আমি যদি এরূপ ক্ষুধার্ত্ত হতাম, এরূপ তৃষ্ণার্ত্ত হতাম, এরূপ রোগার্ত্ত হতাম, এরূপ নিরাশ্রয় হতাম, তাহ'লে আমাকেও হয়ত দশজনের করুণা আকর্ষণের জন্য দুয়ারে দুয়ারে দুঃখের প্রদর্শনী ক'রে বেড়াতে হ'ত, সুতরাং এই বিপন্ন ব্যক্তিকে নিশ্চিতই সাহায্য করা সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য",—এই ভাব থেকে যে সেবাধর্ম্মের অনুশীলন, তা এই জগতের নীতি-বিচারে পরার্থপরতা ব'লে বিবেচিত হ'লেও অতি সূক্ষ্মভাবে এবং গৌণভাবে আত্ম-পরায়ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জাতীয় সেবা কখনও ভক্তির সাধক বা বর্দ্ধক হ'তে পারে না, কিম্বা ভক্ত্যঙ্গ ব'লেও বিবেচিত হ'তে পারে না। এরূপ সেবাও জগতে দুর্ল্লভ এবং আবশ্যক কিন্তু এই সেবার কৌলীন্য কম।

নিত্য-সেবা ও অনিত্য-সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দরিদ্রকে অন্নদান কর্ব্বে ত'? কর, কিন্তু তার বৃহত্তর দারিদ্র্যের দিকেও লক্ষ্য রেখো। সে অন্নহীন, এটাই তার প্রধান দারিদ্র্য নয়। সে যে ভগবানে ভক্তিহীন, এটাই তার চরম দারিদ্র্য। অন্নহীনকে অন্ন দাও,

কিন্তু তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হোক, তার ভিতরে ভগবদ্‌ভক্তি-রূপ পরমসমৃদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করা। রুগ্নকে চিকিৎসা কর্ব্বে ত'? কর, কিন্তু তার বৃহত্তর ব্যাধির দিকেও লক্ষ্য রেখো। সে যে দেহের রোগে জীর্ণ, এটাই তার প্রধান রোগ নয়। সে যে ভগবানে ভক্তিহীন, এটাই তার চরম রোগ, পরম ব্যাধি। স্বাস্থ্যহীনকে স্বাস্থ্য জোগাও, কিন্তু তার আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার পেয়ে মনুষ্য-জন্ম সে যাতে সার্থক কত্তে পারে, সেই দিকে ক্ষীণদৃষ্টি ও অমনোযোগী হ'য়ো না। জড় অন্নদানও সেবা, কিন্তু অনিত্য সেবা, চিন্ময় অন্নের সন্ধান দেওয়াই প্রকৃত সেবা বা নিত্য সেবা। জড় ঔষধ দানও সেবা, কিন্তু অনিত্য সেবা, চিন্ময় মহৌষধ দানই প্রকৃত সেবা। অনিত্য সেবাও উপেক্ষণীয় নয়, তা বর্জ্জন কত্তে পার না, কিন্তু সেই অনিত্য সেবাকে নিত্যসেবার সহকারিণী বা পরিচারিকা ক'রে নাও।

ভগবানে ভোগবুদ্ধি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে ভক্তি করা ভগবানে ভোগবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। ভক্ত ভগবানের দাস, আর ভোগবুদ্ধি-ব্যক্তি ভগবানকে নিজের দাসরূপে পেতে চায়। ভগবদ্‌ভক্তির ঠাট বা ভড়ংটাকে সম্মুখে রেখে ভিতরে ভিতরে তার সুযোগে মান, যশ, প্রতিপত্তি, ধন, জন, ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ লাভের যে চেষ্টা, তাকেই জানবে ভগবানে ভোগবুদ্ধি। প্রকৃত ভক্তি

সর্ত্তচুক্তির ঊর্দ্ধে, দাবী-দাওয়ার বাইরে। ভক্ত ভগবানকে সেবা ক'রেই সন্তুষ্ট, তিনি কখনো ভগবানের উপরে আদেশ জারী কত্তে পারেন না যে, এটা দাও, ওটা দাও। তবে, যা পেলে ভগবদ্‌ভক্তিরই ক্রমিক অনুশীলন সহজতর হবে, ভগবানে আত্ম-সমর্পণের পথ সুগমতর হবে, ভগবানের কাছে এমন জিনিষ প্রার্থনা কর্ল্লে তাতে তাঁর উপরে কর্ত্তালি করা হ'ল বলা চলে না।

কলিকাতা
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১

সতীত্বের প্রকার ভেদ

স্ত্রীলোকের চরিত্রের মহত্ত্ব এবং তাহার উপরে নানাভাবে সমাজের হিত কি ভাবে নির্ভর করিতেছে, এই বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। একজন শ্রোতা মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের সতীত্বের বিষয়ে প্রশ্ন তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সতীত্ব ত্রিবিধ। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক সতীত্বই প্রকৃত সতীত্ব।

আধ্যাত্মিক সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আধ্যাত্মিক সতীত্ব কাকে বলে? আত্মাকে অধিকার ক'রে যে সতীত্ব। এ জগতে কোনও মানুষই অপর মানুষের আত্মার পতি নন,—আত্মা-মাত্রেরই একমাত্র পতি,

একমাত্র গতি, একমাত্র আত্মনিমজ্জন-ক্ষেত্র এই পরমাত্মাতে অবিচলিত নিষ্ঠার নামই আধ্যাত্মিক সতীত্ব।

মানসিক সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আত্মার দৃষ্টিতে জগৎকে দে'খে এ জগতে কয়জন চলে? এই জন্যই সামাজিক বিচারে পৃথক্ সতীত্বের মানদণ্ড স্থির হ'ল। সমাজের বিধি-ব্যবস্থা নর-নারীর দৈহিক জান্তব ব্যবহারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সীমাবদ্ধ ক'রে দিল এবং সেই সীমারেখা রক্ষা ক'রে চল্‌বার সামাজিক প্রবৃত্তি প্রত্যেকের মনে সতীত্বসম্পর্কিত এক নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ক'রে দিল। অর্থাৎ দেহকে যৌন-ব্যবহার-প্রসঙ্গে একনিষ্ঠ রাখাই একমাত্র করণীয় নয়, পরন্তু মন যাতে অন্যনিষ্ঠ না হয়, ভোগাতুর চিত্ত পতি ব্যতীত অপর পুরুষের প্রতি যাতে কিছুতেই কখনো প্রধাবিত না হয়, পতি-সহবাসে তুমি পরিতৃপ্ত হও বা না হও, কোনও অবস্থাতেই পুরুষান্তর-সংসর্গের কামনা পর্য্যন্ত তোমার মনে উদিত হবে না,—এই নৈতিক দায়িত্ববোধ উপজাত হ'ল। যেহেতু মানসিক পরপুরুষেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হ'লে দৈহিক পরপুরুষসংশ্রব বর্জ্জন ক'রে চলা সুকঠিন, সেই হেতুতে আবাল্য শিক্ষাদানের দ্বারা মনের ভিতরে এক সুদৃঢ় সংস্কার সৃষ্টি ক'রে দেওয়া হ'ল যে, স্বপ্নেও ভিন্ন পুরুষের সংশ্রব অতীব ভয়াবহ অপরাধ। এইটী হ'ল মানসিক সতীত্ব।

মানসিক সতীত্ব-রক্ষার কাঠিন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এই মানসিক সতীত্বকে অটুট রেখে চলা অতীব কঠিন। চিত্ত পতিতে একান্ত ভাবে অনুরাগশীল না হ'লে, স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ অতীব নিবিড়, অতীব গভীর, অতীব ব্যাপক ও অতীব ঐকান্তিক না হ'লে, মানসিক সতীত্বের মানদণ্ড পুরাপুরি বজায় রেখে চলা অতীব কঠিন। স্বামি-সহবাসকে যে রমণী ভোগবুদ্ধির ঊর্দ্ধে নিয়ে তুলতে পেরেছে, স্বামি-সহবাসকে যে রমণী আত্মসুখলিপ্সা-তৃপ্তির উপায়-রূপে জ্ঞান না ক'রে স্বামি-সেবার অন্যতম অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছে, স্বামীকে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার সঙ্গীমাত্র জ্ঞান না ক'রে যে রমণী তাকে নিজের অন্তরঙ্গ বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণতা বিধায়ক মহাবদান্য পরমদাতা জ্ঞানে গ্রহণ করেছে, সে নারীর পক্ষেই মানসিক সতীত্বকে অটুট রাখা সহজসাধ্য। এই কারণেই অতীত কালে "পতিই সতীর দেবতা" বা "পতি পরম গুরু" প্রভৃতি বাক্য আবাল্য মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কেন না, মনে মনে যে বহুপুরুষগামিনী, তার দৈহিক একনিষ্ঠা দীর্ঘকাল থাকে না, কিম্বা লোভনীয় এবং নিরাপদ সুযোগের মুখে তার পক্ষে সকল সময়ে আত্মসম্বরণ সম্ভব হয় না।

কায়িক সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে কায়িক সতীত্ব সমাজ-জীবনে কখনো নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু ব'লে গণ্য হ'তে পারে না। মনের গঠন অনুযায়ী কিম্বা মানসিক উৎকর্ষের তারতম্য অনুসারে মানসিক সতীত্ব রক্ষা ক'রে চলা কোনো রমণীর পক্ষে অতি সহজ, কারো পক্ষে সহজ হলেও চেষ্টাসাধ্য, কারো পক্ষে কঠিন হলেও অসাধ্য নয়, কারো পক্ষে অতীব সুকঠিন বা প্রায় অসম্ভব। তিনিই শ্রেষ্ঠা নারী, যিনি কায়িক সতীত্ব সংরক্ষণের সাথে সাথে মানসিক সতীত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে পারেন। তেমন রমণীরা একেবারে সুদুর্ল্লভা নন। এই সকল রমণীদের গর্ভে সাধারণতঃ জগদুদ্ধারকারী লোকোত্তরচরিত্র অবতারকল্প মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন।

মানসিক সতীত্ব বিপন্ন হইলে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে ক্ষেত্রে মানসিক সতীত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা, সেখানে নারীর কর্ত্তব্য কি, তা মুখ ফু'টে ব'লে দিতে হয় না। নারীরা প্রত্যেকে সেই সেই স্থলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট বোঝে। অবাঞ্ছিত পুরুষের সান্নিধ্য বর্জ্জন সেই ক্ষেত্রে মেয়েদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী

প্রয়োজন। নিজ স্বামীর প্রতি অনুরাগ-বর্দ্ধন এই ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। সর্ব্বোপরি, অবিরাম ঈশ্বর-সাধন এই সকল ক্ষেত্রে নারীকে তার মনকে দৃঢ়, সরল, সবল, শুদ্ধ, লালসামুক্ত এবং সংগ্রামপটু কর্ব্বার পক্ষে সর্ব্বাধিক সাহায্য করে। নিজের মনের গুপ্ত সংঘাতকে নিজে বুঝ্‌তে না পারার মত বিপদ মানুষের আর কিছু নেই। ঐকান্তিক ঈশ্বর-সাধন নিজের ভিতরের পরিচয় নিজের কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে উন্মুক্ত ক'রে তুলে ধরে এবং তার ভিতরে যেটুকু আছে অশিব, অসুন্দর ও অসত্য, তাকে অচিরে ধ্বংস ক'রে দেবার শক্তি, সামর্থ্য, রুচি, প্রবৃত্তি, উদ্যম ও অধ্যবসায় যোগায়।

মানসিক সতীত্বের সাধনায় ব্রতোপবাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানসিক উত্থান-পতনের জ্বালা একমাত্র মানুষকেই সইতে হয়, সে বালাই পশুপক্ষীর নেই। সুতরাং এক সময়ে মন নিম্নগত বা পথভ্রষ্ট হয়েছে ব'লেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা কত্তে হবে, তার কোনো মানে নেই। অনেক গুণবতী কিন্তু দুর্ব্বলচেতা মেয়েরা এইরূপ সঙ্কটে আত্মহত্যা করে। এর মত একটা নিরেট বোকামি আর কিছু হ'তে পারে না। মন বহুমুখ হয়েছে দেখলে সীতার কথা আর সতীর কথা চিন্তা ক'রে তাকে বাগে আনতে হবে। যে

মন কিছুতেই বাগে আসে না, তাকে ঘাড়ে ধ'রে নত ক'রে আনবার জন্য কতক কতক দৈহিক কৃচ্ছ্রতার অভ্যাস এবং অবিরাম ঈশ্বর-সাধন কত্তে হবে। রমণক্ষমতা পুরুষদের চাইতে নারীদের বেশী, একথা শাস্ত্রেও দেখেছি, আধুনিক রতিতত্ত্ববেত্তা গ্রন্থকারদেরও বলতে শুনি। এজন্যই আমাদের সমাজের আচার্য্যেরা নারীদের জন্য ব্রতোপবাসের মাত্রাটা কিছু বেশী করেছিলেন। সেগুলির সবই পুরুত ঠাকুরদের প্রাপ্তির পরিমাণটাকে বড় কর্ব্বার উদ্দেশ্যে নয়। তবে, অনেক ব্রত-পার্ব্বণ বর্ত্তমানে তাদের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যকে হারিয়েছে, অনেক তথাকথিত দেব-দেবী নিজ নিজ সিংহাসন থেকে চ্যুত হয়েছেন বা হচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেক সধবা নিজ জন্মবারে বা স্বামীর জন্মবারে বা গুরুবারে কিম্বা দীক্ষিতা হ'লে দীক্ষার বারে ব্রতোপবাসের অনুষ্ঠান কত্তে পারেন। রসনাকে শাসনের দ্বারা ইন্দ্রিয়পর-বুদ্ধি যত দ্রুত শাসিত হয়, এমন বোধ হয় একমাত্র ঈশ্বর-সাধন ব্যতীত অন্য কিছুতে হয় না।

কায়িক সতীত্বের সহিত মানসিক সতীত্বের সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কায়িক সতীত্ব রক্ষা ক'রে চলা জগতের প্রায় কোনও স্ত্রীলোকের পক্ষেই কঠিন নয়। সমাজের অধিকাংশ বিধি এর অনুকূলে। কিন্তু কোনও কারণে

যে সকল রমণীর পক্ষে কায়িক সতীত্ব রক্ষা ক'রে চলা অসম্ভব হয়, তাদের কাছে মানসিক সতীত্ব আশা করা একটা বাতুলতা মাত্র। কায়িক চপলতা সত্ত্বেও মানসিক একনিষ্ঠা বজায় থাক্‌বে, এই জাতীয় মতবাদ শুধু আত্মপ্রতারণার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সভ্যতার মুখোস প'রে বর্ব্বরতার যেখানে আত্ম-প্রসারণ প্রয়োজন, মাত্র সেখানেই এই জাতীয় মতবাদের বিস্তার আবশ্যক হয়।

দ্রৌপদী ও সীতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"দ্রৌপদী পঞ্চপতির সেবা কর্ত্তেন, তথাপি দেখ সতী ছিলেন,"—একথা অনেকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু সমগ্র ইতিহাসে, পুরাণে, গল্পে বা গাথায় কোনও স্থানেই ত' আর পরবর্ত্তী কোনও দ্বিতীয়া দ্রৌপদীর উল্লেখ দেখা গেল না। সীতাকে দেখ্‌লাম, সঙ্গে সঙ্গে দেখি সতীও তাঁরই মত আর একজন আছেন, আবার দেখি দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা প্রভৃতি একজনের পর আর একজন সীতার চরিত্রের অনুকরণে নিজ চরিত্রকে গঠন ক'রে ক্রমশঃ ইতিহাসই বল, আর পুরাণই বল, আর গল্প-গাছাই বল, তার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠ্‌ছেন, এমন কি লক্ষ্মীন্দরের বেহুলা আর এই সেদিনের রাজপুতানার জহরব্রতে আত্মবিসর্জ্জন-কারিণী পদ্মিনী প্রমুখ একজাতীয় চরিত্রবতীর দল আর কিছুতেই

দেখ নির্ব্বংশ হ'তে চাচ্ছেন না। এই থেকেই বুঝা যায় যে, সীতা একটা আদর্শ। যা' আদর্শ, তারই অনুকরণ, অনুসরণ আর অনুরণন পরবর্ত্তী বহু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে। আদর্শকে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, মানতে হয়, নিজের অজ্ঞাতসারে তার চরণে উদ্ধত, দর্পিত, উন্নত মাথাটা নত হয়, শূকরের শক্ত ঘাড়ও সেখানে প'ড়ে একটা প্রণাম কত্তে বাধ্য হয়। কিন্তু দ্রৌপদী তা' নন। দ্রৌপদীর জীবন আর কোনো মহীয়সী মহিলা অনুকরণ কর্ল্লেন না, এই ভারতের ইতর জনসাধারণের সমাজের ভিতরেও দ্রৌপদীর দাম্পত্য জীবনের অনুকরণ প্রতিষ্ঠিত হ'ল না, একটা ডোম, চামার বা চণ্ডালের মেয়েকেও আর পঞ্চপতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ কত্তে দেখা গেল না। সুতরাং স্বীকার কত্তেই হবে যে, সীতা একটা আদর্শ, দ্রৌপদী একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, কিন্তু আদর্শ নন।

দ্রৌপদীর ইতিবৃত্ত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্রৌপদী যে আদর্শ নন, তার সমস্ত প্রমাণ মহাভারতের ঘটনার ভিতরেই রয়েছে। কুন্তী যদি আগে চোখে একবার দেখে নিতেন যে, অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ ক'রে কি অপূর্ব্ব বস্তু আজ নিয়ে এসেছেন, তাহ'লে তিনি কিছুতেই একথা বলতে পাত্তেন না, "পাঁচ ভাইয়ে ভাগ ক'রে

খাও।" কিন্তু যখন কুম্ভকারের কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রৌপদীকে দেখ্‌লেন, তখন তাঁর আর আফশোষের সীমা ছিল না। কিন্তু জেনে হোক্, না জেনে হোক্, যে কথা ব'লে ফেলেছেন, তার অন্যথা হ'লে তিনি মিথ্যাবাদিনী হন, অতএব ঢেঁকীই গিল্‌তে হবে। সত্য বস্তুটা মুখে থাকে না, বুকে থাকে, শব্দে থাকে না অভিপ্রায়ে থাকে, একথার বিচার তখন করা হ'ল না। তিনি যে ভিক্ষান্ন এনেছে জেনে ভাগ ক'রে পাঁচ ভাইকে ভোজন কত্তে বলেছিলেন, সুতরাং ভিক্ষান্ন ব্যতীত অন্য বস্তু এসে থাক্‌লে তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ কর্ল্লেও যে তাঁর সত্য-লঙ্ঘনের অপরাধ ঘটে না, এ চিন্তা তখন করাই হ'ল না। করা কেন হ'ল না, তাও মহাভারতেই আছে। মহাভারত আদিপর্ব্বের একশত একানব্বই অধ্যায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ধর্ম্মভীতা কুন্তী সাতিশয় চিন্তান্বিতা হ'য়ে দ্রৌপদীর হস্তধারণ ক'রে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন ক'রে বল্লেন,—"বাছা, আমি প্রমাদবশতঃ যা' বলতে হয় বলেছি, এখন উপায় দেখ যাতে আমার বাক্যও মিথ্যা না হয়, অথচ দ্রৌপদীরও অধর্ম্ম না ঘটে বা সে তজ্জন্য বিষণ্ণা না হয়।" যুধিষ্ঠির তখন অর্জ্জুনকে সম্বোধন ক'রে বললেন,—"ভাই, তুমি দ্রৌপদীকে লাভ করেছ সুতরাং তুমিই এঁকে বিবাহ কর।" মাতৃসত্য রক্ষার কথাটা যুধিষ্ঠিরের মনে রইল না। অর্জ্জুন বল্লেন,—"এতে আমার অধর্ম্ম হবে, সুতরাং আগে

আপনি বিয়ে করুন, পরে করবেন দাদা ভীম, পরে করব আমি এবং তার পরে যথাক্রমে নকুল আর সহদেব।" অর্জ্জুনের এই স্নেহ-বিগলিত বাক্য শুনে পাণ্ডুপুত্রেরা সকলে পাঞ্চালীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর্ল্লেন এবং পাঞ্চালীও তাঁদের দেখতে লাগ্‌লেন। মহাভারতকার সুস্পষ্ট লিখেছেন যে,—এরূপে পরস্পর পরস্পরকে দর্শন ক'রে পাণ্ডুপুত্রদের মনে একমাত্র পাঞ্চালী ভিন্ন অন্য কিছুই প্রবেশ কত্তে পার্ল্লে না, ক্রমে মদন সমুদ্ভূত হ'য়ে পাণ্ডবদের ইন্দ্রিয়-সমূহকে মন্থন কত্তে লাগ্‌লেন, কেননা বিধাতা আপন অভিলাষ অনুসারে পাঞ্চালীর রূপ নির্ম্মাণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের আকার ও ভাব বুঝতে পেরে পাছে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে বল্‌লেন,—"শুভলক্ষণা পাঞ্চালী আমাদের সকলেই ভার্য্যা হোক।" ভ্রাতৃভেদের ভয়ই যুধিষ্ঠিরের বড় ভয়, একথার উল্লেখ মহাভারতেই আছে। তখন হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের মনে প'ড়ে গেল,—সত্যিই ত', এই না সেদিন মহামুনি ব্যাসদেব আমাদের কাছে এক কাহিনী ব'লে গেছেন যে, এক মহাত্মা মুনির এক সর্ব্বগুণভূষিতা কন্যা ছিলেন, তিনি পতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপস্যা ক'রে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন, মহাদেব যখন বর দিতে এলেন, তখন সেই কন্যা বারংবার বল্‌তে লাগলেন যে, আমার সর্ব্বগুণান্বিত পতি চাই, সুতরাং মহাদেব বল্‌লেন যে, তুমি যখন পাঁচবার প্রার্থনা করেছ

'পতি চাই' 'পতি চাই' তখন সম্মুখের জন্মে তোমার পঞ্চপতি হবে এবং সেই মেয়েটীই পাঞ্চালী হ'য়ে দ্রুপদ রাজার গৃহে জন্মেছেন।" আসল কথা ভ্রাতৃ-বিরোধের ভয়। মাতার কথা অসত্য হবে, এই ভয় থাক্‌লে যুধিষ্ঠির পরীক্ষাচ্ছলেও প্রথমে অর্জ্জুনকেই বিবাহ কত্তে বল্‌তেন.না। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদের ভয় বড় নিদারুণ ভয়, সুতরাং তখন হঠাৎ ব্যাসদেবের কথিত গল্পটা মনে প'ড়ে গেল। রাজা দ্রুপদের বাড়ীতে যখন দ্রৌপদী সহ কুন্তী এবং পাণ্ডবেরা উপস্থিত হ'লেন, তখন রাজা দ্রুপদ বল্লেন,—"আজ পুণ্যাহ, অর্জ্জুন আজই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন।" তখন যুধিষ্ঠির বল্লেন,—"না রাজন্, আমাকেও বিবাহ কত্তে হবে।" রাজা দ্রুপদ বল্লেন,—"বেশ ত', তবে তুমিই আমার কন্যা কৃষ্ণাকে বিবাহ কর।"। যুধিষ্ঠির বল্‌লেন,—"দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হবেন, কেন না, মাতা কুন্তী এরূপই আদেশ করেছেন, অতএব দ্রৌপদী জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ অনুসারে আমাদের সকলের পাণিগ্রহণ করুন।" ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের আশঙ্কার কথাটা বেমালুম চেপেই গেলেন। দ্রুপদ চম্‌কে গেলেন। তিনি বল্লেন,—একি কথা? এক জনের অনেক মহিষী হ'তে পারে, কিন্তু এক নারীর বহু পতি একথা ত' আমরা কস্মিন কালেও কোথাও শ্রবণ করি নি!" যুধিষ্ঠির তাঁর জেদ্ ছাড়্‌লেন না। এই সময়ে মহর্ষি ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হলেন। বিপন্ন রাজা

দ্রুপদ মহর্ষি ব্যাসকে জিজ্ঞাসা কর্লেন,—"প্রভো, উপপত্নী না হ'য়ে এক কামিনী কি ক'রে বহুজনের ধর্ম্মপত্নী হ'তে পারে?" ব্যাসদেব বল্‌লেন,—"এরূপ কার্য্য যে লোক-বিরুদ্ধ এবং বেদ-বিরুদ্ধ, এতে সংশয় নেই। তবে এই বিষয়ে তোমাদের কার কি মতামত আছে, তাই আগে আমাকে বল দেখি?" রাজা দ্রুপদ বল্লেন,—"আমার মতে এরূপ কার্য্য অধর্ম্ম, লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ। এরূপ কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ এরূপ কার্য্য করেন নি। বিদ্বানেরা এরূপ আচরণ করেন না।" দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন বল্লেন,—"আমার দৃষ্টিতে এরূপ কার্য্য সুস্পষ্ট অধর্ম্ম। কোন্ সচ্চরিত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের ভার্য্যাকে সম্ভোগ কত্তে পারেন?" যুধিষ্ঠির বল্লেন,—"গোতম-নন্দিনী জটিলাকে সাত জন ঋষি একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন। মুনি-কন্যা রঙ্গার সাথেও প্রচেতাদের দশ ভ্রাতার বিবাহ হয়। সুতরাং দ্রৌপদীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহ কর্ব্ব, এতে অধর্ম্ম হবে কেন? বিশেষতঃ গুরুজনের বাক্য পালনই ধর্ম্ম এবং মাতার সমান গুরু নেই। মাতাই বলেছেন,—"তোমরা কৃষ্ণাকে একত্র ভোগ কর। সুতরাং ইহাই পরম ধর্ম্ম।" কুন্তী বল্‌লেন,—"আমি মিথ্যাকে বড়ই ভয় করি।" একটা মজা লক্ষ্য ক'রো, যে জটিলা আর যে রঙ্গার নজির দেখিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী মঞ্জুর করিয়ে নিতে চান, তাদের

নাম রাজা দ্রুপদ কিম্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনো শোনেন নি। আগেকার রাজারা কেউ মূর্খ ছিলেন না এবং দ্রুপদ রাজা গুরুগৃহে দ্রোণের সমপাঠী ছিলেন, সুতরাং তিনি বিদ্বান্ ছিলেন। কিন্তু কখনো রঙ্গা বা জটিলার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি। কুন্তীও মূর্খ ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে জটিলা আর রঙ্গার নাম জান্‌তেন, গোড়া থেকেই তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের জেদ বিষম, সুতরাং ব্যাসদেব এক্ষণে ঢেঁকি গিল্‌লেন। তিনি বল্লেন,—"তোমার ভয় কি কুন্তী? ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। এক পত্নীর বহু স্বামী কি ক'রে সনাতন ধর্ম্ম হ'ল, সে বিবরণ তোমাদের প্রাকাশ্যে বল্‌তে পারব না, গোপনে বল্‌ছি।" তখন সকলে মিলে এক গোপন প্রকোষ্ঠে গিয়ে বস্‌লেন এবং ব্যাসদেব তাঁর পুরাতনী কাহিনী বর্ণনে লেগে গেলেন। যে কাহিনী ক'দিন আগে যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে ছিলেন, সেই কাহিনীটাই সোজাসুজি বল্লেন না, প্রথমে ব'লে নিলেন পর্ব্বত-বিবর মধ্যে আবদ্ধ পাঁচজন ইন্দ্রের গল্প, যাঁরা ভগবান উমাপতির আদেশে পাঁচজনে একত্রে একটীমাত্র রমণীর পতি হবেন, যেই রোরুদ্যমানা রমণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে এরা দরী-মধ্যে রুদ্ধ হয়েছিলেন। এরকম একটা আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস ক'রে দ্রুপদ নিজ কন্যাকে পঞ্চপতির হাতে দিতে গেলে লোকে কি বল্‌বে? অতএব এই অনাদর্শ ব্যাপারটাকে জলচল করার জন্য ব্যাসদেব হঠাৎ রাজা

দ্রুপদকে দিব্যচক্ষু দান কর্ল্লেন, আর কথিত গল্পানুযায়ী পঞ্চপতিকে পঞ্চপাণ্ডব ব'লে এবং রোরুদ্যমানা কামিনীকে নিজ কন্যা পাঞ্চালী-রূপে দ্রুপদ প্রত্যক্ষ কর্ল্লেন। এতখানি ঘটার পরে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে কথিত, পাঁচবার "পতি দান করুন" বলাতে যে ঋষি-কন্যাকে মহাদেব পঞ্চপতির বর দিয়েছিলেন, সেই কাহিনীটীও পৃথক্ ক'রে বল্লেন। তখন রাজা দ্রুপদ বল্লেন,—"মহাদেবই যদি এরূপ বিধান ক'রে থাকেন, তবে ধর্ম্মই হোক আর অধর্ম্মই হোক, আমার এতে কোনো পাপ নেই।" তারপরে একে একে পাঁচ জনের সঙ্গে পাঞ্চালীর বিবাহ হ'ল। এক জনের সঙ্গে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে আর ঠিক পরবর্ত্তী ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহটী হবার পূর্ব্ব দিবসই দ্রৌপদী পুনরায় কন্যাত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন। এই হ'ল দ্রৌপদীর বিবাহের ইতিবৃত্ত। রঙ্গার নজির, জটিলার নজির প্রভৃতিতেও যখন এক নারীর পঞ্চপতি মঞ্জুর হয় না, তখন ব্যাসদেবকে একটা অতি অবিশ্বাস্য গল্প ব'লে দ্রুপদের মন ভিজাতে হয়, তারপরে দিব্যদৃষ্টি দান ক'রে অর্থাৎ হিপনটাইজ ক'রে ঐ গল্পটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করাতে হয় এবং তারপরে সর্ব্বশেষে যুধিষ্ঠিরকে কথিত পুরাতন গল্পটার পুনরাবৃত্তি কত্তে হয়। তবু দ্রুপদের সন্দেহ গেল না যে, কাজটা ভাল হবে, কি মন্দ হবে। তাই শেষে ধর্ম্মাধর্ম্মের দায়িত্ব ভগবান্ মহাদেবের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে অগত্যা

যুধিষ্ঠিরের জেদ রক্ষা কর্ল্লেন বা কুন্তীর সত্যরক্ষা করালেন। ঘটনার ভিতরে এই যে এত কুণ্ঠা, এত দ্বন্দ্ব, এত সঙ্কোচ ও এত অস্বাভাবিকতার সমাবেশ, তাই থেকেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্রৌপদী কখনো আদর্শ নন, তিনি একটা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

দ্রৌপদী-চরিত্রের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ দ্রৌপদী-চরিত্রের ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অনুমান করেছেন যে, মহাভারতের কবি কোনও কালের এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে আর্য্যোচিত রূপ দেবার জন্য কতকগুলি গল্প গাছা বা কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা এই যে, কুন্তীর পঞ্চপুত্র বারণাবতে জতুগৃহে দগ্ধ হ'লেন, এই সময়ে তিব্বত অঞ্চলের কোনও পাঁচজন রাজপুত্র ভারতে এলেন। অবশ্য তিব্বতে এক নারীর বহু পতি চল আছে। শোকাতুরা কুন্তীকে বনমধ্যে এঁরা মাতৃ-সম্বোধন ক'রে সহজেই গলিয়ে ফেল্‌লেন, কৃষ্ণ কখনো এই পঞ্চ পুত্রকে দেখেন নি, তবু কুন্তীর কথাতেই এঁদের কৌন্তেয় অর্থাৎ নিজ আত্মীয় ব'লে তিনি মেনে নিলেন, তবে পরে তিব্বত-দেশের প্রথানুযায়ী এঁরা যখন পাঁচজনে একত্র একটী

মেয়েকে বিয়ে করা ছাড়া অন্য কোনও প্রস্তাবেই রাজি হ'লেন না, তখন অগত্যা দ্রুপদকে সেই প্রস্তাবে রাজি হ'তে হ'ল।—নিজ কন্যার সঙ্গে এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিবাহ হওয়াতে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক দ্রুপদ এঁদেরই পাণ্ডুপুত্র ব'লে গ্রহণ কর্ল্লেন এবং এত বড় শক্তিশালী বান্ধবের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কুন্তী এই বধূসহ পঞ্চপুত্রকে নিয়ে যখন রাজ্যে ফিরে এলেন, তখন দুর্য্যোধনাদির আর রাজ্যাংশ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় রইল না। কিন্তু মনে মনে সন্দেহ ছিল যে, সত্য সত্যই প্রকৃত রাজ্যাধিকারীকে রাজ্য দেওয়া হ'ল কি না, তাই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র সর্ব্বদাই দ্বেষপর হ'য়ে রইলেন এবং পরে এই দ্বেষই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পরিণত হ'ল। যুদ্ধশেষে জয়ী হ'য়েও পঞ্চপাণ্ডবের মনে বিদেশ-বাসের দুঃখ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল এবং স্বদেশ তিব্বতে ফিরে যাবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হ'লেন, পথে পথে এক-একজন ক'রে বরফের মাঝে মারা গেলেন এবং তিব্বত দেশে সর্ব্বপ্রথম ভারত থেকে কুক্কুর আমদানী ক'রে যুধিষ্ঠির স্বদেশে ফিরে গেলেন।—মহাভারতের ঘটনার এইরূপ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা কেউ কেউ দিতে চেষ্টা করেছেন। যে দেশে এক পত্নীর বহুপতি চল আছে, হিমালয়ের পরপারস্থ এমন কোনও দেশের ঐতিহাসিক উপকরণের ভিতরে যদি অনুরূপ তথ্য বহুল পরিমাণে কখনো পাওয়া যায়, তা হ'লে এই ঐতিহাসিক অনুমানকে সত্য ব'লে মান্‌তে দ্বিধা কারো হবার নয়। কিন্তু তা হ'লেও

দ্রৌপদী-চরিত্র ভারতীয়ের পক্ষে একটা বৈদেশিক চরিত্রই হ'য়ে দাঁড়ায়, আদর্শ কিছু হয় না।

দ্রৌপদী-চরিত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। একটা ব্যাখ্যা এই যে, দ্রৌপদী হচ্ছেন নিষ্কামকর্ম্মের প্রতীক। বহুপতি থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন সম্পর্কেও আসক্ত নন এবং প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক এবং শ্রুতসেন এই পঞ্চপুত্রের জননী হ'য়েও তিনি তাদের একজনের প্রতিও মোহান্ধ নন। পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য, পুত্রের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য তিনি করেছেন নিঃস্বার্থ নিষ্কাম চিত্তে, অহং-মমাদি ভাব তাকে স্পর্শ কত্তে পাচ্ছে না। অপর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তিনি বাহ্যতঃ পাণ্ডব-ঘরণী হ'লেও জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একান্ত আরাধিত, পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতিবিশিষ্ট ব'লেই কৃষ্ণ-সখা হিসাবে তাঁরা দ্রৌপদীর আপন, কৃষ্ণ-বিরোধী বা কৃষ্ণ-বিদ্বেষী হ'লে দ্রৌপদী একটী মুহূর্ত্তও তাঁদের সংশ্রবে থাক্‌তেন না, দ্রৌপদীর যে পঞ্চপতি-সেবা, সে শুধু ভক্তপূজা মাত্র, ভক্তসংসর্গের ফলে তাঁর অন্তরে নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম নিত্য-নব-নবায়মান হচ্ছে,—দ্রৌপদী শুদ্ধভক্তির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, তাঁর জীবনের

অন্য সবই নিতান্তই ছায়া বা ভূমিকা মাত্র, সেগুলি তাঁর জীবনের বস্তু বা সার নয়। কর্ম্মযোগী এবং ভক্তিপন্থীরা এভাবে দ্রৌপদী-চরিত্রের যত উপাদেয় ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, তাদ্বারা কিন্তু কোনও ক্রমেই নারীর দৈহিক বহুনিষ্ঠার সমর্থন মিলে না। কায়িক সতীত্ব ও দৈহিক একনিষ্ঠা মানসিক সতীত্বের বা মানসিক একনিষ্ঠার সহায়ক।

সতীত্ব রক্ষার সহায়ক কি কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সতী হও, সতী হও ব'লে উপদেশ দিলেই নারীরা কায়িক বা মানসিক সতীত্ব রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে না। এক এক নারীর ধাত এক এক রকমের। কায়িক সতীত্ব সর্ব্বাবস্থাতেই মানসিক সতীত্বের অল্প-বিস্তর সংরক্ষক, কিন্তু মেজাজের পার্থক্য অনুসারে কোনও নারীর পক্ষে সীতা, সতী, দময়ন্তী, চিন্তার কাহিনীই যথেষ্ট কার্য্যকর। কারো পক্ষে এই কাহিনীর শিক্ষাগুলির পরেও নানাবিধ যৌগিক আসনমুদ্রার প্রয়োজন। কারো কারো পক্ষে অকৃত্রিম স্বামি-সোহাগ অত্যাবশ্যক।

পুরুষোচিত সামর্থ্য ও নারীর সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু স্বামী-সোহাগই যথেষ্ট

নয়, নারীর ধাত-বিশেষে দৈহিক ভাবে স্ত্রীকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি দেবার সামর্থ্যও তার স্বামীর মধ্যে থাকা একান্ত আবশ্যক। দেহেই হউক, আর মনেই হউক, কতক কতক নারী দ্বিচারিণী হয় স্বামীর পরিতৃপ্তিবিধানের ক্ষমতার অল্পতার দরুণ। সুতরাং সমাজ থেকে অসতীত্ব দূর করার জন্য যত প্রকার আয়োজন হবে, তার মধ্যে পুরুষের পুরুষোচিত সামর্থ্য-বর্দ্ধনের চেষ্টাও অন্যতম হবে। কিসে পুরুষের পুরুষোচিত সামর্থ্য বাড়ে, তা' নিয়ে ঔষধে, পথ্যে, আচরণে, কৌশলে ও সময়-নিরূপণে অনেক বিষয় এখনো গবেষণা করার রয়েছে। সতী নারীদের প্রাচুর্য্য সম্পর্কে এদেশে এখনো সন্দেহের অবকাশ ঘটেনি। সেই হেতুতে পৌরুষদৃপ্ত মহাজাতির সৃষ্টির প্রয়োজন এবং তাগিদ রয়েছে যেখানে, সেখানে পুরুষানুক্রমিক সাধনায় এটাও একটা গবেষণার অত্যাবশ্যক বিষয় যে, স্বামিপত্নীর সংগুপ্ত জীবনের মধ্যে সত্যিকারের পরিতৃপ্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার, নির্ভুল উপায় কি। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কত কত অজ্ঞাতকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, সুতরাং এই ক্ষেত্রেও কেন মানুষের আবিষ্ক্রিয়ার প্রবৃত্তি ও শক্তি ধাবিত হবে না? ব্যাপক ভাবে স্বামীদের পুরুষোচিত সামর্থ্য যাতে দীর্ঘকাল অকুণ্ঠ ভাবে বজায় থাকে, তারই দিকে তাকিয়ে তরুণ কিশোরদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন, ব্রহ্মচর্য্য সাধন, ব্রহ্মচর্য্য সংরক্ষণের জন্য বিপুল আন্দোলন ধারাবাহিক প্রযত্নে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

কলিকাতা
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১

ছোট কাজও শিখিতে হয়

একজন বলিতেছিল যে, সে এক্ষণে নিতান্ত ছোট কাজ করে, এই কাজ কি আবার শিখিতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছোট-বড় সকল কাজেই শিখবার আছে জেনো। একটা বাঁশ পুততেও শিক্ষার দরকার, একটা কঞ্চি কাট্‌তেও শিক্ষার দরকার, এমন কি মূত্রস্থানে গিয়ে মূত্রত্যাগ বা মলস্থানে গিয়ে মলত্যাগ কত্তেও শিক্ষার প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ছোট-বড় প্রত্যেক কাজ শিখ্‌বার চেষ্টা রাখে, জগতে সে-ই বড় হয়। ছোট কাজ শিখ্‌তে হয় না, আর বড় কাজই মন দিয়ে শিখ্‌তে হয়,—এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করবে।

চাঁদপুর (কুমিল্লা)
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

সেবা-বুদ্ধিতে কীট

কথাপ্রসঙ্গে একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ফুলের মধ্যে যেমন কীট থাকে, সেবা-বুদ্ধির মধ্যেও অনেক সময়ে তেমন গলদ দেখা যায়। একজন হয়ত মস্ত বড় কর্ম্মী, মস্ত বড় আদর্শবাদী, মস্ত বড় সেবক, কিন্তু গুরুস্থানীয় কেউ যেই

কোনও দোষ উদ্‌ঘাটন ক'রে তাকে আরো সুন্দর হবার জন্য উপদেশ দিলেন, অমনি হঠাৎ সেবক-মশাইর আহত আত্মাভিমান মাথা উঁচু ক'রে উঠ্‌ল। তোমার হাজার গুণ আছে, কিন্তু তুমি কটুভাষী এবং মান্যজনের সম্মানে কর আঘাত। যেই এই ত্রুটীটুকু দেখালুম, অমনি তুমি সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠে ব'লে বস্‌লে,—"যান মশাই, আপনার প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ কর্ব্ব না, কর্ম্মফল আমাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, সেদিকে চলে যাব, অত কথা শুন্‌তে আমি রাজি নই।" তোমার হাজার গুণ, তুমি পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়চেতা, কিন্তু কবে কোন্ কাজটা কি ভাবে করেছ, তা জানতে চাইলেই বিপদ। সোজা ব'লে বস্‌বে,—"অত জবাবদিহি দিয়ে কাজ করা আমার পোষাবে না।" ডাক পড়ল,—"কাজে এস", অমনি তুমি হুঙ্কার ক'রে ব'লে বস্‌লে—"আগে সর্ত্ত ঠিক করুন মশাই, ক'টা থেকে ক'টা আপনার সঙ্ঘের কাজ কর্ব্ব আর ক'টা থেকে ক'টা আমি নিরঙ্কুশ ও স্বাধীন। দেশের, সমাজের, জগতের সেবা কত্তে এসেছি ব'লেই আমার স্বাধীন সত্তা বিসর্জ্জন দেই নাই,"—ইত্যাদি। সেবাবুদ্ধি যেন মালতী পুষ্পিকা। তার ভিতরে এই সকল কীট ঢুক্‌লে সেই পুষ্পিকা দেবতার পদতলে উৎসর্গীকৃত হবার অনেক আগেই কীটদষ্ট, নষ্টগন্ধ হীনগুণ ও অসার হ'য়ে যায়।

নগরপাড় (কুমিল্লা)
২১শে শ্রাবণ, ১৩৪১

শরণাগতি লাভের উপায়

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবানের চরণে শরণাগতি আসে কি করলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয় ব'লে জ্ঞান না কত্তে পার্ল্লে ভগবানের চরণে শরণাগতি আসে না। যতক্ষণ তোমার পার্থিব সম্বলের প্রতি আস্থা আছে, ততক্ষণ সত্যি সত্যি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ হয় কি ক'রে? এই জগতের ধন-জন, এই জগতের বন্ধু-বান্ধব, এদের উপরে যতক্ষণ নির্ভর, ততক্ষণ তাঁর চরণকে ঐকান্তিক আশ্রয়-রূপে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই ধন-জনকে অবিশ্বাস কর, সর্ব্বাগ্রে এই বন্ধুবান্ধবের উপর থেকে নির্ভর তুলে আন, তোমার যে কত প্রভাব, কত প্রতিপত্তি, কত প্রভুত্ব আর কত প্রাধান্য এসব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়ে নিজেকে একেবারে নিঃস্ব, নির্ব্বান্ধব, অসহায় ও অনাশ্রিত ব'লে জ্ঞান ক'রে ভগবানের চরণ সজোরে আঁক্‌ড়ে ধর। শরণাগতি এভাবেই আসে।

শরণাগতি ও দম্ভ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরে শরণাগতির মানে কিন্তু

মানুষের প্রতি দম্ভভাব নয়। পৃথিবীর সকল মানুষের উপর থেকে নির্ভর তুলে এনে শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর অর্পণ করার মানে এই যে, মানুষকে অবজ্ঞা কত্তে হবে। মানুষের ভিতর দিয়েই ত' ভগবান্ তোমাকে শত-সহস্র প্রকারে উন্নতির পথে সহায়তা কচ্ছেন। সে উন্নতি শুধু ঐহিক উন্নতিই নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতিও বটে। শুধু মানুষের মধ্য দিয়েই নয়, কত ইতর জীবজন্তুর মধ্য দিয়েও তিনি তোমাকে সাহায্য কচ্ছেন। সুতরাং তোমার ঈশ্বরে শরণাগতি হয়েছে ব'লে বা তুমি অন্যের উপর থেকে নির্ভর তুলে এনেছ ব'লে এঁদের কাউকে অবজ্ঞা তুমি কত্তে পার না। প্রকৃতই যার ঈশ্বরে শরণাগতি আসে, তার দেহ-মন-প্রাণ বিনয়ে ভ'রে যায়, তার মধ্যে কারো প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাব থাক্‌তে পারে না। এটা মনে রাখতে হবে।

আকুবপুর (কুমিল্লা)
২২শে শ্রাবণ, ১৩৪১

আশ্রম মনে, না, মাটিতে

একজন ভক্ত ব্যক্তির একান্তই আকাঙ্ক্ষা যে, এই গ্রামেও একটী আশ্রম হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার আশ্রম ত' মাটিতে নয়, আমার আশ্রম তোমাদের মনে। তোমরা নিজেদের মন প্রাণকে তপস্যার বলে পবিত্র কর, সুন্দর কর, তা' হ'লেই

আমি জানব যে, আমার এক একটী ক'রে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অদোষদর্শিনী দৃষ্টি, অনিন্দক রসনা, নির্ব্বিদ্বেষ চিত্ত, অকপট বুদ্ধি, সর্ব্ব-জন-শুভচিন্তক আবেগ এই পবিত্র পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করুক।

আশ্রমের মর্য্যাদা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে কি মাটীর আশ্রম প্রয়োজনীয় নয়? মাটির শরীর দিয়েই যখন পঞ্চভূতের অতীত সত্তা পরমাত্মার সাধন কত্তে হয়, তখন মনকে পবিত্র ও সুন্দর করার সহায়ক-রূপে মাটীতেও কুটীর বেঁধে আশ্রম-রচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আশ্রম নাম দিয়ে যে কুটীরটী বাঁধ্‌বে, তার মর্য্যাদা কখনো লঙ্ঘন ক'রো না। যে স্থানের নাম আশ্রম, তা যেন ব্যক্তিগত কলহ-কোলাহলের রঙ্গভূমি না হয়, তা যেন তোমাদের প্রত্যেকের বিনীত সেবার কেন্দ্র হয়, তা যেন তোমাদের আমিত্ব, মমত্ব, অহমিকা ও স্পর্দ্ধাকে খর্ব্ব ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার স্থান হয়। চিত্তকে বিনীত না ক'রে কখনো আশ্রমে প্রবেশ কর্ব্বে না। নিজ বাহাদুরী, নিজ কারিকুরির গর্ব্ব, নিজ প্রভুত্বের বোধ দূরে রে'খে তবে আশ্রমে ঢুক্‌বে। জুতো পায়ে দিয়ে মানুষ কত বিষ্ঠা, কত কদর্য্য বস্তু মাড়ায়। সেই জুতো নিয়ে কি কেউ কখনো মন্দিরে প্রবেশ করে? জুতোকে দূরে রেখে আসতে হয়। অহঙ্কৃত মন, উদ্ধত স্বভাব, দম্ভস্ফীত চিত্তকে অমেধ্য-স্পৃষ্ট অশুচি-দুষ্ট পাদুকার মতন জান্‌বে।

চট্টগ্রাম

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

চট্টগ্রামে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারীজীর পাথর-ঘাটাস্থিত আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি এক সময়ে একটী পেয়ারার বাগান করিয়াছিলেন। আশ্রমবাসী বালক ও যুবকগণের অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে সেই বাগানটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে এবং অপ্রত্যাশিত ফল-ফুলে মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির আদেশে শ্রীযুক্ত দীনেশ এই সব পেয়ারা গাছে কয়েক শত কলম তৈরী করিয়াছেন। এইগুলি স্থানান্তরে পূর্ব্ববঙ্গেরই অন্য কোনও এক আশ্রমে রোপণ করা হইবে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার

কলমগুলি কয়েকটা কাঠের বাক্সে প্যাক করা হইতেছে। অদ্যই রেলযোগে পাঠান হইবে। কথা-প্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য! একটা গাছের ডাল থেকে কতগুলি ক'রে নূতন গাছের সৃষ্টি হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর চেয়েও আশ্চর্য্যতর ব্যাপার আমি তোমাদের জীবনে দেখ্‌তে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের প্রত্যেকের শরীর থেকে যে নূতন নূতন মানুষের উদ্ভব হবে, তারা ত' জীব-কল্যাণ আর ভগবৎ-সাধন ক'রে কুলকে পবিত্র এবং জননীকে কৃতার্থা কর্‌বেনই, পরন্তু তোমাদের মনের স্পন্দন থেকে মহাশক্তিশালিনী

বিদ্যুৎ-প্রভা বহির্গত হ'য়ে জগতে অভাবনীয় যুগান্তরের সৃষ্টি কর্‌বে।

চট্টগ্রাম

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪১

চট্টগ্রামের বিশেষত্ব

একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে চট্টগ্রামের পল্লীগ্রাম-অঞ্চলের এক স্থানে শুভ পদার্পণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ধরিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোদের এই চট্টগ্রাম জেলাটার উপরে আমার ধারণা খুবই ভাল। কল্পনা-চঞ্চল কিন্তু কর্ম্মঠ, আবেগ-প্রবণ কিন্তু অধ্যবসায়ী ও নির্ভীক। এই জেলাটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সেবা দিয়ে যাওয়ার আমার খুবই আগ্রহ আছে। কিন্তু আমি সময়ের প্রতীক্ষা কচ্ছি। আর এই পার্থিব দেহটা নিয়ে যদি আমি আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ কত্তে না পারি, তাহ'লে চৈতন্যময় ভাব নিয়ে হ'লেও একবার এদেশ পর্য্যটন কর্ব্ব।

নোয়াখালির বিশেষত্ব

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি নেয়াখালী জেলার সাধারণ বিশেষত্ব সম্বন্ধেও বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—নোয়াখালী জেলাটারও কতকগুলি বিশেষত্ব আমার চোখে পড়েছে। সহজ-বিশ্বাসী ও সরল, অল্পোদ্যম কিন্তু অকপট, সেবাপরায়ণ, ভক্তিমান, ভদ্র এবং শুশ্রূষু,— এইগুলি হ'ল নোয়াখালী জেলার বিশেষত্ব।

কুমিল্লার বিশেষত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমিল্লা জেলার লোকেরও এরূপ কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। উদ্যমী কিন্তু বিনীত, বিশ্বাসী, এবং আদেশপালনে রুচিমান্, বিশ্বস্ত ও আস্থাবান্, সত্যশীল ও নীতিনিষ্ঠ। এই ভাবে প্রত্যেক জেলারই কতকগুলি ক'রে প্রশংসনীয় বিশেষত্ব আছে। এই সব বিশেষত্ব লক্ষ্য ক'রে সেই সেই জেলাতে সেবা-হস্ত প্রসারণ করা আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু বাবা, জড়-দেহ মাত্র সাড়ে তিন হাত লম্বা, পার্থিব দিন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার এবং দেশ-কালাতীত আমার স্বরূপ-সত্তা এই জড়-দেহের সীমাবদ্ধতার জন্যই যুগপৎ সর্ব্বত্র কাজ কত্তে পারেন না। এটা একটা দারুণ আফ্‌শোষ।

বিদেহী অবস্থায় জীব-কল্যাণ

যুবক বলিলেন,—কোনো কোনো মহাপুরুষকে শুনা যায়, একই সময়ে দুই তিন স্থানে গিয়ে দুই তিন জনকে দুই তিন রকমের ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে হচ্ছে বিদেহী অবস্থার কথা। জড়দেহ নিজের জায়গায় প'ড়ে রইল, মাত্র দেহের তাপরক্ষার জন্যই ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ আপনি চল্‌তে লাগ্‌ল বা হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসের ক্রিয়া স্তব্ধ হ'য়েই রইল, ওদিকে যোগী পুরুষের সূক্ষ্ম শক্তি মানবের নয়ন-গ্রাহ্য মূর্ত্তি ধ'রে একযোগে নানা স্থানে জগৎ-কুশল-কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। একমাত্র চিন্তার শক্তিতে যাঁরা জগতের হিত করেন, এ পন্থা তাঁদের। এও যে তাঁরা সঙ্কল্প পূর্ব্বক করেন, তা নয়। এসব তাঁদের স্বভাব থেকেই হয়। কর্ম্মযোগীদের মধ্যেও যাঁরা খুব উন্নত স্তরের সাধক, তাঁরা নিজ নিজ চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় সর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার ত্যাগের ফলে বিদেহী ভাবে নানা স্থানে গিয়ে জীবের সূক্ষ্ম ভোগ-সংস্কার মোচনের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। কিন্তু জানো ত' বাছা, আমি হচ্ছি কোদাল-মারা সাধু, আমাকে কোদাল হাতেই গ্রামে গ্রামে যেতে হবে।

অভিনন্দন

যুবক বলিলেন,—আমাদের গ্রামে আপনাকে আমরা একটি অভিনন্দন দিব।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, অভিনন্দনের মানে জানো? সব সময়েই ওটা বীরপূজা নয়, অনেক সময়ে ওটা আত্ম-পূজা মাত্র। অভিনন্দন দেওয়া ব্যাপারটার ভিতরে কতকটা কৃত্রিমতাও আছে। এজন্য ঘটা

ক'রে অভিনন্দন দেওয়ার প্রথা বর্জ্জন ক'রে অভিনন্দিতব্য ব্যক্তির জীবনাদর্শকে অনুষ্ঠানের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ পন্থা। আমি "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন ভালবাসি। আমাকে ছাপার হরফে খুব কতকগুলি প্রশংসা-ভাষণ না শুনিয়ে যদি এক ঘণ্টাকাল মধুর কণ্ঠে, প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে, কোমল ও শ্রদ্ধিত চিত্তে সব জীবের পাপ-তাপ-দুঃখ-হারী "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন শুনাও, তবে তাতে আমাকে বেশী সম্মানিত করা হবে। শুধু সম্মানিত করা বল্‌ছি কেন, তাতে আমার পরমায়ুর বৃদ্ধি ঘটবে, অন্তরে শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ বর্দ্ধিত হবে। তবে, এখনো তোমাদের অঞ্চলে যাবার সময় হয়নি। যদি হয় বা যখন হবে, তখন ধীর-মধুর কোমল কণ্ঠে "হরি-ওঁ" শুনিয়ে আমার দীর্ঘজীবন কামনা ক'রো এবং আমাকে তৃপ্তি দিয়ো।

অর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ওঙ্কারের চন্দ্রবিন্দুর ব্যাখ্যা-স্বরূপে বলা হয়েছে,—"অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা, উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে, মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী," অর্থাৎ ওঙ্কারের অকারের দ্বারা ব্রহ্মাকে, উকারের দ্বারা বিষ্ণুকে, মকারের দ্বারা রুদ্রকে, চন্দ্রবিন্দু দ্বারা মহেশ্বরীকে বুঝান হয়েছে। এই সম্পর্কে আপনার নির্দ্দেশ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ বাবা, প্রথমেই জেনে নাও যে, এই শ্লোকটীর যাঁরা রচয়িতা, তাঁরা ওঙ্কারের

উপাসক নন, উপাসক হচ্ছেন হ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি বীজমন্ত্রের। তাঁদের একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রণব সর্ব্ব-প্রামাণ্য, প্রণবকে সকলেরই মান্‌তে হবে। হ্রীং-ক্রীং প্রভৃতি বীজ-মন্ত্র যে যুগে সাধকদের মধ্যে প্রচলিতই হন নি, প্রণব তখন থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত, জগতের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদের প্রথম সূচনা প্রণব থেকে, যাতে অন্য কোনও বীজ-মন্ত্রের উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। সুতরাং নিজ নিজ গৃহীত বীজ-মন্ত্রের ভাবের অনুকূলে প্রণবের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'ল। তাই, তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যবর্গের শাক্ত-শৈব-মতাবলম্বিনী নিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে প্রণবকে নিজ-ভাবানুপ্রাণিত ব্যাখ্যা প্রদান কত্তে বাধ্য হ'লেন। কেন না, এই ভারতে যত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়েছে বা হবে, যত সাধন-পথের জন্ম বা প্রসার হয়েছে বা হবে, প্রণবকে আদি প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার না ক'রে কারো উপায় নেই। এই কারণেই অ-কে বলা হ'ল ব্রহ্মা, উ-কে বলা হ'ল বিষ্ণু, ম-কে বলা হ'ল শিব এবং শক্তিহীন শিবের পূজা ত' শাক্ত-শৈবের অভিপ্রায় নয়, এই জন্য চন্দ্রবিন্দুকে এনে মহেশ্বরী ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল। কিন্তু বাছা, প্রণব ত' ওঁ বা ওম্, প্রণব ত' ওঁম্ নয়।

প্রণবের উচ্চারণ

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—কোথাও কোথাও ওঁম্ লিখ্‌তেও ত' দেখা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্ম প্রণবের মৌখিক উচ্চারণ সঠিক হওয়া সুকঠিন এবং সেটী হচ্ছে ওঁ এবং ওম্ এর মাঝামাঝি। ওম্ এবং ওঁ এর মাঝামাঝি যে প্রণবের বাহ্য উচ্চারণ, এই কথাটীকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই ওঁম্ এইরূপ লিখবার রীতি কোথাও কোথাও দেখা যায়। প্রণবের বাহ্য উচ্চারণ কি অউম্, না ওম্, না ওঁ, না ওঁ এই প্রশ্ন ত' সর্ব্বজনীন। সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই "ওঁম" এরূপ লিখবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু শাক্ত-শৈব ব্যাখ্যাকর্ত্তারা উচ্চারণ-দিগ্‌দর্শনকে ব্যাখ্যা ক'রে বসলেন "অর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।" মকারকে রুদ্র ব'লে ব্যাখ্যা করাতেই ত' অর্দ্ধমাত্রাকে মহেশ্বরী ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ হ'ল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনজনেরই ত' পত্নী আছেন। ব্রহ্মাকে স্ত্রী সাবিত্রী দেবী সহ পূজা করার প্রথা বহুকাল আগে থেকেই একরূপ নেই। কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু ত' নিত্য সেবিকা লক্ষ্মীদেবী থেকে পৃথক্ হ'য়ে পূজিত হন না। এমতাবস্থায় অর্দ্ধমাত্রা লক্ষ্মীদেবী না হ'য়ে মহেশ্বরী হ'লেন কেন? ওঙ্কার উচ্চারণ ক'রে যদি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর চিন্তা একক কত্তে হয়, তবে মহাদেবের ধ্যানটী কেন মহেশ্বরীর সাথে যুগলরূপে কত্তে হবে? এসব বিচার কল্লেই ব্যাখ্যাকর্ত্তার সম্প্রদায় এবং অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পারবে। ব্রহ্মার পূজকদের কোনও সংহতিবদ্ধ সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধ'রেই বিদ্যামান নেই, সুতরাং তাঁদের তরফ থেকে কোনো অসুবিধার

কারণ দেখা যায় না। কিন্তু বিষ্ণুপূজক সম্প্রদায়গুলি প্রণব উচ্চারণ কত্তে গিয়ে যদি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর একক ধ্যান করেন, আর মহাদেবের সাথে মহেশ্বরীর যুগ্মাবস্থান চিন্তা করেন, তাহ'লে প্রণব তাঁদের মনঃপূত মন্ত্র হবে কিনা সন্দেহ। তবে সময় মত কথাটা খেয়াল হ'লে কোনও বৈষ্ণব-সাধক যে "হ্লাদিনী চার্দ্ধমাত্রা তু" অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রবিন্দুটী হচ্ছে বিষ্ণুর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা, এইরূপ ব্যাখ্যা দিতে কুণ্ঠিক হ'তেন না, একথা ঠিক্ এবং এরূপ আর একটী অনুষ্টুপ্ থাক্‌লে তোমরা যে মহাসমস্যায় প'ড়ে যেতে, তাতেও সন্দেহ নেই।

প্রণবের তত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসল কথাটা জান? প্রণব হচ্ছেন সর্ব্বতত্ত্বের পরিপূর্ণ সমন্বয়। এতে রাধা আছেন, কৃষ্ণ আছেন, লক্ষ্মী আছেন, বিষ্ণু আছেন, শিব আছেন, পার্ব্বতী আছেন, রাম আছেন, সীতা আছেন, ভক্ত আছেন, ভগবান্ আছেন। এঁর ভিতরে নেই, এমন কোনো তত্ত্ব নেই, রস নেই, আস্বাদন নেই, অনুশীলন নেই। সুতরাং যিনি যে ভাবের সাধক, তিনি প্রণবকে সেই ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। কিন্তু কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক আচার্য্যেরা প্রণবকে আক্ষরিক-ভাবে কেটে ছিঁড়ে স্বসম্প্রদায়ের মত-পোষক কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব'লেই, প্রণবের তত্ত্ব

তাতেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে, এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস তোমরা মোটেই ক'রো না। প্রণব সর্ব্বসমাহারের মহাসমন্বয়ী মন্ত্র। এতে সব মন্ত্র, সব তন্ত্র, সব তত্ত্ব, সব দার্শনিক রহস্য, সব সাধন-পন্থা এবং সকল রস একত্র, যুগপৎ একাধারে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত রয়েছে। এই জন্যই এঁর কোনও সীমিত ব্যাখ্যাই এঁর প্রকৃত বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। নিজ নিজ সাধন-পন্থার সমর্থনের জন্য, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যেরা নিজ নিজ শিষ্যদের সাধননিষ্ঠা বর্দ্ধনার্থে যে যুগে যে ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকুন বা দিন, সেই ব্যাখ্যাটুকু শুধু ঐ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর সাধকদেরই জন্য, তোমার জন্য নয়। তোমার দৃষ্টি সর্ব্বসম্প্রদায়ের গণ্ডীবদ্ধতার বাইরে বিশ্বজনীন একাত্মানুভূতিতে, যদিও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি তোমার সমদৃষ্টি এবং প্রেমবুদ্ধি অবারিত থাকা চাই। কেউ অন্য ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে নিজের মতানুযায়ী সাধন কচ্ছেন ব'লে তোমার ধিক্কার-ধ্বনি উচ্চারণের অধিকার নেই।

চট্টগ্রাম
৩১শে শ্রাবণ,১৩৪১

অকিঞ্চন-বৃত্তির তাৎপর্য্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,—অনেক সাধক পুরুষকে যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কারো কাছে কিছু চান না কিম্বা কোনো কিছু সঞ্চয়ও করেন না, এর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম তাৎপর্য্য এই যে, যার সঞ্চয় নেই, সঞ্চিত বস্তু রক্ষণের কোনো উদ্বেগও তার নেই। কথায় বলে, নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। সঞ্চয় করা এক নিদারুণ সংসারী। সংসারীর জঞ্জাল থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত না থাক্‌তে পারলে ইষ্টচিন্তা জমাট বাঁধে না। কিন্তু অকিঞ্চন-বৃত্তির অপর তাৎপর্য্য বা প্রধান রহস্য এই যে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বলহীন ব'লে জ্ঞান কত্তে না পার্ল্লে ভগবানে সম্যক্ শরণাগতি আসে না। নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয় ব'লে না জানলে তাঁর চরণে আশ্রয় নেবার অটুট আগ্রহ জন্মে না। তাই অকিঞ্চন-বৃত্তিধর হ'য়ে ভগবৎ-পাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া মহাত্মারা অত পছন্দ করেন।

মানসিক অকিঞ্চনতা

প্রশ্ন হইল,—কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রের দিকে তাকাতে গেলে, যদি দেশজুড়ে সকলেই অকিঞ্চন বৃত্তিধারী হন, তাহ'লে সে দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দুই একজনই ভগবৎ-পাদপদ্মাভিলাষী হন। সুতরাং সেই দুশ্চিন্তার তোমার প্রয়োজন নেই। একান্ত ভাবে ভগবানের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদবে, তিনি সকল আশ্রয়, সকল সহায়, সকল সম্বল ও সকল অবলম্বন পরিত্যাগ ক'রে, সকল আশা, সকল ভরসা

তাতেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে, এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস তোমরা মোটেই ক'রো না। প্রণব সর্ব্বসমাহারের মহাসমন্বয়ী মন্ত্র। এতে সব মন্ত্র, সব তন্ত্র, সব তত্ত্ব, সব দার্শনিক রহস্য, সব সাধন-পন্থা এবং সকল রস একত্র, যুগপৎ একাধারে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত রয়েছে। এই জন্যই এঁর কোনও সীমিত ব্যাখ্যাই এঁর প্রকৃত বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। নিজ নিজ সাধন-পন্থার সমর্থনের জন্য, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যেরা নিজ নিজ শিষ্যদের সাধননিষ্ঠা বর্দ্ধনার্থে যে যুগে যে ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকুন বা দিন, সেই ব্যাখ্যাটুকু শুধু ঐ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর সাধকদেরই জন্য, তোমার জন্য নয়। তোমার দৃষ্টি সর্ব্বসম্প্রদায়ের গণ্ডীবদ্ধতার বাইরে বিশ্বজনীন একাত্মানুভূতিতে, যদিও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি তোমার সমদৃষ্টি এবং প্রেমবুদ্ধি অবারিত থাকা চাই। কেউ অন্য ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে নিজের মতানুযায়ী সাধন কচ্ছেন ব'লে তোমার ধিক্কার-ধ্বনি উচ্চারণের অধিকার নেই।

চট্টগ্রাম
৩১শে শ্রাবণ,১৩৪১

অকিঞ্চন-বৃত্তির তাৎপর্য্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,—অনেক সাধক পুরুষকে যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কারো কাছে কিছু চান না কিম্বা কোনো কিছু সঞ্চয়ও করেন না, এর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম তাৎপর্য্য এই যে, যার সঞ্চয় নেই, সঞ্চিত বস্তু রক্ষণের কোনো উদ্বেগও তার নেই। কথায় বলে, নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। সঞ্চয় করা এক নিদারুণ সংসারী। সংসারীর জঞ্জাল থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত না থাক্‌তে পারলে ইষ্টচিন্তা জমাট বাঁধে না। কিন্তু অকিঞ্চন-বৃত্তির অপর তাৎপর্য্য বা প্রধান রহস্য এই যে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বলহীন ব'লে জ্ঞান কত্তে না পার্ল্লে ভগবানে সম্যক্ শরণাগতি আসে না। নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয় ব'লে না জানলে তাঁর চরণে আশ্রয় নেবার অটুট আগ্রহ জন্মে না। তাই অকিঞ্চন-বৃত্তিধর হ'য়ে ভগবৎ-পাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া মহাত্মারা অত পছন্দ করেন।

মানসিক অকিঞ্চনতা

প্রশ্ন হইল,—কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রের দিকে তাকাতে গেলে, যদি দেশজুড়ে সকলেই অকিঞ্চন বৃত্তিধারী হন, তাহ'লে সে দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দুই একজনই ভগবৎ-পাদপদ্মাভিলাষী হন। সুতরাং সেই দুশ্চিন্তার তোমার প্রয়োজন নেই। একান্ত ভাবে ভগবানের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদবে, তিনি সকল আশ্রয়, সকল সহায়, সকল সম্বল ও সকল অবলম্বন পরিত্যাগ ক'রে, সকল আশা, সকল ভরসা

ছেড়ে দিয়ে একমাত্র শ্রীভগবানের নামাশ্রয় ক'রে তাঁর কৃপার জন্য উন্মুখ হ'য়েই থাক্‌বেন। সার্ব্বজনিক ভাবে এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ হ'তে পারে না ব'লেই, যাঁরা সংসারের আরও দশটী কর্ত্তব্যের দায় এড়াতে অক্ষম, তাঁরা সংসারের জন্য বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সঞ্চয় ক'রেও নিজেদের সঞ্চিত বস্তুর অনিত্যতা অবিরাম স্মরণ ক'রে তার প্রতি অন্তরের আসক্তিহীনতা রক্ষা কর্ব্বেন। বাহ্যতঃ অকিঞ্চন হওয়া সম্ভব না হ'লেও তাঁরা অন্তরে অকিঞ্চন হবেন।

সঞ্চয় ও মানসিক অকিঞ্চনতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একাজ বড় শক্ত। সঞ্চয় যদি হয় ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে বা জীবমাত্রকেই ভগবানের সন্তান জ্ঞানে তাদের উপকার-উদ্দেশ্যে, তা হ'লে বাইরে সঞ্চয় ক'রেও অন্তরে নিষ্কিঞ্চন অনাসক্ত ভাবের অনুশীলন সুসাধ্য হয়। নতুবা নয়। গৃহস্থ যখন সত্যি সত্যি জানেন যে, তাঁর পুত্র, তাঁর কন্যা পালিত পোষিত গঠিত হচ্ছে একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির প্রয়োজনে, নিজের কোনও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ পরিপূরণের জন্য নয়, তখন এই সন্তানের জন্য সঞ্চয়ের চেষ্টা ক'রেও তিনি অন্তরে নিষ্কিঞ্চনের দীনতা পরিরক্ষণ কত্তে সমর্থ হন। তবে কি জানো, আসক্তির জটিল গ্রন্থি-মোচন একমাত্র ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষে ব্যাপার। সুতরাং অন্তরের এ দীনতার জন্য অবিরাম তাঁরই চরণাভিলাষী হ'য়ে

প্রার্থনা জানাতে হয়, জোর্‌সে সাধন চালাতে হয়। "আমার কিছুই নেই প্রভো, সবই তোমার, আমি কোনো কিছুরই মালিক নই, সব কিছুরই মালিক তুমি, জগতে প্রভু, পতি, স্বামী, পিতা একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, সংসারে যে আমি প্রভু, পতি, স্বামী বা পিতা সেজে ব'সে আছি, সে কেবল আমার অহঙ্কারের লীলাখেলা মাত্র, প্রকৃত প্রভু তুমি, প্রকৃত পতি তুমি, প্রকৃত মালিক তুমি, প্রকৃত পিতা তুমি, আমার সম্পত্তি, আমার সঞ্চয়, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার দাস, আমার দাসী, আমার স্ত্রী, আমার পরিজন, আমার মান, আমার প্রতিপত্তি সবকিছু হে পরমপ্রভু একমাত্র তোমার, একমাত্র তোমার,"—এই ভাব অন্তরে অবিরাম অনুশীলন ক'রে যে সব সংসারী ব্যক্তি ব্যাকুল ভাবে ভগবানের পরম পবিত্র নামের শরণাপন্ন হন, সংসারের আয় আর ব্যয়, সঞ্চয় আর খরচ তাঁদের চিত্তকে ম্লান, আসক্ত বা বদ্ধ কত্তে পারে না।

অহংবুদ্ধি ও সেবাবুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অহংবুদ্ধির প্রাখর্য্য বজায় রেখে সেবাবুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ফোটান যায় না। সেবক যদি হ'তে হয়, অহংকে বলি দিতেই হবে। "অহংবুদ্ধির ভ্রান্তি-দোষে" কত শ্রেষ্ঠ সেবক ভগবানের পূজার আয়োজন কত্তে গিয়ে আত্মপূজাই কচ্ছেন, তার কি ইয়ত্তা আছে? ভগবানের

যে সেবক, তার অহঙ্কারের স্পর্দ্ধা, অভিমানের উন্নত শির, আত্মসুখলিপ্সার সর্পিল গতি স্তম্ভিত ও বিধ্বস্ত হওয়া চাই। অবিরাম অবিশ্রাম ভগবানের পায়ে প্রার্থনা জানাও,—"ভগবান্, হে পরম দয়াল পরমপ্রভু, আমার অহংবুদ্ধির বিনাশ-সাধন কর, আমাকে তোমার শরণাগত ক'রে নাও, আমাকে জন্মে জন্মে তোমার চরণের দাসানুদাস হ'য়ে থাকবার সৌভাগ্য প্রদান কর,—তোমার নিকটে ইহপরজীবনে আমার অপর কিছুই প্রার্থনীয় নেই।"—এভাবে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তিনি অহংবুদ্ধির বিনাশ করেন, সেবাবুদ্ধির দান করেন। ব্যাকুল প্রার্থীকে তিনি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাতে তাঁর চরণ-সেবার নিত্য অধিকার লাভ হয়।

নির্ব্যক্তিক গুরুবাদের প্রয়োজনীয়তা

সান্ধ্য উপাসনার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় পত্র লিখিলেন।

নদীয়া মেহেরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"ব্যক্তিগত গুরুবাদকে এতদ্দেশ হইতে উচ্ছেদ করা অতীব কঠিন। কিন্তু ভাবী কালের গুরুগণের স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের ফলেই তাহা সম্ভব হইবে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী ভারতের প্রায় দুই

হাজার বৎসরের ঐতিহ্য ব্যক্তিগত গুরুবাদের প্রশ্রয়দাতা। এই গুরুবাদ কেবলই অকুশল করিয়াছে, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। ব্যক্তি বিশেষকে গুরু অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতীক জ্ঞান করিয়া ঐকান্তিক অভিনিবেশ প্রদানের ফলে অনেক চঞ্চলচেতা বহির্বিচরণকারী বিক্ষিপ্ত মন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ইহার দরুণ অনেক পতিতের উদ্ধার হইয়াছে। সত্যকে সর্ব্ব সময়েই স্বীকার করিয়া নিতে হইবে, সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টার ভিতরে বাহাদুরী থাকিতে পারে কিন্তু মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত গুরুবাদের ভিতরে সত্য এবং কুশল ছিল বলিয়াই ইহা এরূপ ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত গুরুবাদ তদপেক্ষা বৃহত্তর মঙ্গল, মহত্তর সত্য, ব্যাপকতর তত্ত্বোপলব্ধি সর্ব্বসাধারণের করায়ত্ত করিবে। বেদান্তের প্রাংশুলভ্য পরমতত্ত্ব এতদিন দুই দশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ছিল, কিন্তু নির্ব্যক্তিক গুরুবাদের সুপ্রসার সেই মহাবস্তুকে আপামর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সহজলভ্য করিবে। ইহা জগতের এক পরম প্রয়োজন এবং এই পরম-প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার ইহাই সন্ধিক্ষণ।"

নিত্য সম্পদের জন্য ব্যগ্র হও

যশোহর ধোপাখোলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতের কিছুই যে থাকিবে না, একথা তুমি বুঝিয়াছ। তুমি ধন্য। এই একটী কথা বুঝিবার জন্য ঋষি-মুনিদের যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিতে হইয়াছে। কিন্তু কলি-জীবের পরমায়ু অত্যল্প। এই কারণেই পরম করুণাময় কলির জীবকে অল্প তপস্যায় শ্রেষ্ঠ অনুভূতি সমূহ প্রদান করিয়া থাকেন। কলিযুগে জন্মগ্রহণ দুর্ভাগ্য নহে, এই একটী হিসাবে বরং ইহা পরম সৌভাগ্য। জগতে সবই অনিত্য, সবই অচিরস্থায়ী, সুতরাং নিত্য বস্তুর জন্য ব্যাকুল হও, অধীর হও, নিত্য সম্পদ আহরণ করিয়া তোমার ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ়, তপস্যাকে আরও কঠোর কর। অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ, ভূমাকে লাভ করিয়াই লব্ধানন্দী হও।"

নাম অব্যর্থ

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত নান্দাইল-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবন্নাম কখনও ব্যর্থ হয় না। অনন্ত কাল হইতেছে তোমার অনবধি কৃষিক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে একটী একটী করিয়া নামের বীজ অবিরাম বুনিয়া যাও। একটী নামও বৃথা যাইবে না। প্রত্যেকটীই কোনও না কোনও কালে, কোনও না কোনও যুগে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের সমন্বয়ের ভিতর দিয়া তোমার

মঙ্গলার্থে, জগতের মঙ্গলার্থে, তোমার পরমারাধিত শ্রীপ্রভুর প্রীত্যর্থে অঙ্কুরিত হইবে, শাখান্বিত হইবে, পল্লবিত হইবে, পুষ্পিত হইবে।"

জগৎ-সেবার জন্মস্থান

কুমিল্লা সহদেবপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজের চিত্তকে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করিয়া দিয়া বিগতকল্মষ এবং অপাপবিদ্ধ হও। তখন তোমার ইচ্ছাশক্তি একমাত্র জগতের কুশল ব্যতীত অপর কিছুই চাহিবে না এবং বাহ্যতঃ তুমি জগন্মঙ্গলকর কোনও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে বিজড়িত না করিলেও তোমার সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তিই সকলের অজ্ঞাতসারে জগৎ জুড়িয়া শুভপ্রয়াসের জন্মদান করিবে। জগৎ-সেবার জন্মস্থান পরামর্শ-সভায় নয়, পরন্তু তোমার নিঃস্বার্থ পরোপকারী নিষ্কলুষ মনে।"

দোষ-দৃষ্টি-বর্জ্জিত ও একলক্ষ্য হও

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বেলঘর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা যে গুরু-প্রবরের বিষয়ে লিখিয়াছ, আমি

তাঁহাকে চিনি না কিম্বা তাঁহার সম্পর্কে সপক্ষে বা বিপক্ষে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কোনও প্রশংসা বা অখ্যাতি শ্রবণ করি নাই। বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে কোনও প্রতিকূল মতামত প্রকাশ করিয়া তাহাকে লোক-চক্ষে হেয় বা ক্ষুদ্র করা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। কিন্তু তোমাদিগকে একটা কথা বলিতে চাহি যে, দীক্ষাদাতা গুরুদেবের ছোটবড় দোষত্রুটীর বিচার তোমাদের পক্ষে দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বেই ত' হওয়া উচিত ছিল। আর, দীক্ষাদাতার দোষ-ত্রুটীর বিচারে বৃথা অচিরস্থায়ী জীবনের মহা-মূল্যবান্ সময়ের অপচয় করাও বিধেয় নহে। দীক্ষা-প্রাপ্ত মন্ত্রকে জীবনের সর্ব্বস্ব এবং সর্ব্বাবলম্বন বলিয়া প্রেমভরে আঁকড়িয়া ধরিয়া মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব মিটাইতে চেষ্টা কর। নামদাতা মহাপুরুষের ভিতরে ত্রুটী থাকিতে পারে, কেননা অধিকাংশ মানুষই ত্রুটীশীল, ভ্রমশীল, প্রমাদশীল। নামদাতা মহাপুরুষের মধ্যে কণামাত্রও ত্রুটী না থাকিতে পারে, তবু হয়ত তোমরা ত্রুটীর পর ত্রুটী আবিষ্কার করিয়া যাইতেছ, কেননা অধিকাংশ মানবেরই চক্ষু দৃষ্টিহীন, দোষ-দৃষ্টিসম্পন্ন এবং পঙ্কিল। কিন্তু ব্যাপার যাহাই হউক, তোমাদের পক্ষে সুপন্থা হইতেছে গুরুদেবের দোষ-ত্রুটীর আলোচনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তৎপ্রদত্ত পরমপবিত্র ভগবন্নাম অবিরাম অবিশ্রাম প্রেমভরে প্রাণ ভরিয়া সাধন করিয়া যাওয়া। ইহা যদি না করিতে পার, মন্ত্র সত্যময় শুভময় সুখময় হওয়া সত্ত্বেও বারংবার গুরু-পরিবর্ত্তনরূপ

বিভ্রাটে পতিত হইয়া জীবনের অনেকখানি মূল্যবান্ সময়ের অপচয় করিয়া ফেলিবে। চক্ষু হইতে দোষ-দৃষ্টি কমাইয়া ফেলিয়া অন্তরে ভগবৎ-সাধনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতাকে জাগাইয়া তোল। ভগবানকে তোমরা পরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ কর এবং এই একমাত্র লক্ষ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করিয়া বাহিরের সকল কিছু ভুলিয়া যাও। ধর্ম্ম তাহাতে, শান্তি তাহাতে, তৃপ্তি তাহাতে, নিশ্চিন্ততা তাহাতে।"

মানুষের করুণা ও ভগবানের করুণা

কুমিল্লা জেলান্তর্গত আদ্রা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষের সম্পর্কে অন্তরের সকল করুণা-প্রার্থনা তুলিয়া আনিয়া একান্তভাবে পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের নিকটে করুণাপ্রার্থী হও। মানুষ যদি কখনও করুণা করে, তবে তাহাতে অবজ্ঞা করিও না, কেন না, ভগবানেরই প্রেরণায় মানুষ করুণা-রূপ দেবসুলভ বৃত্তির অনুশীলন করে; কিন্তু অন্তরকে অনুক্ষণ মানুষের করুণার প্রতি উন্মুখ করিয়া করিয়া কেবলই যে ভগবনের চরণচ্ছায়া হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছ, একথা কখনও ভুলিও না। মানুষের ভিতরেও

ভগবান্ আছেন, এই কারণেই তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের দয়ার অংশ-বিশেষ স্থলে স্থলে বা কালে কালে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সে দয়া, সে করুণা সসীম, অল্পব্যাপক এবং অচিরস্থায়ী। পরন্তু ভগবানের করুণা অনন্ত-কোটি-কল্পকালব্যাপী এবং অমোঘ। মানুষ যখন চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তালে-বেতালে হিসাবে-বেহিসাবে তোমার গুণ-গুঞ্জন, তোমার শ্রমাপহরণ, তোমার ভার-বহন প্রভৃতি কার্য্যে অযাচিত ভাবে নিজেদিগকে নিয়োজিত করিবে, তখনও তুমি নিজেকে একান্তই অস্বামিক, অনাথ, নিরাশ্রয় এবং দুর্গত বলিয়া জানিয়া অশরণের শরণ শ্রীভগবানের পায়ে পুনঃ পুনঃ কাতর নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে করুণা প্রার্থনা করিও। তাঁহার করুণায় ফাঁকী নাই, তাঁহার স্নেহ-দয়া-মায়া মমতায় মেকী নাই, তাঁহার ভালবাসায় ভেজাল নাই।"

প্রতিষ্ঠা-প্রার্থী বনাম সেবক

বরিশাল জেলান্তর্গত বাইশারী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"Personal Ambition" (ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা) আর Spirit of Service-এর (সেবাবুদ্ধির) মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা দীর্ঘকাল সম্ভব নহে। একটীর শেষ লক্ষ্য নিজেকে প্রধানতম করা, অপরটীর শেষ লক্ষ্য

নিজের নিজত্বকে নিঃশেষে বলি দেওয়া। অনেক ব্যক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে জনসেবা, দেশসেবা বা দেবসেবায় ব্রতী দেখা যায়। যতক্ষণ প্রতিপত্তি লাভের ইহারা সহায়ক হয়, ততক্ষণ অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় না। অনেক ব্যক্তিকে নিজ সেবার সার্মথ্য এবং ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর করিয়া নিবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হইতে হয়, কেন না অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সেবা অনেক সময়ে প্রতিকূল অবস্থার চাপে প্রতিহত হয় কিম্বা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রহিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যতক্ষণ সেবাকার্য্যের ইহা সহায়ক, ততক্ষণই এই সকল ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষ্ঠাশার অনুবর্ত্তন করা সম্ভব হয়। অপর সর্ব্বত্র সেবাবুদ্ধি ও প্রতিষ্ঠাশার পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ জানিও। সুতরাং প্রকৃতই যদি সেবক হইতে চাহ, তাহা হইলে তোমার সেব্য কে, তাহা আগে চূড়ান্ত আত্মপরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া নাও এবং একের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জীবনের বহুমুখিনী আকাঙ্ক্ষার চির-পরি-নির্ব্বাণ ঘটাও। প্রতিষ্ঠা-লিপ্সুর সহস্র আশা, সহস্র আকাঙ্ক্ষা, সহস্র কামনা, সহস্র বাসনা, কিন্তু সেবকের আশা মাত্র একটী, আকাঙ্ক্ষাও মাত্র একটী, কামনাও মাত্র একটী, বাসনাও মাত্র একটী। তাহা হইতেছে সেব্যের নিঃশেষ প্রীতি-সম্পাদন। প্রতিষ্ঠালিপ্সুর জগজ্জোড়া খ্যাতি-যশঃ-কীর্তি বিঘোষিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সেবককে তার জীবনৈকারাধ্য ব্যতীত জগতে আর কে চিনে? সেবকের

বিশেষত্ব তার নীরব আত্মবিসর্জ্জন, কেহ তাহাকে চিনে না, কেহ তাহাকে জানে না, কেহ তাহার মর্ম্মের কথা অবগত হয় না, বাদে তাহার জীবনের পরম দেবতা। আমার দৃষ্টিতে এই সেবকই জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমার প্রণতি, যুগে যুগে যাঁহারা সেবক হইয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের চরণে এবং তোমার জন্য আমার আশীর্ব্বাদ, তুমি সেবক হও।"

কিসের হিসাব রাখিতে হইবে

চট্টগ্রাম-কুতুবদিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হিসাব করিবে কিসের জান? প্রতিদিন তুমি কতক্ষণ ভগবান্‌কে ডাকিয়াছ, কতবার তাঁর রাতুল চরণের পানে তোমার কাতর ব্যাকুল অধীর দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছ, কতবার তাঁহাকে জীবনের জীবন আপনার আপন বলিয়া অনুভব করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছ। জড় দেহ লইয়া জড় জগতে যখন বাস করিতেছ, তখন জড়-সম্পত্তির জমাখরচ ত' রাখিবেই, কিন্তু জড়-জগতের এই হিসাব-নিকাশ নিতান্তই দুই দিনের। সুতরাং প্রত্যহ তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ-স্পন্দনের হিসাবটীও রাখিতে ভুলিও না। সূর্য্যোদয় হইতে যদি রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত জড়-জগতের হিসাবের খাতা লিখিতে পার, তাহা হইলে শয়নকালে দশ মিনিট এবং শয্যাত্যাগান্তে অর্দ্ধ ঘণ্টা তোমার অনন্তকালের নিত্য সম্পত্তির জমাখরচের খাতার

প্রতি দৃষ্টি দিতে বাবা কেন সমর্থ হইবে না? বলিবে, রুচির অভাব। কিন্তু যে-কোনও কাজ করিতে করিতেই ক্রমশঃ তাহাতে রুচি সঞ্জাত হয়। আর, জীবের চিরন্তন স্বভাবই হইতেছে, ভগবদ্‌ভজন। কিছুদিন নিত্য সম্পত্তির হিসাব লিখিতে বসিলে দেখিবে তোমার সেই চিরন্তন স্বভাব আপনা আপনি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তখন আর ভগবদ্‌ভজন অরুচিপ্রদ বা অমধুর বোধ হইবে না।"

কন্যাকে চিরকুমারী রাখা

ঢাকা-ধানমণ্ডাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কন্যাকে চিরকুমারী রাখিয়া দেশ ও সমাজের সেবা করাইতে ত' চাহেন? প্রস্তাব উত্তম। কিন্তু আপনার কি আপনার দেশ এবং সমাজের সহিত সুগভীর পরিচয় আছে? ভাল জিনিষকে মন্দ বলিয়া ভাবিতে, পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র বলিয়া নিন্দা ছড়াইতে এমন পটু, এমন আগ্রহশীল আর কোনও দেশ বা সমাজ কি পাইবেন? আপনার চিরকুমারী কন্যা মহিলাশ্রমের দেওয়াল ডিঙ্গাইয়া বাহিরে না আসিলেও নিন্দামুখর রসনা কিন্তু চুপ থাকিবে না; আর যদি সে বাহিরে আসিয়া বিপুল বিশ্বের সেবায় লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ত' সোণায় সোহাগা। রক্ষক ব্যতীত যাহারা পথ চলিতে পারে না, অপরিচিতের গৃহে নিশাযাপন বিপদে

পড়িয়াও যাহার পক্ষে সঙ্কোচজনক, তাহার অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। এই দেশ দেশ নহে, ইহা ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবের লীলাভূমি। এই দেশেই জন্মিয়াছি বলিয়া এই সব প্রেতগুলিকেও ভালবাসি, স্নেহ করি, আপন বলিয়া জ্ঞান করি, জীবনতুল্য ভাবিয়া আলিঙ্গন করি। কিন্তু এই প্রেতের পালের মধ্যে প্রাণ-পুত্তলী কন্যাকে ছাড়িয়া দিবার সাহস কয়জন পিতার হইবে? আপনার যদি সে সাহস হয়, তবে আপনি নিতান্তই দুঃসাহসী। আমি বলি, কন্যাকে চিরকুমারী থাকিবার যোগ্য সদ্‌গুণাবলিতে পরিমণ্ডিত করিতে থাকুন, ইহাতে শৈথিল্য করিবেন না, কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন কি হইবে, তদ্বিষয়ে এখনই কোনও শেষ সিদ্ধান্ত করিবেন না। করুণাময় পরমেশ্বরের চরণে ব্যাকুল নিবেদন জানাইতে থাকুন, আপনার কন্যা যেন তাঁহারই পূজার লাগে। তিনি এই পূজা কি সধবার হস্তে নিবেন, না, সন্ন্যাসিনীর হস্তে নিবেন, ইহা তিনিই যেন স্থির করিয়া দেন।"

জীবমাত্রেই শিববুদ্ধি

রাত্রি এগার ঘটিকার পরে বক্‌সী-বাজার হইতে কয়েকজন দর্শনার্থী আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন আমার বিশ্রামের সময়। এমন অসময়ে এসেছ কেন?

আগন্তুকদের একজন বলিলেন,—মহাপুরুষ-দর্শনের আবার সময় অসময় কি? শিবের পূজা প্রাতেও চলে, রাত্রি দ্বিপ্রহরেও চলে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিবের ত' তা চলে, কিন্তু আমি যে জীব! আমার দেহ আছে, সেই দেহের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, স্বাস্থ্য আছে, ব্যাধি আছে, শ্রান্তি আছে এবং বিশ্রামের প্রয়োজনও আছে। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন,—দেহের দৃষ্টিতে আপনি জীব, কিন্তু আত্মার দৃষ্টিতে আপনি শিব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহটা আগে খ'সে প'ড়ে যাক্, তখন যত ইচ্ছা 'শিব' ব'লো। এখন আমাকে জীব ব'লেই মনে কর এবং জীবের প্রাপ্য অনুগ্রহগুলি দিতে কৃপণতা ক'রো না। দেহটার যেমন তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় খাদ্য দরকার হয়, তেমনি ক্লান্তিতেও বিশ্রাম আবশ্যক। আর এক কথা হচ্ছে এই যে, আত্মার দৃষ্টিতে আমাকে যদি 'শিব' ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকো, তবে তুমি নিজেকেও 'শিব' ব'লে ভাব্‌তে কসুর ক'রো না। এক ছাড়া ত' বাবা দুই নেই এবং সেই একই তোমাতে, আমাতে, সর্ব্বভূতে স্বরূপতঃ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছেন। এই বোধকে সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বতত্ত্বে পরিস্ফুট করার চেষ্টা ক'রো।

উক্ত আগন্তুক বলিলেন,—আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, তাই নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি স্থান ছাড়া সকল স্থানে বা সকল বস্তুতে শিববুদ্ধি প্রয়োগ কত্তে পারি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পারো বাবা পারো, নিশ্চয়ই পারো। তবে সেই পারাটা হচ্ছে অভ্যাস-সাপেক্ষ। অনুশীলন ছেড়ে দিও না। সর্ব্বজীবে শিববুদ্ধি কর, সর্ব্ববস্তুতে ইষ্টের উপস্থিতি চিন্তা কর। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনিই সব-কিছুর মূল কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, কিশলয়, পুষ্প এবং ফল।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্

আগন্তুকেরা এতক্ষণে প্রকাশ করিলেন, যে, তাঁহারা পরের চাকর, সমগ্র দিবস জুড়িয়া মনিবের মন যোগাইতে হয়, গভীর রাত্রি ছাড়া আর সৎসঙ্গ করিবার জন্য অবসর বা অনুমতি পান না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। সকল প্রাণীর যেটা ঘুমাবার সময়, ভগবানে সম্যক্‌রূপে যুক্ত পুরুষ সেই সময়ে জেগে থাকেন এবং নিজের পরম পুরুষার্থ অর্জ্জন করেন। অবশ্য এর আরও একটু গভীরতর অর্থ আছে। যে পরম তত্ত্ব সম্পর্কে সর্ব্বজীব উদাসীন, উপেক্ষাপরায়ণ এবং অনাগ্রহী, সেই প্রেমরসামৃত-সিন্ধু-স্বরূপ শ্রীভগবান্ সম্পর্কে সংযত-চিত্ত নিষ্ঠাবান্ ভাগ্যধর ব্যক্তিরা নিমেষের জন্যও বিস্মরণশীল নন। তোমরা বাবা তেমন হও। চাকুরীই কর, আর যাই কর, ভগবান্‌কে কখনও ভুল্‌বে না।

চট্টগ্রাম

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪১

পূজনীয় শ্রীযুক্ত নগেশ ব্রহ্মচারী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির আলোচনা চলিতেছে। এমন সময়ে একজন আগন্তুক আসিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী মহাপুরুষের নিন্দা সুরু করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গে সঙ্গে নীরবে স্থান ত্যাগ করিলেন এবং পূজনীয় নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয় আগন্তুককে কিছু ফলমূল প্রসাদ প্রদান করিয়া সুকৌশলে বিদায় করিয়া দিলেন।

মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে কুৎসা

নিন্দক প্রস্থান করিলে পরে পূজনীয় নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—দেখ্‌লেন স্বামীজী লোকটার মূর্খতা। হাজার হাজার লোক যে সব মহাপুরুষদের বৎসরান্তে একবার পাদস্পর্শ পেয়ে জীবনকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, তাঁদের নিয়ে রসনার চপলতা চালাতে এদের একটু ভয় পর্য্যন্ত নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইংরাজীতে একটা প্রচলন আছে যে, Fools rush in where angels fear to tread. পবিত্রচেতা দেবদূতেরা যেখানে পা-ছোঁয়াতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে উল্কা বেগে ছুটে যায়। কিন্তু দেখুন, কোন্ মহাপুরুষকে লোকজিহ্বায় নিন্দিত হ'তে না হয়েছে? সুযোগ পেলেই নিন্দকেরা নিন্দা কর্ব্বে। তাদের

কোনও সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিচারের বালাই নেই। যে-কোনও ঘটনাকে তারা কদর্থ-সমন্বিত ক'রে ব্যাখ্যা কর্ব্বে। কোকিলা-মুখের স্বামী নিগমানন্দ, জগৎপুর আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দ, কাশীধামের পূর্ণানন্দ, গেণ্ডারিয়া আশ্রমের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভৃতি কার না এরা নিন্দা করেছে? সে কি সাধারণ রকমের নিন্দা? এসব নিন্দার কোনো আভিধানিক প্রতিশব্দ পর্য্যন্ত নেই। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাইদের কারো কারো মুখে শুনেছি যে, ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে বিবেকানন্দকে এত কদর্য্য কথাই এসব নিন্দকের দল বলেছে, যার কণামাত্র কাণে যাওয়াতে মনের দুঃখে স্বামীজী দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে আত্মসম্বরণ ক'রে নিলেন। নীচ ব্যক্তিরা ভিত্তিহীন নীচ কথা বল্‌বেই, তাই ব'লে কি মহপুরুষেরা ফিরে এদের গ্লানি ক'রে বেড়াবেন? কুকুরেই মানুষ কামড়ায়, মানুষে কখনো কুকুর ধ'রে কামড় মারে না।

ডায়োজিনিস ও কুৎসা-রটনা-কারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিসকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"কোন্ পশুর দংশন সব চেয়ে মারাত্মক?" ডায়োজিনিস জবাব দিয়েছিলেন,—"গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোষামোদকারী চাটুকার হচ্ছে সেই

পশু, আর বন্য পশুর মধ্যে কুৎসা রটনা-কারী পরনিন্দক হচ্ছে সেই পশু।" ডায়োজিনিসের মতে এদের দংশনের মতন মারাত্মক দংশন আর কোনও জন্তুর নেই, আর চাটুকার এবং কুৎসাকার প্রকৃতপ্রস্তাবে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

রামচন্দ্রপুরী ও শ্রীচৈতন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিন্দকের রসনাকে কেউ কখনো স্তব্ধ কত্তে পারে না। অমন যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, তাঁকেও নিন্দকের নিন্দা শুন্‌তে হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের গুরু হ'লেন ঈশ্বর-পুরী। রামচন্দ্রপুরী এই ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই, সুতরাং শ্রীচৈতন্যের চাচা-গুরু। গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং নিজগুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা ব'লে শ্রীচৈতন্য রামচন্দ্র-পুরীকে গুরুতুল্য জ্ঞান ক'রে যথাযোগ্য সম্মান-সম্ভ্রমাদি প্রদর্শন কত্তেন। কিন্তু নীলাচলে অবস্থানকালে রামচন্দ্রপুরী সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বকার্য্যে ছিদ্রানুসন্ধান কত্তে আদা-নূন খেয়ে লেগে গেলেন।

"প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান।।
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাহাঁ ছিদ্র না পাইল।।"

মহাপ্রভুর একটা গুণও তাঁর চোখে ঠেক্‌ল না, তিনি কেবলি দোষানুসন্ধান কত্তে লাগ্‌লেন। যখন কোনো খানেই কোনো

দোষ পেলেন না, তখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে ভক্তগণ ভক্তির সহিত যে ভিক্ষা প্রদান কত্তেন, তার উপরে শনির দৃষ্টি দিলেন। "শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হ'য়েও অত্যধিক ভোজন করে, এরূপ ভোগী উদর-পরায়ণ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সংযম কিরূপে হবে,"—এই কথা ব'লে তিনি অবিরাম নিন্দাপ্রচার চালাতে লাগ্‌লেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে রামচন্দ্রপুরী যখনই আস্‌তেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল দোষানুসন্ধান করা। রামচন্দ্রপুরী যে শ্রীচৈতন্যের নিন্দক, তা' চৈতন্যদেব জান্‌তেন, কিন্তু তথাপি তিনি রামচন্দ্রপুরীকে সম্মান, সম্ভ্রম প্রদর্শন কত্তে বিরত হতেন না। একদিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী দোষানুসন্ধান-মানসে চৈতন্যদেবের বাসগৃহে এসে উপস্থিত। পুরী দেখ্‌তে পেলেন, চতুর্দ্দিকে পিপীলিকা বিচরণ কচ্ছে, পিপীলিকারা নিজ স্বভাব বশতঃই যে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রে থাকে এবং অনেক সময় মিষ্ট দ্রব্য না থাক্‌লেও যে তারা খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, মিষ্টস্বাদ আছে কি না ব'লে মানুষেরা জানে না, এমন অনেক বস্তুর মধ্যেও যে তারা মিষ্ট স্বাদ পায়,—রামচন্দ্রপুরী সে কথা বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেন না। এতদিন লোকের কাছে নিন্দা গেয়ে বেড়িয়েছেন, আজ একেবারে চক্ষের সমক্ষে পিপীলিকা! এত বড় জ্বলন্ত প্রমাণকে কি অগ্রাহ্য করা যায়? পুরী তখন মহাপ্রভুর মুখের উপরেই ব'লে দিলেন,—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরজানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসা।"

অর্থাৎ—"রাত্রে এখানে আখের গুড় ছিল, তারই জন্যে এখানে পিঁপ্‌ড়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হায়! সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীদের শেষ কালে কি না এরূপ নিন্দনীয় ইন্দ্রিয়-লালসা।" রামচন্দ্র পুরীর কুৎসা-প্রচার-কুস্বভাবের কথা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য লোকমুখে শুনেছিলেন, এখন একেবারে সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল। নিজ-নিন্দা-শ্রবণে,—বিশেষতঃ যে নিন্দা একেবারে অমূলক, একেবারে মিথ্যা,—মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ না হ'য়ে তাতে ভয় এবং সঙ্কোচ প্রদর্শন ক'রে আত্ম-পীড়নই কর্ত্তব্য ব'লে স্থির কর্ল্লেন। তিনি সেবক গোবিন্দকে ডেকে বল্‌লেন,—"আজ থেকে আমার ভিক্ষার কঠোর নিয়ম নির্দ্ধারিত হ'ল। তোমাকে সঠিক পরিমাণ ব'লে দিচ্ছি, এর বেশী যদি খাদ্য আমার জন্য আন, তা হ'লে আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না।" গোবিন্দ সকল বৈষ্ণবদের নিকটে এই আদেশ জানিয়ে দিলেন, আর গৌড়ভক্ত বৈষ্ণবগণ হাহাকার কত্তে লাগ্‌লেন। শ্রীচৈতন্যের অর্দ্ধাশন সুরু হ'ল। এই দৃশ্য দেখে ভক্তগণ অনেকে একেবারে ভোজন পরিত্যাগ ক'রলেন। কিছুকাল পরে এই সব সংবাদ শুনে রামচন্দ্রপুরী চৈতন্যদেবের নিকটে আগমন ক'রলেন। এসে দেখ্‌লেন, মহপ্রভু শ্রীচৈতন্য অর্দ্ধাশনে জীর্ণ-তনু হয়েছেন, তখন রামচন্দ্রপুরী সাঁড়ম্বরে উপদেশ দিতে লাগলেন,—"দেখো গৌরাঙ্গ, রাক্ষসের মত

কেবল পেটের পূজা, এটা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়, আবার একেবারে অর্দ্ধাশন ক'রে যে তনুকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর কচ্ছ, এটাও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়। যথাযোগ্য উদর ভ'রে খাবে, কিন্তু বিষয়-ভোগ কর্ব্বে না,—বুঝেছ? অভিমান-জয়ী অমানী গৌরাঙ্গদেব দৈন্য-সহকারে বল্লেন,—"আমি 'অজ্ঞ বালক', এবং আপনার শিষ্য; আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই আমার ভাগ্য।" রামচন্দ্রপুরী ত' শ্রীচৈতন্যদেবের বাসস্থান ত্যাগ কর্ল্লেন, এদিকে কিছুদিন পরে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য, অর্থাৎ রামচন্দ্রপুরীর অপর গুরুভ্রাতা মহাপুরুষ পরমানন্দ পুরী এলেন নীলাচলে। শ্রীচৈতন্যের অর্দ্ধাশনের কথা শ্রবণ ক'রে সকল বৈষ্ণবদের নিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্যের নিকটে গিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"দেখ গৌরাঙ্গ, রামচন্দ্রপুরী পরম নিন্দক, তার স্বভাবই লোকের দোষানুসন্ধান করা, গুণের প্রতি অন্ধ থাকা। আহারে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে নিয়ে সে জিদ-জবরদস্তি ক'রে গুরুভোজন করাবে, এবং তার পরেই তাকে 'রসনা-লম্পট', 'জিহ্বার লালচী' প্রভৃতি ব'লে নিন্দা কর্‌বে। রামচন্দ্র কখনো স্বেচ্ছায় অতিভোজন কর্ব্বে এবং পরিশেষে ভোজনদাতাকে গালাগালি সুরু কর্ব্বে,—'তুমি নিতান্ত অধার্ম্মিক, কেন না সন্ন্যাসীকে অতি ভোজনের পাপে লিপ্ত ক'রে তুমি তার সর্ব্বনাশ কত্তে চাও।' দেখ গৌরাঙ্গ, এরূপ মক্ষিকা-স্বভাব ব্যক্তির কথায় তোমার আহার-সঙ্কোচ বা অন্নত্যাগ করা উচিত নয়।

আগে চলা, না, পিছে চলা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রাম্য কথায় বলে না, "আগে চল্‌লেও নির্ব্বংশের পো, পিছে চল্‌লেও নির্ব্বংশের পো"? এক বছর মৌনী হ'য়ে রইলাম, পঞ্চাশের উপরে চিঠি এল,—"জানো, এই দরিদ্র দেশবাসী তোমার মত অলসের অন্ন সংস্থান কত্তে ক্লেশ বোধ করে।" অথচ কে বা কারা যে আমার অন্ন-সংস্থান করেন, দূরদেশে অবস্থানকারী এসব পত্রলেখকদের কারো তা জানাই নেই। যাক্, আজকাল আবার মানুষ-জন এলে কথা বলি, কেউ পত্র লিখ্‌লে জবাব দেই, কেউ কোনও প্রশ্ন কর্‌লে সমস্যার মীমাংসা ক'রে দেই,—ব্যস, আর এক দল লোক ব'লে বেড়াচ্ছে, "ভারী একজন কথক হয়েছেন, ভগবানের নাম ভুলে যত বহির্ম্মুখ কাজ। কত গ্রামে যাই, ছেলেরা সব দল বেঁধে ব'সে কথা শোনে, কেউ কেউ অনুরোধ করে,—"মেয়েদেরও কিছু শুনান।" আমি অক্ষমতা জ্ঞাপন করি, বলি,—"মেয়েদের প্রয়োজনীয় সব কথা আমার দ্বারা বলা সম্ভব নয়, আমার যে বাছা দাড়ী আছে, তাই এজন্য মহিলা-কর্ম্মী দরকার।" কিন্তু পাঁচ কিম্বা দশ বছর পরে যখন দু-একটী মহিলা-কর্ম্মীকে দিয়ে কাজ সুরু করাব, কাউকে দিয়ে লেখাব চিঠি, কাউকে দিয়ে দেওয়াব বক্তৃতা, তখন আবার সোর-গোল উঠ্‌বে,—"গেল রাজ্য, গেল মান, সামালো, সামালো।" র-

গ্রামে গিয়েছিলাম, ছেলেরা বেশ প্রেমের সঙ্গে গ্রহণ কর্ল্ল, সৎকথা শুন্‌তে চাইল, শুনালাম, তারপরে পায়ে হেঁটে নিজের আশ্রমে চ'লে এলাম। একজন প্রশ্ন ক'রে বসলেন,—"ঐ গ্রামে গিয়েছিলেন ত' একটা মহোৎসব কর্ল্লেন না কেন? জানেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাম-কীর্ত্তন আর মহোৎসবের মধ্য দিয়েই ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন? পূর্ব্ববর্ত্তী দিক্‌প্রদর্শকগণের আমোঘ নির্দ্দেশ পালন কর্ব্বেন না, আর মনে মনে অভিমান কর্ব্বেন যে, খুব ধর্ম্ম-প্রচার কচ্ছেন। এসব কি সাধুর লক্ষণ?" আ-গ্রামে গেলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে নিজেদের বুদ্ধিতেই ছেলেরা সব চাঁদা তুলে এক মহোৎসব কর্ল্ল, কীর্ত্তন হ'ল, উপদেশ হ'ল, তারপরে, নিজ আশ্রমে ফিরে এলাম। চে—গ্রামের একটী যুবক এসে পথের মধ্যে প্রশ্ন কর্ল্লেন,—"হ্যাঁ মশায়, আপনারা কি শেষ পর্য্যন্ত দেশটাকে বৈরাগী-বোষ্টম, নেড়ানেড়ি আর কর্ত্তাভজার আড্ডায় পরিণত কর্ব্বেন? উপদেশ দিচ্ছিলেন, বেশ কচ্ছিলেন। যার যা শুন্‌বার শুনে দিব্যি নিশ্চিন্তে নিজ নিজ ঘরে চ'লে যাবে। কিন্তু তা ত' নয়! আবার ক্যাংলামি ক'রে এক পেট খেয়ে আসাও চাই। আপনারা এভাবে আলস্যের এবং পরমুখাপেক্ষিতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন।" প্রশ্নকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—"বাবা, তুমি ত' সেখানে খিচুড়ী প্রসাদ খাও নি?" প্রশ্নকর্ত্তা জবাব দিলেন,—"সবাই খেতে ব'সে যাচ্ছেন দেখে, আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকলজ্জায় ব'সে পড়্‌লাম। কিন্তু

মশায়, আপনাদের এসব আচরণ বড় অন্যায়।" প্রশ্নকর্ত্তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—"আমাদের অন্যায় ত' বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে কি কেউ ঘাড়ে ধ'রে বসিয়ে দিয়েছিল, না তুমি না বস্‌লে নিকটতম আম্রবৃক্ষে গলায় দড়ি দিয়ে তোমাকে ফাঁসি দেবে ব'লে জেদ কচ্ছিল? প্রশ্নকর্ত্তা জবাব দিলেন,—"তা কেউ করে নি, তবে গরম গরম খিচুড়ীটা দেখে ভাবলাম, 'আসা' বস্তু ছাড়ি কেন?" নিন্দকের অবস্থা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই এইরূপ।

প্রকাশ্য শত্রু কিন্তু গোপন বন্ধু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী একজন মহাপুরুষের নিন্দা না ক'রে আগন্তুক যদি আমার নিন্দা কত্তেন, তাহ'লে আমি সেই নিন্দা-বাক্য অপ্রিয় জ্ঞান না ক'রে প্রীতি-সহকারে কাণ পেতে শুনতাম। নিন্দক ব্যক্তি প্রকাশ্যে আমার শত্রু, কিন্তু গোপনে আমার বন্ধু। সে নিজেও জানেনা যে, সে আমার বন্ধু কিন্তু আমি তা জানি। নিন্দকের নিন্দা, অমূলক হোক্ আর সমূলক হোক্, যখন আমার চিত্তকে চঞ্চল কর্ব্বে, তখন বুঝবে, "আমার ভগবন্নির্ভর ক'মে গেছে, আমার ঈশ্বর-নির্ভর দৃঢ়তর হওয়া দরকার, আমার ভগবদ্‌বিশ্বাস ভগবানের করুণাময়ত্বে বিশ্বাস, ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে, আমাকে হাজার দিকের হাজার চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বাগ্রে একান্তে শরণাগত

হ'য়ে ভগবদাশ্রয় কত্তে হবে।" এভাবে নিন্দক আমার আধ্যাত্মিক চরিত্রের 'ব্যারোমিটার' বা তাপমান যন্ত্র। সুতরাং বন্ধু। নিন্দক যখন আমার কাণের কাছে কেবলি কুৎসা, কেবলি জঘন্য অভিযোগ, কেবলি কদর্য্য উক্তি-সমূহ উপস্থিত কত্তে থাক্‌বে, তখন আমাকে জান্‌তে হবে,—"হয় ভগবান্ আমাকে আদেশ কচ্ছেন, গৃহীত কর্ম্মপন্থাকে বৃহত্তর ব্যাপকতর পরিধিতে প্রসারিত ক'রে মত্ত হস্তীর মত লোকমত অচিরে দলন ক'রে আসা, নতুবা লোক-সংসর্গ বর্জ্জন ক'রে অবিশ্বাসীদের ছোঁয়াচ ছেড়ে, নিভৃত প্রদেশে একান্তে ব'সে অবিরাম ঈশ্বর-স্মরণে নিমজ্জিত হ'য়ে যাওয়া, কিন্তু এ দুইটীর কোন্‌টী আমার গ্রহণীয় কিম্বা বিপরীত-ধর্ম্ম, এই দুই পন্থার মধ্যে কোনও সমন্বয় সাধন সম্ভব বা প্রয়োজন কি না, তা জেনে নিতে হবে একান্তই জগদীশ্বরের প্রেমারুণ চরণকমলে আত্মসমর্পণ ক'রে।" এভাবে নিন্দক আমার ঈশ্বরমুখ হবার গৌণ সহায়ক হলেন। সুতরাং তিনি বন্ধু। নিন্দকের স্বভাব পরের অনিষ্ট করা। কিন্তু এভাবে ঈশ্বর-মুখ হবার সহায়তা ক'রে তাঁরা আমার পর থেকে আপন হচ্ছেন এবং অনিষ্ট না ক'রে ইষ্ট কচ্ছেন।

ভগবন্নাম কি আভিধানিক শব্দ মাত্র

অপরাহ্ণ চারিটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম

ত্যাগ করিবেন। সুতরাং অতঃপর চিঠিপত্রের জবাব দিতে বসিলেন।

কুমিল্লা-রসুলপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তরে লিখিলেন,—

"ভগবানের নাম আভিধানিক শব্দ মাত্র নয়। ইহা পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন। নিজেকে একান্ত নিরাশ্রয় জানিয়া পরম-মঙ্গলময় নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামের সেবা করিতে করিতেই তোমার উপলব্ধি হইবে যে, নামই ভগবান।"

ঈর্ষ্যা মারাত্মক পাপ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কুটী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চিত্তকে ঈর্ষ্যা-বর্জ্জিত কর। ঈর্ষ্যা বড়ই মারাত্মক পাপ। পিতা তোমার অপর ভ্রাতাকে বেশী ভালবাসিতেছেন? বাসিবার নিশ্চিত কোনও সঙ্গত কারণ আছে। গুরু তোমার অপর গুরুভ্রাতাকে বেশী অনুগ্রহ করিতেছেন? করিবার নিশ্চিত কোনও সঙ্গত কারণ আছে। নেতা তোমার অপর সহকর্ম্মীর প্রতি একটু বেশী নেক-নজরে চাহেন? চাহিবার নিশ্চয়ই কোনও সঙ্গত কারণ আছে। যে গুণ থাকাতে তোমার অপর ভ্রাতা বা অপর সতীর্থ বেশী স্নেহ-আদর-ভালবাসা পাইতেছে, সেই গুণটীর অনুশীলন কর, সেই গুণটীর সমাবেশ নিজ

চরিত্রে ঘটাও। কখনও কখনও অসহায় ও দুর্ব্বল পুত্র, শিষ্য বা ভৃত্য দয়ালু পিতা, গুরু বা মনিবের একটু বেশী প্রশ্রয় পায়। সে ক্ষেত্রে ঈর্ষ্যা আরও অবাস্তব। যাহার প্রতি পিতা, গুরু বা প্রভু সদয়, তাহার উপরে ঈর্ষ্যান্বিত হইবার তোমার কি সদ্‌যুক্তি আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যিনি এই স্নেহ-ভালবাসা প্রদানে কম-বেশী করেন, ক্রোধ না করিলে প্রাণে যদি নাই মানে ত' ক্রুদ্ধ হইলে তাহার উপরে হইতে পার, কিন্তু যাহাকে তিনি ভালবাসেন, তাহার উপরে ক্রোধের কোনও যুক্তিই দেখি না। নামজাদা সব মহাপুরুষ,—সাধু, সন্ত, মোহন্ত, ইঁহাদিগকেও অনেক সময়ে দেখিতে পাই, 'অমুক আশ্রমের কূপের জল কেন আমার আশ্রমের কূপের জলের চেয়ে মিষ্টি হইল',—ইহা নিয়া ঈর্ষিত হইতে। ইহা সাক্ষাৎ কলিগ্রস্ততার সুস্পষ্ট লক্ষণ। তোমরা ঈর্ষ্যা-পাপ হইতে আত্মরক্ষা কর। সকলের প্রতিষ্ঠাতেই তুষ্টিবোধ করিও, সকলের উন্নতিতেই আনন্দিত হইও, সকলকেই আদৃত, প্রীণিত ও অভ্যুত্থিত দেখিয়া প্রাণে সুখানুভবে যত্নবান্ হইও। পরের সুখে যে সুখানুভব করে, জগতে তাহার মত সুখী কে? ঈর্ষ্যার বিষ কত মহাপ্রাণকে যে নিষ্প্রাণ করিয়াছে, তাহাতোমরা জান না। ঈর্ষ্যার পাপ কত শান্তিময় গৃহে যে অশান্তির দাবানল জ্বালিয়াছে, তোমরা জান না কিন্তু দেখিয়া শেখা আর শুনিয়া শেখাই ভাল, ঠেকিয়া শিখিতে যাইও না। অবিলম্বে অন্তরের ঈর্ষ্যা-সুলভতাকে প্রাণপণে বিনিষ্ট কর।"

ধ্যানভাব ও ভক্তিভাব লইয়া বিগ্রহ দর্শন

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বাঘাসুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যখনই অবসর পাইবে, বারংবার শুভ্রবর্ণ অখণ্ড-বিগ্রহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। যত বর্ণ দেখ, শুভ্রবর্ণের উপরে বর্ণ নাই। শুভ্রবর্ণ স্মরণ রাখিতে সহজ। যতবার অখণ্ড-বিগ্রহের প্রতি তাকাইবে, ততবার মনকে দুইটী বিশেষ ভাবে আবেশিত করিতে চেষ্টা পাইবে। একটী হইতেছে ধ্যানভাব, অপরটী হইতেছে ভক্তিভাব। এই পবিত্র বিগ্রহের নির্ম্মল রূপটী ইহার পরেও বহুক্ষণ তোমাকে স্মৃতিতে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, এই ভাব লইয়া যে দৃষ্টিনিক্ষেপ, ইহা ধ্যান-ভাব-মূলক। এই পবিত্র বিগ্রহের পায়ে আত্মসমর্পণই তোমার ইহাপরজীবনের পরম সংসিদ্ধি এবং নিজের আমিত্ব-বোধে, নিজ ভোগবুদ্ধিতে, নিজ সুখাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রীতিসম্পাদনের জন্যই জীবন ধারণ করিতেছ, এই ভাব লইয়া বিগ্রহের প্রতি যে দৃষ্টিনিক্ষেপ, তাহাই হইতেছে ভক্তি-ভাব-মূলক। মন্ত্র অনেকে নেয়, সাধন করে না। সাধন অনেকে করে, ধ্যানভাব আর ভক্তিভাবের অনুশীলন করে না। কিন্তু যাহারা ইহা করে, তাহারাই সদগুরুর চিহ্নিত সন্তান।"

স্বদেশ-সেবা ও সর্ব্বদেশ-সেবা

রংপুর জেলান্তর্গত কুণ্ডী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বদেশ-সেবা কর, কিন্তু সর্ব্বদেশের কথা ভুলিয়া যাইও না। স্বজন-সেবা কর, কিন্তু সর্ব্বজন-সেবাকে উপেক্ষা করিও না। স্বজাতি সেবা কর, কিন্তু সর্ব্বজাতি-সেবার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া। তোমার সেবা সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তোমার দৃষ্টি কেন সঙ্কীর্ণ হইবে? তোমার আহার, নিদ্রা, কর্ম্ম, বিশ্রাম, চেষ্টা, বিরতি, বিগ্রহ, সন্ধি সবই জগন্মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া হইবে।"

একদা আমি থাকিব না

জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একদা আমি থাকিব না। অর্থাৎ এই পার্থিব দেহ একদিন লয় পাইবে। সেই দিন কি আমার এই পার্থিব দেহ সম্পর্কে তোমাদের কোনও কর্ত্তব্য থাকিবে? এখনও তদ্রূপ বিবেচনা করিও। একটা মাটির খাঁচার মধ্যে আমাকে দেখিতেছ, কিন্তু এই অনিত্য খাঁচাটা নাই বলিয়াই জানিও। আমার পাদস্পর্শ অর্থহীন, আমার মূরতি দেখা অর্থহীন, আমার মুখের কথা শোনা অর্থহীন। আমার বিদেহী অন্তরকে স্পর্শ কর, আমার প্রকৃত স্বরূপকে লক্ষ্য কর, আমার অন্তরের

বাণীকে শ্রবণ কর। যাহা নিয়া আমি আনাদি অনন্ত, তাহা নিয়া আমার সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন কর। দেহ নিয়া যে সম্বন্ধ পাতাইতে চাহিতেছ, তাহা ত' বাবা অনিত্য। আমার চরণে পুষ্পচন্দন দিতে চাহিতেছ, কিন্তু এই চরণযুগল প্রাণের প্রয়াণে হয় মৃত্তিকার নীচে পোকায় খাইবে। নয় ভাগীরথীর সলিল-তলে পচিবে। নয় অগ্নিদহনে ভস্মীভূত হইবে। এই পুষ্প শুকাইবে, এই চন্দন গন্ধহীন হইবে। নিত্যের পূজা কর, জন্মজীবন সার্থক হইক।

"একদা আমি থাকিব না। হয়ত আমার মন্ত্র-শিষ্যও কেহ থাকিবে না। যাহারা থাকিবে, হয়ত তাহারা মন্ত্রে আস্থাহীন, অসাধক এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট; হয়ত তাহারা গুরুদ্রোহী, পরনিন্দক এবং আত্মাবমাননাকারী; হয়ত তাহারা অভয়-প্রতিষ্ঠায় ও অভয়দানে অক্ষম; হয়ত তাহারা ভীরু, কাপুরুষ এবং পরাপকারী; হয়ত তাহারা সঙ্কীর্ণ-চেতা, কৃপণ এবং জঘন্য স্বার্থপর; হয়ত তাহারা আদর্শদ্রোহী, আত্মদ্রোহী এবং ধর্ম্মদ্রোহী; হয়ত তাহারা দুর্ব্বলচেতা, ক্ষণচঞ্চল ও ষড়যন্ত্রপরায়ণ; হয়ত তাহারা বহুনিষ্ঠ, ভক্তিহীন ও ভজনহীন; হয়ত তাহারা কুকার্য্যে দল-গঠন-পটু, সৎকার্য্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং প্রতি কার্য্যে মূলউদ্দেশ্যের প্রতি অবিশ্বাসী বা আনুগত্যহীন। কিন্তু তথাপি আমি মরিব না। কি ভাবে বাঁচিয়া থাকিব জান? শিষ্য নহে, প্রশিষ্য নহে, শিষ্যানুশিষ্য নহে, একান্ত অজানা, একান্ত পর সিংহবীর্য্য সাধক কেহ

আমার পরিত্যক্ত পতাকা ধূলি ঝাড়িয়া মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া ধরিবে, গুরু-গৌরববোধবর্জ্জিত নিষ্কলুষ চিত্ত লইয়া উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে প্রতি জীবে পবিত্র ওঙ্কারের অমৃত-মন্ত্র বিলাইবে, মৃত আমাকে অমর করিবে।

"একদা আমি থাকিব না। প্রীতির নিলয় পুত্রকন্যাদের পার্থিব স্নেহের সকল বাঁধন সবলে ছিঁড়িয়া চলিয়া যাইব। চাহিয়া দেখিব না, কে হাসিল আর কে কাঁদিল। ভাবিয়া দেখিব না, কে দিল গালি, কে করিল স্তুতি। কলরব-মুখরিত রাজপথে শবের শোভাযাত্রা আমার কামনার বস্তু নহে। যেখানে কেহ দেখিল না, যেখানে কেহ জানিল না, যেখানে কেহ খুঁজিল না আর খুঁজিলেও শত খোঁজাখুজির পরে পাইল না, সেখানে এক বিল্বতলে বা শেফালী-রুদ্ধ বিবর তলে বা উর্ম্মিমালিনী তটিনীজলে বা শুভ্র শীতল তুষারতলে নিদ্রাহীন শ্রমক্লান্ত এই চিরকর্ম্ম পরায়ণ জীর্ণ দেহকে ঘুমের ভিতর দিয়া জাগরণের আস্বাদন পাওয়াইতে চাহি। প্রাণের গভীর গোপন সাধ মিটাইবার জন্য বিরল প্রান্তে মরিয়া যাইবার আগেই যদি দেহের গতি থামিয়া যায়, ভৌম শরীর ঢলিয়া পড়ে, তবে কি কামনা জান? যে দেখিল, শুধু সেই দেখিল, মাটি খুঁড়িয়া বা কাঠ জড় করিয়া সে-ই যাহা করিবার করিল, লোক ডাকিল না, সমারোহ করিল না, যে কাঁদিল, নীরবে কাঁদিল, যে হরিধ্বনি উচ্চারণ করিল, নিঃশব্দে

করিল। জগতের সকলের আপনার আপন হইয়াও নীরবে মরিতে কি যে অচিন্ত্য সুখ, তাহা বাবা তোমরা বুঝিবে না।

"একদা আমি থাকিব না। জগতের শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ অবদান-সমূহও লোভী পরস্বাপহারীদের পারস্পরিক মারামারি-কাটাকাটি-হানাহানিতে লোপ পাইবে। জগৎ প্রলয়-পয়োধি-জলে ডুবিয়া যাইবে। ঘন তিমির দশ দিক্ জুড়িয়া রাজত্ব করিবে। প্রাণী থাকিবে না। হৃৎস্পন্দন থাকিবে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কোথাও শুনা যাইবে না। কিন্তু প্রণব থাকিবেন। সেই ওঙ্কারের অবিরাম নিঃস্বন হইতে নূতন করিয়া জগৎ, শাস্ত্র ও সভ্যতার সৃষ্টি হইবে। নূতন করিয়া তপস্যা, সাধনা, যোগ ও আরাধনার প্রবর্ত্তন হইবে। কিন্তু সেদিনও অখণ্ড-সাধনার বিলোপ হইবে না। এই সাধনার ভিতর দিয়া সকল সাধনা আত্মপ্রকাশ করিবে। ওঙ্কারই জগতের জনক, শাস্ত্রের জনক, সভ্যতার জনক, সাধনার জনক, তত্ত্বের জনক, সত্যের জনক, অবিনশ্বর ধর্ম্মের জনক। কিন্তু তাঁহার কেহ জনক নাই। তিনি অনন্ত, নির্ব্বিকার ও নিরবধি।"

পত্রখানা করুণ, কিন্তু এই পত্র শ্রীশ্রীবাবামণি কাহার নিকটে লিখিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপি হইতে তাহা কীট-দংশন হেতু উদ্ধার করা যায় নাই।

কলিকাতা
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪১

তীর্থপর্য্যটনের উপকারিতা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—তীর্থপর্য্যটনের উপকারিতা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবদ্-ভাবিত মন নিয়ে তীর্থে গেলে ভজনের উদ্দীপন হয়।

তীর্থ কাহাকে বলে

প্রশ্ন।—তীর্থ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে স্থানের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভজন-সাধনের রতিবর্দ্ধক সংযোগ রয়েছে, তাকেই তীর্থ বলা যায়।

কোন্ তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

প্রশ্ন।—কোন্ তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ প্রশ্নের সর্ব্বজনীন কোনও উত্তর নেই। যার মন যে তীর্থে গেলে নিঃশেষে ভগবৎ-পাদপদ্মে ডুবে যায়, তার পক্ষে সেই তীর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একজন জৈন বৃন্দাবনে গেলে সে নিমগ্ন ভাবের আস্বাদন পান না, যা' তিনি পান পরেশনাথে বা পাওয়াপুরীতে। একজন বৌদ্ধ দ্বারকায় গেলে সে প্রশান্তি পান না, যা' তিনি

পান বুদ্ধগয়ায়, জেতবনে বা মূলগন্ধ কুটীতে। অথচ একজন বৈষ্ণবের কাছে শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য স্থান নেই। তাঁরা একে স্থান-মাত্র মনে করেন না, এমন কি নিত্যধাম ব'লেও গণনা করেন।

তীর্থে অবিশ্বাসীর কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—স্থান-বিশেষের প্রতি যাদের তীর্থত্ব-বোধ বা শ্রদ্ধা নেই, তারা কি কর্ব্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারা নিজ নিজ গৃহকেই তীর্থ জ্ঞান ক'রে গৃহের শুচিতা রক্ষার দিকে যত্ন দিয়ে সাধ্যমত ভজন-সাধন ক'রে যাবে। পিতাকে সাক্ষাৎ মহেশ্বর এবং মাতাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে প্রাতে সন্ধ্যায় প্রণাম কর্ব্বে এবং তাঁদের সেবাকে মুখ্য জ্ঞান ক'রে সংসারের কর্ত্তব্য অনাসক্ত ভাবে ক'রে যাবে। তীর্থে অবিশ্বাসী ব্যক্তির খামাখা অর্থব্যয় আর পথশ্রম স্বীকার ক'রে দূরদেশে যাতায়াত নিরর্থক।

মানুষ-পূজা

প্রশ্ন।—মাতাপিতাকে পূজা কত্তে গেলে যে, মানুষ-পূজা করা হ'ল?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হয় ত' হোক্, একটা ছাগল কিম্বা

গাধাকে পূজা কর্‌লেও যদি আমার প্রেম-ভক্তি বিকাশের কণা মাত্র গৌণ সহায়তা হয়, তাহ'লে আমি তাও কত্তে রাজি। দিবারাত্রি মোসাহেবী ক'রে ক'রে তুচ্ছ ঐহিক উন্নতির লালচে তোমরা ক্রূম মানুষের পূজা কর না, তাতে কিন্তু দোষ মনে কর না। পারমার্থিক কুশলকে লক্ষ্য ক'রে মানুষ-পূজা কর্ল্লে তাতে ভগবানেরই পূজা হয়।

পারমার্থিক কুশল কিসে

প্রশ্ন।—মানুষের পারমার্থিক কুশল কিসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের প্রতি অহেতুক, সর্ত্তচুক্তিহীন, প্রতিদান-বুদ্ধিবর্জ্জিত এবং বিনিময়-প্রত্যাশ-রহিত ভাবভক্তির উদ্দীপনে।

নূতন তীর্থের সৃষ্টি ও উদ্‌ঘাটন

প্রশ্ন।—অনেকে ত' বিজ্ঞাপনের জোরে নূতন নূতন তীর্থের সৃষ্টি কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সৃষ্টি ব'লো না, উদ্‌ঘাটন বল। যে স্থানে অতীতে কোনও মহনীয় ভগবদ্-ভাবের দিব্য-অনুভূতি বহু তপস্বীর অন্তরে অরুণোদয়-সঞ্চার করেছিল, আধুনিক কোনও তপস্বী সেখানে গিয়ে সেই প্রাচীন ভাবের স্পন্দন অনুভব ক'রে বুঝ্‌তে পারেন যে, এই স্থানের অজ্ঞাত ঐতিহ্য

ভজন-ভাবের উদ্দীপক এবং সাধন-ভজনের অনুকূল। এভাবে কোনো কোনো তীর্থ উদ্‌ঘাটিত হবেই। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেব গিয়ে উদ্‌ঘাটন কর্ল্লেন। গৌড়ীয় মঠ সম্পর্কিত আচার্য্যেরা মায়াপুর উদ্‌ঘাটন কর্ল্লেন। একে সৃষ্টি বা concoction বলা উচিত নয়। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তপস্যা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ এক নূতন তীর্থের সৃষ্টি কর্ল্লেন, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই সৃষ্টির সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জোরের কোনও সম্পর্ক নেই।

তীর্থের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে আশঙ্কা

প্রশ্ন।—তীর্থের সংখ্যা বাড়্‌তে বাড়্‌তে শেষটায় কি সমস্ত জগৎটাই একটা তীর্থ হ'য়ে দাঁড়াবে না? অমুক সাধু রেলের টিকিট কাট্‌তে গিয়ে হঠাৎ রাম-নাম জপ্‌তে জপ্‌তে বেলঘরিয়া ষ্টেশনে মারা গেলেন,—হ'ল সেখানে এক তীর্থ। অমুক সাধু কাক্‌নাড়া ষ্টেশনের কাছে এক গাছের নীচে ব'সে একদিন পাঁচ জন ভক্তকে নিয়ে হরিনাম গান করেছিলেন,—হ'ল সেখানে এক তীর্থ। আরেক জন সাধু শিবনলার বটগাছের নীচে তিন দিন মৌনী ছিলেন,—হ'ল আবার তৃতীয় এক তীর্থ। এভাবে তীর্থের সংখ্যা যে দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সকল স্থানই সকলের পক্ষে তীর্থ নয়। যে স্থান যার ভজন-মুখিনী বৃত্তির

সন্দীপনাকারক, তার পক্ষে সেই স্থানটীই মাত্র তীর্থ ব'লে গণ্য হবে। হাজার রুচির লোক হাজারটী বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ পূর্ব্ব-সংস্কারের অনুকূল ভাবে ভজনমুখী হবে। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত মশাই মক্কা গিয়ে তীর্থ কর্ব্বেন না, আর মূন্সী-হাটের মৌলভী সাহেবও শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে তীর্থ কর্ব্বেন না। যার যার তীর্থ-পর্য্যটনের তালিকা নিজ নিজ সাধন-ভজনের গতি ও প্রকৃতি দেখেই তৈরী হবে। আর সমগ্র জগৎই যদি তীর্থ হ'য়ে যায়, তবে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কি আছে? সহস্র বৎসর পাপপূর্ণ রাজ্যে সুখে বাস করার চাইতে একটী মাত্র প্রহরও যদি পরম দুঃখের ভিতরে পবিত্র ভাবে তীর্থে বাস করা যায়, তাহ'লে তাও অধিকতর শ্লাঘ্য।

বহুতীর্থের লোপসাধন ও একটী মাত্র তীর্থ স্থাপন

প্রশ্ন।—তীর্থ যদি রাখতেই হয়, তবে মাত্র এমন একটী তীর্থকেই থাকতে দেওয়া উচিত, যাতে সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রয়োজন মিটে। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক তীর্থগুলির অস্তিত্ব না লুপ্ত হ'লে জগতে ভেদ-বিচ্ছেদ আর কমবে না

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সেটী বাছা একটী অসম্ভব রকমের আবদার। ধর্ম্ম থাক্‌লেই সেই ধর্ম্মের অনুসরণকারীদের

ভজনমুখিনী উদ্দীপনা পরিবর্দ্ধনের জন্য স্বভাবতঃ কতকগুলি নির্দ্দিষ্টস্থান তাদের তীর্থ ব'লে গণ্য হবে। প্রথমতঃ হয় ত' "তীর্থ" এই নামটী দেওয়া হবে না, কিন্তু এক ধর্ম্মাবলম্বী সকলের বা অধিকাংশের আধ্যাত্মিক রুচিতে প্রিয় এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে সুন্দর ব'লে প্রতিভাত হ'তে হ'তে সেই স্থানটী আপনি এক পরমতীর্থে পরিণত হবে। সুতরাং জগতে যদি শত শত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ থাকে, তাহ'লে তীর্থও শত শতই থাক্‌বে। শত শত কেন, সহস্র সহস্র থাক্‌বে। খ্রীষ্টানের কাছে যীশুর জন্মস্থানও তীর্থ, মৃত্যুর স্থানও তীর্থ। যদি তাঁর তপস্যার স্থানগুলি কেউ খুঁজে বের কত্তে কোনো দিন পারে, তবে সেগুলিও তীর্থ হবে। বৌদ্ধদের কাছে কপিলাবস্তু থেকে সুরু ক'রে কুশীনগর পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের নরলীলার যাবতীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থান মাত্রেই তীর্থ। গৌরাঙ্গ-ভক্তদের নিকট নবদ্বীপও তীর্থ, শত শত পল্লীগ্রামও তীর্থ, নীলাচলও তীর্থ, অর্থাৎ জন্মস্থানও তীর্থ, নানা লীলা প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত প্রত্যেকটী কর্ম্মস্থানও তীর্থ, আবার অপ্রকট-লীলা অভিনয়ের স্থানও তীর্থ। শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে একবার যে-কোনও উপলক্ষ্যে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, স্থানটী খুঁজে বের কত্তে পারামাত্র সে স্থানকে তীর্থের মর্য্যাদা সঙ্গে সঙ্গে দান কত্তে গৌর-ভক্তেরা তৎপর হয়েছেন। কোনও ধর্ম্মপথাবলম্বীর হয়ত তীর্থবোধের ব্যাপ্তি কম, কারো বা

বেশী, কিন্তু যত মতী, আর যত পথী, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ তীর্থের প্রয়োজন আছে। যাকে দিয়ে লোকের প্রয়োজন আছে, তাকে ধ্বংস করা যায় না।

তীর্থের পাণ্ডার কর্ত্তব্য ও দৌরাত্ম্য

প্রশ্ন।—কিন্তু মশাই, তীর্থের পাণ্ডাগুলির অস্তিত্বের কোনও যুক্তি দেখি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ কথা অধিকাংশ স্থলেই সত্য। আজকাল পাণ্ডারা যাত্রী ধ'রে কৌশলে বা দস্যুতার বলে টাকা আদায়ের ফন্দীকেই নিজেদের জীবিকা ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু পাণ্ডার কর্ত্তব্য অতীব মহৎ। একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাইরের যাত্রীরা এসে কত প্রকারে ভগবদ্‌ভাবের উদ্দীপনা পেয়ে যেতে পারে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখাই পাণ্ডার প্রকৃত কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য আধ্যাত্মিক এবং এই কর্ত্তব্য যে পাণ্ডা সরল মনে পবিত্র দায়িত্ব-বোধে পালন করেন, তিনি যাত্রীর পক্ষে গুরুস্থানীয়। কিন্তু পাণ্ডাদের একটা দৈশিক বা geographical কর্ত্তব্যও রয়েছে। বিদেশী লোক্, পথ চেনে না, ঘাট জানে না, কোন্ স্থানে কোন্ আপদ আছে, তার খোঁজখবর রাখে না, কোথায় পথ ভুলিয়ে নিয়ে তারপরে বুকে ছোরা বিঁধিয়ে টাকা আদায়ের জন্য ষড়যন্ত্রপর দস্যুরা

অপেক্ষা কচ্ছে, এসব কোনও কথাই জানতে পারে না, তাদের পক্ষে বিপদে আপদে সহায়, রক্ষক ও পরামর্শদাতাও প্রয়োজন। যে পাণ্ডা এ সব কর্ত্তব্য পালন করেন, তিনি গুরুর তুল্য না হ'লেও মিত্র যে তাতে সন্দেহ নেই, তিনি পরপারের হিতকারী না হ'লেও ইহকালের হিতকারী ত' নিশ্চিতই। কিন্তু যে সব পাণ্ডা এই দুই জাতীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে একটীও করেন না পরন্তু অর্থের লালচে যাত্রীদের উপর উৎপীড়ন, অপহরণ বা দস্যুতা করেন, তাদের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করার ভাষা আমার জানা নেই।

বর্ত্তমান পাণ্ডাদের পূর্ব্বপুরুষগণ

প্রশ্নকর্ত্তা।—পাণ্ডাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরাই ধর্ম্ম-বেচা ব্যবসা ক'রে বংশানুক্রমে টাকা রুজি করার জন্য তীর্থগুলি সব রচনা করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্থলবিশেষে তোমার এ অনুমান হয়ত সত্য। যাঁর যাতে স্বার্থ আছে, তিনি যে তা' করেন নি, এ কথা বলা চলে না। কিন্তু সব তীর্থই পাণ্ডাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রচনা করেন নি। আজ যে তীর্থে বিনা আয়াসে রেলে চ'ড়ে যাও, শত শত বর্ষ ধ'রে সে সব স্থানে যাবার পথ ছিল দুর্গম, অরণ্যসঙ্কুল, দস্যু-ভয়যুক্ত এবং বিপজ্জনক। সে সময়ে মানুষ প্রাণের ধর্ম্মবোধের দায়ে প'ড়ে তীর্থ কত্তে যেত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে একেবারে চিরবিদায় নিয়ে

এবং তখন একদল পরহিতৈষী ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই সব যাত্রীদের বিপদ-আপদে নানা সাহায্য কত্তেন। আজকালকার অনেক পাণ্ডা এসব মহাপ্রাণ পুরুষেরই বংশধর।

পাণ্ডার অত্যাচার দমনের পন্থা

প্রশ্নকর্ত্তা।—তীর্থের পাণ্ডাদের অত্যাচার বিদূরণের জন্য কি কোনও চেষ্টা করা উচিত নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তীর্থে যেখানে অত্যাচার আছে, সেখানে তার প্রতীকার-চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু যে ধর্ম্মাবলম্বীর তীর্থ, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদেরই এই বিষয়ে প্রথমে অগ্রণী হ'তে হবে। কাশী-বিশ্বনাথের মন্দিরের ব্যাপারে সংস্কার সাধ্‌তে হ'লে দাক্ষিণাত্যের রামানুজ-পন্থী শ্রীবৈষ্ণবদের এনে জড় করায় লাভ নেই। কামরূপের যোনি-পীঠের পূজকদের এনে বৃন্দাবনের অত্যাচার দূর করান কঠিন হবে। কালীঘাটের অত্যাচার নিবারণের জন্য কালীমাতাতে বিশ্বাসী লোকেরা অগ্রণী না হ'য়ে যদি অগ্রণী হন কালীমাতাতে অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম-সমাজের লোক, তবে তাও খুব কম ফলপ্রদই হবে। বৈষ্ণব দ্বারা বৈষ্ণব-তীর্থের, শাক্ত এনে শাক্ত-তীর্থের, হিন্দু-দ্বারা হিন্দু-তীর্থের, মুসলমান দ্বারা মুসলমান-তীর্থের পাণ্ডা-দমন সঙ্গত। তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্ঘবদ্ধতা, সতর্কতা, দৃঢ়তা এবং সংস্কারকদের অকুতোভয় প্রয়াস উভয়ই এস্থলে প্রয়োজনীয়।

নূতন পাণ্ডা-গোষ্ঠীর সৃষ্টি-প্রতিরোধ

প্রশ্নকর্ত্তা।—নূতন নূতন তীর্থের উদ্ভব ঘট্‌লে যাতে তাতে আবার পাণ্ডা-প্রথার নূতন সৃষ্টি না হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চিতই প্রয়োজন। তবে তীর্থ থাক্‌লেই মন্দির থাকে, মন্দির থাক্‌লেই তার পূজক বা সেবাইত থাকে, সেবাইত থাক্‌লেই তার আবার একটী উদর থাকে। ফলে 'দেহি' 'দেহি' রব বন্ধ হবে কি ক'রে? পাণ্ডাদের তুলে দিতে চাও ত' ভিক্ষুক থাক্‌বে। কেউ না কেউ থাক্‌বেই। তাই তীর্থযাত্রীর উচিত এসব বাহ্য অত্যাচারের দিকে সহানুভূতি বা বিরক্তি কিছুই পোষণ না ক'রে তীর্থ থেকে নিজের ভজনমুখিনী বৃত্তির উৎকর্ষটুকু সাধন ক'রে নেওয়া। তীর্থগুরুরূপে পাণ্ডা না থাকুক, অন্ততঃ guide বা পথপ্রদর্শক হিসাবেও পাণ্ডা বা তজ্জাতীয় লোকের অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয়।

তীর্থবাসকালীন কর্ত্তব্য

প্রশ্নকর্ত্তা।—তীর্থবাস-কালে তীর্থ-যাত্রীর কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সত্যবাক্য, সরলতা, নিষ্কাম মনোভাব, নিরভিমানতা, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চায় অবহেলা, সুখলিপ্সা দমন, হরিনাম-কীর্ত্তন, অবিরাম নামজপ এবং ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হ'য়ে

ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।—এগুলিই হচ্ছে তীর্থবাস-কালীন কর্ত্তব্য। যাঁরা দীর্ঘকাল তীর্থে বাস কর্ব্বেন, তাঁদের দৈনিক সৎসঙ্গ ও স্বাধ্যায়-সেবা নিয়ম ক'রে করা উচিত।

সাধকের সেবা ও সিদ্ধের সেবা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎসেবা দ্বিবিধ। সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধরূপে সেবা। সাধকের সেবায় লালসাময়ী প্রার্থনা থাকে, সিদ্ধের সেবায় ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য কোনও অভিলাষের ছন্দাংশমাত্রও থাকে না। সাধকের ভগবৎ সেবা, আত্মমুখী, অর্থাৎ নিজের কুশল, নিজের উন্নতি, নিজের মুক্তি এই সবের দিকে তাকিয়ে জীব তাঁর সাধক অবস্থায় ভগবৎ-সেবা, ভগবৎ-পূজা, ভগবৎ-স্মরণ, ভগবন্মনন, ভগবদারাধন প্রভৃতি করেন। কিন্তু সিদ্ধের সেবা ইষ্টমুখী অর্থাৎ নিজের কুশল, নিজের তৃপ্তি, নিজের উন্নতি নিজের উদ্ধার এসব তাঁর ভগবৎ-সেবার প্রণোদক নয়, একমাত্র ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনই তাঁর যাবতীয় সাধন, ভজন, স্মরণ, মনন, সেবন ও আরাধনের লক্ষ্য। সাধক ভগবানের সেবা করেন অভাবে, সিদ্ধ করেন স্বভাবে।

ভোগ-ত্যাগের উর্দ্ধে যাও

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—তোমাদের যত ভোগ আর ত্যাগ সবই জড়কে নিয়ে। তাই এ ভোগেরও প্রতিক্রিয়া আছে, এ ত্যাগেরও প্রতিক্রিয়া আছে। যার প্রতিক্রিয়া আছে, কোনো না কোনো প্রকারে সে-ই তোমাকে ব্যথা দেবে। ভোগের বাসনাও ত্যাগ কর, ত্যাগের বাসনাও ত্যাগ কর, ভোগ-ত্যাগের উর্দ্ধে যাও। কিন্তু তার একমাত্র পন্থা হচ্ছে নিজেকে জগতে অনাথ, নিরাশ্রয়, একক, নিঃসঙ্গ এবং সর্ব্বজনপরিত্যক্ত জেনে অনন্যশরণ হ'য়ে শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয়।

বিগ্রহ-পূজার নিয়ম

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানের বিগ্রহ-পূজার নিয়ম কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নির্দ্দিষ্ট বিগ্রহটী ভগবানের যেই নির্দ্দিষ্ট নামের উদ্বোধক বা স্মারক, সেই নামকে নিঃশব্দে জপ করা এবং সেই নামের সন্দীপক কীর্ত্তন করা।

ভগবদ্ভক্তগণের সেবার নিয়ম

প্রশ্নকর্ত্তা।—ভগবদ্ভক্তগণের সেবার নিয়ম কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবান্নাম-কীর্ত্তনের যোগেই ভগবদ্-ভক্তগণের সেবা বিধেয়। ভগবদ্-ভক্তের সংসর্গ পেলে তাঁকে নিয়ে উপাসনা, জপ, কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে তাঁর আত্মার

যে শীতলতা সম্পাদিত হয়, অন্য কিছুতেই তা হ'তে পারে না। যিনি ভগবৎ-প্রিয়, ভগবৎ কথানুকীর্ত্তন তাঁর অন্তরে যে সুখ প্রদান কত্তে সমর্থ হবে, জগতে অন্যতর কোনও কার্য্যের দ্বারাই তা' সম্ভব নয়। ভক্তসেবায় ভগবৎ-প্রীতি বাড়বে, আর ভগবৎ-সেবায় ভক্তজনের পরম সন্তোষ উপজাত হবে। কোন্ দেবতার কে ভক্ত, সাকার বা নিরাকারের সাধক, এসব জানবার দরকার নাই। ভক্ত দর্শনমাত্র অন্তরে নিজ পরমেষ্ট-প্রীতি উদ্দীপিত হ'লে জান্‌বে তুমি ভক্তকে সত্যই সেবা দিতে পেরেছ।

ভগবৎ-কথার বিস্তৃতির উপায়

প্রশ্নকর্ত্তা।—ভগবৎ-কথার বিস্তৃতির উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবন্নামকীর্ত্তন এবং ভগবদুপাসনা, এর দ্বারাই ভগবৎ-কথার বিস্তৃতি ঘট্‌বে। স্বাধ্যায়কে তার অনুকূলে গ্রহণ কত্তে হবে। কীর্ত্তন ও উপাসনাকে জগন্মঙ্গলের পরম সাধন ব'লে জান্‌বে। এতে কেবল তোমার কুশল নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীরই এতে কুশল। সকলের কুশলকে লক্ষ্যে রেখে একাজ কর্ব্বে। নিজেকে, নিজের স্বার্থচিন্তাকে অতলে ডুবিয়ে দিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে একাজ কর্ব্বে। তবেই ভগবৎ-কথার বিপুল বিস্তার হবে। তোমার জীবনে ভগবৎ-প্রেম জাগ্‌লে সেই প্রেমের পরশেই ভগবৎকথার প্রসার ঘট্‌বে। লোকাচার, বক্তৃতা, ব্যাখ্যান—সবই গৌণ জান্‌বে।

ভগবৎ-সান্নিধ্যে বাসের উপায়

প্রশ্নকর্ত্তা।—নিত্য ভগবদ্-সান্নিধ্যে অবস্থানের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার উপায় নিত্য নামকীর্ত্তন করা, নিত্য নামজপ করা, নিত্য উপাসনা করা, নিত্য সৎসঙ্গ করা, নিত্য স্বাধ্যায় করা।

নামাশ্রয়ের লক্ষণ

প্রশ্নকর্ত্তা।—ভগবানের নামাশ্রয়ের লক্ষণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিজের আভ্যন্তর চেতনার ভিতরেও নামকে অবিচ্ছেদ যোগে যুক্ত ক'রে রাখাই হচ্ছে, নামাশ্রয়ের লক্ষণ। ঘুমিয়ে যদি পড়ি, তবু ভগবানের নাম ভুলি না, পাগল যদি হ'য়ে যাই, তবু ভগবানের নাম ভুলি না,—এমন অবস্থায় এলে বুঝা যাবে, সত্যি নামাশ্রয় হয়েছে। কীর্ত্তন ক'রে খুব চেঁচালাম যাতে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ হয়, খুব লাফালাফি কর্ল্লাম যাতে আঙ্গিনায় মাটি ভরাট কত্তে হয়, খুব বিরহাশ্রু বিসর্জ্জন কর্ল্লাম যাতে কালই সব কাপড়চোপড় ধোপার বাড়ী দিতে হবে,—এর নাম নামাশ্রয় নয়। সারা অন্তর জুড়ে অবিরাম আর্ত্তনাদ উঠ্‌ছে,—'কৈ হে নামের নামী, আত্মপ্রকাশ কর, স্বরূপ-দর্শন করাও'"—এর নাম নামাশ্রয়। হৃদয়ের পরতে পরতে শুধু নামটাই হ'ল লেখা, প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শুধু নামেরই উঠ্‌ল ঝঙ্কার, নাম-ছাড়া

অন্য স্মৃতির চিত্তে হবে না উদ্দীপন, এই অবস্থার নাম নামাশ্রয়। নামাশ্রয় যে করে, তার দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান চিরতরে দূরে চ'লে যায়। নামাশ্রয় যার সফল হয়, সে বিশ্বে সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে একমাত্র নামই দেখে, সকল ধ্বনিতে একমাত্র নামই শোনে, সর্ব্বজীবে নামীর অস্তিত্ব অনুভব করে।

বহু-দেববাদের উৎপত্তির কারণ

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—আমরা যে, সহস্র সহস্র দেবতার পূজা করি, তার কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ ভগবানের সেবাকে তোমরা নিজের প্রয়োজন ব'লে না বুঝেছ, ততক্ষণ ত' আর ভগবদাশ্রয় কর না! কিন্তু সেই প্রয়োজন-বোধ ত' নিতান্ত পার্থিব স্তরের এবং অনুচ্চ ধরণের। একটা দুরারোগ্য রোগ হয়েছে, তখন ভাব, অমুক দেবতাকে ডাক্‌লে বুঝি রোগ সার্‌বে। এক এক দেবতা এক এক রোগ সারান, এক এক দেবতা এক এক ধরণের বিপদ থেকে রক্ষা করেন, অতএব এক এক প্রকারের অবস্থায় প'ড়ে তোমরা এক এক দেবতার শরণাপন্ন হও, পূজা দাও, বলি দাও, ভোগ-রাগ-আরতির ব্যবস্থা কর। কিন্তু ভগবদাশ্রয় যে তোমার স্বভাব-ধর্ম্ম, ভগবদানুগ্য যে তোমার সহজ স্বাভাব, একথা জান্‌লে আর নিজের প্রয়োজনে তাঁকে ডাকার কথা ওঠে না। তখন তুমি

আপন স্বভাবে ডাক, ডাক্‌তে ভাল লাগে ব'লেই ডাক, না ডেকে পার না ব'লেই ডাক। সুতরাং তখন পরম-প্রেম-দয়িত পরমেশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং অপ্রতিম, তুমি তোমার স্বার্থের দায়েই অদ্বিতীয়কে বহু করেছ। যখন তুমি স্বার্থের উর্দ্ধে, তখন তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, ছিলেন না, হবেন না তখন আর বহু দেবতার প্রয়োজন পড়ে না।

ঈশ্বর-ভজনকারীর লক্ষণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ঈশ্বর ভজনকারীর লক্ষণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভজনকারীর চোখ বড় সুন্দর। তিনি যাকে দেখেন, তাকেই ভজনকারী ব'লে জ্ঞান করেন। মদ খেয়ে মাতালের চোখ হয়েছে রাঙ্গা, তিনি ভাবেন, এই প্রেমিক পুরুষ সারারাত জেগে ভগবানের ভজন, কীর্ত্তন, উপাসনা বুঝি করেছেন। ধরা পড়ার ভয়ে চোর যাচ্ছে প্রাণপণে পালিয়ে, তিনি দেখেন যেন ঈশ্বর-ভজনের সময় পেরিয়ে যায় দেখে অকৃত্রিম ভজনকারী স্বস্থানে দৌড়ে যাচ্ছেন। কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ, তিনি ভাবেন,—'ভগবানের রাজ্যে একটী জীবও ভজন-বিহীন নন।' প্রহরে প্রহরে শেয়ালের দল যূথবদ্ধ হ'য়ে ডাকে "হুক্কাহুয়া", তিনি ভাবেন পরমভাগবত কীর্ত্তন-রসিকেরা শৃগালের ছদ্মবেশে এসে ভগবদ্‌-ভজন কচ্ছেন। আমগাছ, নিমগাছ, তালগাছ, খেজুরগাছ কেউ তাঁর দৃষ্টিতে নিরর্থক-জীবন-যাপনকারী নয়, সবাই ভগবৎসাধক ভগবদ্‌ভজক পুণ্যপুরুষ।

কলিকাতা
৫ই ভাদ্র, ১৩৪১

প্রচার্য্য কি

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আমাদের প্রচার্য্য বিষয় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্ সর্ব্বজীবের পিতা, মাতা, পতি এবং প্রভূ, ভগবানের সঙ্গে আমাদের ইহাই প্রকৃত সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের পরিচয় লাভই জ্ঞান। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তাঁর সন্তানদের কুশল-কল্পে আত্মসুখলোভহীন সেবা বিতরণই আমাদের পালনীয় ব্রত এবং সকল ঐহিক কর্ত্তব্যকে তাঁর চরণসেবার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত রেখে পালন করাই মায়ামোহের মরীচিকা থেকে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ।—সর্ব্বজীবের নিকটে এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রচার্য্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকারভেদে এরূপও বলা যায় যে, তুমি এবং পরমেশ্বর এক এবং অভিন্ন, তোমাতে ও তাঁতে কোনো ভেদ নেই,—এই যে অভেদ সম্বন্ধ, তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই জ্ঞান। এই জ্ঞনে প্রদীপ্ত হ'য়ে নিখিল সৃষ্টির আদ্যন্তহীন বৈচিত্র্যের প্রতিটি বিকাশের মধ্যে নিজেকে প্রত্যক্ষ ক'রে যার যেখানে যেটুকু অভাব, তার সেটুকু দূর ক'রে দেওয়াই যে জীবনের পরম ব্রত, এই কথাটী সর্ব্বত্র প্রকাশ ক'রে ধরাই আমাদের কর্ত্তব্য। জীবন্ত জাগ্রত প্রাণীর স্পর্শে নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীনের অন্তরে এই তত্ত্বকে উজ্জীবিত

করা চাই, এইটীই জগতে একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। অন্য বিষয়ে বাক্যালাপ বৃথা আয়ুক্ষয় মাত্র।

আচরণীয় কি

প্রশ্ন।—আমাদের আচরণীয় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সত্যবাক্, হিতবাক্ এবং মিতবাক্। হিতাহার, মিতাহার এবং মেধ্যাহার। সত্যশীলের, সাধনশীলের ও ভজনশীলের সঙ্গ। আত্মনিন্দা, পরনিন্দা; ও গুরুনিন্দা ত্যাগ। দেহ-পতনের পরে কি হবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ এবং সংসারের অনিত্যতা স্মরণের সাথে সাথে অহর্নিশ নিত্য শাশ্বত সনাতন পরমপ্রভুর ঐকান্তিকী সেবা।

দানের বস্তু কি

প্রশ্ন।—আমাদের দানের বস্তু কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সর্ব্বজাতিতে সর্ব্ববর্ণে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে পবিত্র প্রণব-মন্ত্র সাধনার অধিকার দান আমাদের কর্ত্তব্য। সেই অধিকারে নিঃসঙ্কোচ অভয় প্রদান হউক আমাদের ব্রত। সেই সাধনায় রুচি সৃষ্টি করা হউক আমাদের সবচেয়ে বড় দান।

গ্রহণীয় কি

প্রশ্ন।—আমাদের গ্রহণের বস্তু কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—"নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, সাধনরত, লোকহিতব্রত, অনলস জীবন-যাপন কর্ব্ব", প্রত্যেকের কাছ থেকে এই বিষয়ে সরল, অকপট, অকৃত্রিম প্রতিশ্রুতিই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়।

কলিকাতা
৬ই ভাদ্র, ১৩৪১

ধর্ম্ম অনুশীলনের বস্তু

একজন বলিলেন যে, বৈষ্ণবদের ধর্ম্ম খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মের অনুকরণ ব'লে কোনো কোনো খ্রীষ্টান প্রচারক ব'লে থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বল্লে বাছা ক্ষতি কি? যে যে যার যার ধর্ম্মে একনিষ্ঠ-প্রযত্নে লেগে থাকাই বড় কথা, কার ধর্ম্ম কার ধর্ম্মের অনুকরণ, সে কথা নিয়ে "লেক্‌চার" ঝাড়লেই তাতে কোনো ফল হবে না, যার অনুশীলনে তোমার সর্ব্বপাপের ক্ষয় হয়, সর্ব্বদুঃখের নাশ হয়। সর্ব্ব অপূর্ণতার পূরণ হয় এবং তুমি পরমসত্যের সাক্ষাৎকার পেয়ে মানবজীবন সার্থক কর,—তাই হচ্ছে তোমার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অনুশীলনের বস্তু, পরধর্ম্মের সাথে তুলনীয় বস্তু নয়।

ভারতের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে যদি ধর্ম্মবিষয়ে ঋণ বা অনুকরণের প্রসঙ্গ তোলই, তাহ'লে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে

অনেককেই এই হিন্দুদের কাছে আস্‌তে হবে। খ্রীষ্টের জন্মের একুশ বছর আগে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ এথেন্সে জীয়ন্তে অনল-প্রবেশ করেছিলেন ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন একজন নিদারুণ নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যে গ্রীসের লোকের কাছে তাঁর ধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন নি, এরূপ কথা মনে করার কারণ নেই। আর, একজনকে জীয়ন্তে মৃত্যুবরণ কত্তে দেখে, এ অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না যে, তিনি ছাড়া আরো দু-দশজন বৌদ্ধধর্ম্মের বাণী নিয়ে সেদেশে গিয়েছিলেন। এর ফলে পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্টধর্ম্মের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব গিয়ে পৌছেনি, এ কথা মনে করা শক্ত। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা রকম-ফের মাত্র,—বুদ্ধ হিন্দুর সন্তান, বৌদ্ধের উপদেশ হিন্দুর শাস্ত্র থেকেই গৃহীত, বুদ্ধের পথ হিন্দুদেরই যুগের পথ, মাত্র মত পৃথক্, কিন্তু তারও জীবাঙ্কুর হিন্দুর কাছ থেকেই নেওয়া,—হিন্দুর দেশেই তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর শ্রোতারা সকলে হিন্দুর সন্তান। এই কারণে, কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হয়েছে বল্‌লে, প্রকারান্তরে হিন্দুর ধর্ম্মই প্রসারিত হয়েছে বল্‌তে হয়। কেউ ভগবান বুদ্ধের কাছে ঋণী, একথা বললে প্রকারান্তরে হিন্দুর কাছেই ঋণী বলা হয়। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া বন্দরের বিশ্ব চিন্তার সমারোহের ভিতরে ব'সে পাশ্চাত্য জগৎ হিন্দুর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং সেটা বেমালুম গায়েব ক'রে দেওয়াও সম্ভব হয় নি। প্লাটিনাসের Pantheism (অদ্বৈতবাদ) এবং

অন্তরের সঙ্গে রহস্যময় ঐক্যস্থাপন সুস্পষ্টরূপে হিন্দুর বেদান্ত আর যোগদর্শনের রসে টুসটুস্ কচ্ছে। সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্র পরায়ণ তপশ্চর্য্যার নিদারুণ ঝোঁক, যা' সেণ্ট এণ্টনির মত হাজার হাজার সাধুকে নিয়ে লীবিয়ার মরুভূমিতে ঠেলে দিল, সেণ্ট সাইমন ষ্টাইলাইট্সের মত অসংখ্য জনকে আত্মপীড়নমূলক অকল্পনীয় কঠোরতায় রত ক'রে দিল, তা' ত' এই ভারতের যোগীদের কাছ থেকে সোজাসুজি পাওয়া জিনিষ! স্মৃতিচিহ্নের পূজা, মালাজপা, ধর্ম্ম-প্রচারকের চিরকৌমার্য্য এবং সাংসারিক সম্পর্কচ্ছেদ, মহাপুরুষ-পূজা, উপবাস, ডান হাত তুলে আশীর্ব্বাদের প্রথা প্রভৃতি ত' এঁরা এদেশ থেকে নিয়েছেন।

নামের বলে ভগবৎ-প্রেম-সঞ্চার

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎ-প্রেম বর্দ্ধনের প্রধান উপায় হচ্ছে, অবিরাম অবিশ্রাম ভগবন্নাম স্মরণ; নামের স্মরণ-মননের দ্বারা ভগবৎ-প্রেমের দিব্য উৎস খুলে যায়। নামে রত হওয়া আর প্রেমে মত্ত হওয়া প্রায় এক কথা ব'লে জান্‌বে। নামের মহিমা অপরাজেয়, নামের শক্তি অমোঘ। নাম কত্তে কত্তে প্রেমের উদয় হবেই হবে। একদিনে না হয়, দু'দিনে না হয়, নাম ছেড়ে দিও না। শত কোটি শতাব্দী জুড়ে তুমি নাম ক'রে যাবে, প্রেমফল লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নাম ছাড়্‌বে না, এই নিদারুণ পণ নিয়ে নাম কত্তে থাক্‌বে। তোমার নাম-

সেবন লোক দেখাবার জন্য নয়, পরন্তু প্রাণ মজাবার জন্যে,—এই কথা অনুক্ষণ স্মরণ রাখ্‌বে।

ভক্তের স্মরণে ভক্তি-সঞ্চার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎ-প্রেম-সঞ্চারের অপর উপায়, ভগবৎ-প্রেমিক মহাপুরুষদের দিব্য চরিত্র প্রশংসমান চিত্তে পুনঃ পুনঃ আলোচনা। নানা সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তিতায় নানা মহাপুরুষের নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সেই সকল বিভেদ-বৈচিত্র্য নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। খ্রীষ্টান ভক্তও ভক্ত, মুস্‌লিম ভক্তও ভক্ত, বৈষ্ণব ভক্তও ভক্ত। ভক্ত-চরিত্র মাত্রেই তোমার আদরণীয়, কে খ্রীষ্টান, কে মুস্‌লিম, কে বৈষ্ণব, সেটা তোমার কাছে বড় কথা নয়। সাম্প্রদায়িক দেওয়ালের উর্দ্ধেও মাথা তুলে তাঁদের যে ভক্তিনতকন্ধর প্রেমময় মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে, শ্রদ্ধার সহিত, বিনয়ের সহিত সেই মূর্ত্তির দিব্যপ্রভা দর্শন ক'রে, 'তাঁদের ভগবৎ-প্রেম আমারও অন্তরে পরিস্ফূর্ত্ত হউক',— অনিবার এই প্রার্থনা কর।

নেতা ও সহকর্ম্মী

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি নানাস্থানে যে সকল পত্র লিখিলেন, তাহার কতিপয় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কোলসুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এরূপ নেতা এই মাটীর জগতে প্রত্যাশা করা উচিত নহে, যাঁহার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দুইটা বা একটাও দোষ থাকিবে না। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং ত্রুটিহীন সহকর্ম্মীও এই জগতে কল্পনা করা চলে না। এই কারণে সহকর্ম্মীদিগকে নেতার এবং নেতাকে সহকর্ম্মীদের দুই চরিটা দোষত্রুটী উপেক্ষা করিয়াই সহযোগ দিতে হইবে। যেখানে সহকর্ম্মীরা পদে পদে নেতার দোষ-ত্রুটী অনুসন্ধান করিবে, সেখানে নেতার নেতৃত্ব ত্যাগ করা প্রয়োজন। যেখানে নেতা সহকর্ম্মীদের দোষগুলিকে উপেক্ষা করিয়া গুণগুলিকে মূল লক্ষ্যের সাধন-কল্পে প্রয়োগ করিতে অপারগ, সেখানে সহকর্ম্মীদের সরিয়া পড়া স্বাভাবিক। এই সকল বাস্তব সত্যের দিকে তাকাইয়া তোমরা তোমাদের প্রতিষ্ঠান গড়িও এবং চালাইও। সোণার মানুষই তোমাদের আদর্শ হউক, কিন্তু সোণার মানুষ এজগতে অতীব দুর্ল্লভ, প্রায় সকলেই দোষে-গুণে গড়া মাটির মানুষ।"

সেবক হইবার মানে

হুগলী খয়রাবাজার-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেকে সেবক বা সেবিকা বলিয়া অভিমান করিলেই সেবা হয় না বাছা, স্বার্থের দিক্ হইতে দৃষ্টি গুটাইয়া

আনিতে হয়। নিজের মান-সম্মানবোধকে যে খর্ব্বিত করিতে পারিবে না, নিজের জিদ যে পরিহার করিবে না, নিজের গোঁ ধরিয়া যে চলিবে, সে কর্ম্মী হইতে পারে, কর্ম্মবীর হইতে পারে, বক্তা হইতে পারে, পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু সেবক হইতে পারে না। সেবক হওয়ার মানেই হইতেছে, সেব্যের চরণে নিজের ব্যক্তিত্বাভিমানকে বিসর্জ্জন দেওয়া। ছোট বড় কত সেবা-কার্য্যই ত' বাছা করিতেছ কিন্তু অন্তরকে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ যে, তোমার আদর্শের পায়ে তুমি কতখানি আত্মসমর্পণকারী? ইহার সন্ধান লও, ইহার হিসাব কর। তাহাতে কুশল হইবে।"

সধবার সংসার-ত্যাগ

ঢাকা জেলান্তর্গত পল্লীগ্রাম-নিবাসিনী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অন্তর তোমার সংসার ছাড়িবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে ত'? কিন্তু যাইবে কোথায় মা? যেখানে যাইবে, সেখানেই সংসার পিছু পিছু ধাওয়া করিবে। সংসারের অসহ্য আওতা হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ফাঁকা প্রান্তরে গিয়া কুঁড়ে বাঁধ, দেখিবে, দেখিতে না দেখিতে চতুর্দ্দিকে আত্মরক্ষণের দেওয়াল মাথা গজাইয়া উঠিবে, আম্র, বিল্ব, নিম্ব, পলাশ, অর্জ্জুন, পিয়াল, দাড়িম্ব বৃক্ষের দল ছায়া দিয়া তোমাকে শীতল করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিবে,

সেই সকল বন্ধুদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পুনরায় তোমাকে পলায়নের ফিকির খুঁজিতে হইবে। সুতরাং এই অসমসাহসে অধ্যবসায় না করিয়া, ভগবান্ যেখানে তোমাকে যেভাবে রাখিয়াছেন, সেখানে সেভাবে থাকিয়াই চেষ্টা করিতে থাক যাহাতে মন-প্রাণকে সংসার-তাপের উর্দ্ধে নিয়া যাইতে পার।

"সবলেরা তোমাকে দুর্ব্বল পাইয়া উৎপীড়ন করিতেছে, তাই বলিয়া কি দুর্ব্বলের কোনও ভরসাই নাই মা? মঙ্গলময় ভগবান্ই দুর্ব্বলের ভরসা, ভগবানের মঙ্গলময় নামই তাহার অবলম্বন। তুমি হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না, মনকে নিরাশ নিরুদ্যম করিও না, মনে আশা বাঁধো, ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস কর মা।"

স্বামীর ভিটা

"কোনও এক আশ্রমে যাইয়া জীবন কর্ত্তনের ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, চিত্তশুদ্ধির জন্য মঠ, মন্দির, আশ্রম, তীর্থ এবং দেবস্থান দর্শন মাঝে মাঝে একান্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু মা সধবার পক্ষে স্বামীর গৃহই নিরাপদ আশ্রয়। একথা বিস্মৃত হইও না। যে যেই যুক্তিই প্রদর্শন করুক, স্বামীর ভিটা পরিত্যাগের কল্পনাকে সহজে প্রশ্রয় দিও না।

"স্বামী উদ্ধত, অকৃতজ্ঞ, অত্যাচারী হইলেও স্বামীর ভিটা তোমার পরম আশ্রয়। স্বামী অবিবেচক, অবিচারী অনাচারী

হইলেও স্বামীর ভিটায় তোমাকে দাঁত কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা-সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা তোমাকে এই বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার পরে যদি কিছু ঘটে, তবে তাহা ঈশ্বরেচ্ছায় হইবে। কত সন্তপ্তা সধবা আমাকে লেখনীর মুখে তোমারই ন্যায় হৃদয়ভেদী ক্রন্দনরাশি উপহার-স্বরূপে পাঠাইতেছে এবং উপদেশ চাহিতেছে। প্রত্যেককে আমি এই একই উপদেশ দিতেছি,—'যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, স্বামীর ভিটাত্যাগের কুবুদ্ধি করিও না।'

"অবশ্য, কোনও অবস্থাতেই কি স্বামীর ভিটা ত্যাগ করা চলিবে না?

তোমার চক্ষের সম্মুখে তোমার শিশু না খাইয়া মরিবে, তোমার স্বামীরই প্রশ্রয়ে তোমার বক্ষে চাপিয়া বসিয়া দুরাত্মা লম্পট তোমার সতীত্ব-সম্পদ কাড়িয়া নিবে, আর এমন বিপন্ন মুহূর্ত্তেও আমি বলিব, স্বামীর ভিটায় পড়িয়াই ছিন্নমস্তার মত আপন শোণিত আপনি পান কর? নিশ্চয়ই তাহা বলিব না।"

অখণ্ডের অবশ্যপালনীয় সদাচার

নোয়াখালী জেলান্তর্গত-পরকোট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি * লিখিলেন,

"তোমাদের অভিভাবকবর্গ নাকি বিশেষ ভাবে চিন্তিত

* এই পত্রখানার তারিখ-সঙ্গতি করা যায় নাই।

হইয়াছেন যে, তোমরা সকলে বিপথে চলিয়াছ এবং এই কারণেই তোমাদের উপরে নানা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উৎপীড়ন চলিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। কিন্তু আমার প্রদত্ত শিক্ষা কি তোমরা পালন করিয়া যাইতেছ না? আমারই ত' ইহা অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ যে, প্রত্যেক অখণ্ড নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে পিতৃমাতৃচরণ বন্দনা করিবে। তোমরা কি ধূমপান প্রভৃতি কদভ্যাস এবং পরনিন্দা প্রভৃতি বিপজ্জনক ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া চলিতেছ না? তোমরা কি নিজ স্ত্রীতে সংযত দৃষ্টি এবং পর-স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি নিয়া চলিতেছ না? তোমরা কি পরধর্ম্মগ্লানি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভগবানের সকল সাধককেই ভগবদ্‌জন-জ্ঞানে সম্মান দান করিতেছ না? তোমরা কি নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র-সাধনে একাগ্র, একনিষ্ঠ, দৃঢ়াভ্যাসী হইয়া চলিতেছ না?

উপরি-উক্ত নির্দ্দেশগুলি যদি তোমরা প্রাণপণে পালন করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা যে বিপথে চলিতেছ, এইরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ কোনও সজ্জন কেন যে করিবেন, তাহা আমি বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কলহ

"তবে, এদেশে দ্বৈত আর অদ্বৈত মত নিয়া কলহ আছে, ইহা সত্য। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীরা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রান্ত এবং নারকী বলিয়া গালি দিতেও অনেক

সময় কুণ্ঠিত হন না, এইরূপ অসহিষ্ণু বিতণ্ডাও আমি কোথাও কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু তোমরা দ্বৈতবাদীও নহ, অদ্বৈতবাদীও নহ। জীব আর ভগবান একেবারে পৃথক্, ইহাও তোমাদের মত নহে। জীব আর ভগবান্ সর্ব্বাংশে এক, ইহাও তোমাদের মত নহে। যে নামেই ভগবানকে ডাক, ভগবান্ সকলের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন এবং ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। ভগবানের সহিত জীবের এই অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ বর্ণনার বা ভাষার অতীত বলিয়াই কেহ কেহ দ্বৈত-তত্ত্বই সত্য, অদ্বৈত অসত্য, আবার কেহ কেহ অদ্বৈত তত্ত্বই সত্য, দ্বৈত অসত্য, এরূপ খ্যাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

"তাঁহার নামের ভিতরে তিনি নিজ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং নামের বিমল সঙ্গ করিতে করিতে ভজনশীল জীব কখনও তাঁহার সহিত নিজের দ্বৈত সম্বন্ধ, কখনও তাঁহার সহিত নিজের অদ্বৈত সম্বন্ধ, কখনও তাঁহার সহিত নিজের দ্বৈতাদ্বৈতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উপলব্ধি করে। অখণ্ড-নামের সেবার ফলে ক্রমশঃ এই বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়া জীব কারুণ্য-রসঘন ভগবানের প্রেমসুখ আস্বাদন করে,—তোমাদের দার্শনিক মতের ভিত্তি ইহা বলিয়া তোমাদের সহিত জগতের কোনও দ্বৈতবাদীর বা কোনও অদ্বৈতবাদীরই কলহ নাই। তোমরা যদি নিজ সাধনে একাগ্র, একনিষ্ঠ এবং অনুশীলনপরায়ণ থাক, তাহা হইলে অপরে আসিয়া তোমাদের সহিত কেন কলহ করিবেন?

ভগবানের গুপ্ত নাম

"জগতের সকল সম্প্রদায়ীরাই এক নামে ভগবানকে ডাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁকে ডাকিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু সকল নামই যখন এক জনের, তখন সকল নামই বস্তুতঃ এক। বিশেষতঃ নামমাত্রেরই বাহ্য একটী বিকাশ আছে, পরন্তু গুপ্ত একটী অন্তর্নিহিত স্বরূপ আছে। মুখে 'কৃষ্ণ' বলিতে যাহা বলা হয়, কাণে 'কৃষ্ণ' শুনিতে যাহা শুনা হয়, তাহা প্রকৃত কৃষ্ণনামের বাহ্যরূপ মাত্র। ভিতরে এমন আর একটী ধ্বনি আছে, যেই ধ্বনি মুখে কখনও উচ্চারিত হইতে পারে না এবং যেই ধ্বনি অন্তরের কর্ণে শুনা যায়। 'কৃষ্ণ'-নাম বারংবার কীর্ত্তন করিতে করিতে, বারংবার জপিতে জপিতে বারংবার স্মরণ করিতে করিতে পরিশেষে এমন এক সূক্ষ্ম স্থানে শ্রবণ-মনন-স্মরণের অনুভূতি গিয়া পঁহুছে, যেখানে জগতের সকল নামের মূল-স্বরূপ ভগবানের গুপ্ত নামটী আত্মপ্রকাশ করে। 'হরি'-নাম সম্পর্কেও এই কথা সত্য। 'বিষ্ণু'-নাম সম্পর্কেও এই কথা সত্য। 'শিব'-নাম সম্পর্কেও এই কথা সত্য। 'দুর্গা'-নাম সম্পর্কেও এই কথা সত্য। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, ভগবানের যে একটী গুপ্ত নাম আছে, একথা মুসলমানেরাও বলিয়া থাকেন। মুসলমান শাস্ত্রও একথা সমর্থন করেন। ভগবানের যেই গুপ্ত নাম মুখে প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই

গুপ্ত রহিয়াছে, ভগবানের যেই গুপ্ত-নামটী ভগবানের অপরাপর শত শত সহস্র সহস্র নামের প্রাণ, ভগবানের যেই নামটীর সাক্ষাৎকার চরমসিদ্ধির দিন হইলেও প্রত্যেক বিভিন্ন নামের জাপকেরও পক্ষে অবশ্যম্ভাবী সত্য, ওঙ্কারই সেই নাম জানিও। মুখে যে ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া থাক, সেই উচ্চারিত ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের সর্ব্বনামের সর্ব্ববীজের প্রাণস্বরূপ অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অনুচ্চারিত ওঙ্কারের বাহ্য ঝঙ্কার মাত্র। ওঙ্কার সর্ব্বসম্প্রদায়ের মান্য, সর্ব্বসম্প্রদায়ের পূজ্য, সর্ব্বসম্প্রদায়ের আদরণীয়, তোমরা নির্দ্দিষ্ট ভাবে 'কৃষ্ণ' বা 'বিষ্ণু' নাম জপ না করিয়া ওঙ্কার-জপ করিতেছ বলিয়া যদি তোমাদের অভিভাবক-বর্গ তোমাদের উপরে বিরক্ত হইয়া থাকেন, তবে আমি বলি, একান্ত নিষ্ঠার সহিত নাম জপিয়া গেলে, ইহার ফলে তোমাদের চোখে, মুখে, বাক্যে এবং চরিত্রে এমন মধুর কমনীয় হৃদয়গ্রাহী, প্রেমকোমল প্রভাব সৃষ্ট হইবে, যাহা সকল আপাত বিরোধ দূর করিয়া দিয়া তোমাদের অভিভাবক-সম্প্রদায়কে নিঃসঙ্কোচ, নিষ্কুণ্ঠ এবং নিঃসংশয় করিবে।

উভয় কর্ণে মন্ত্রদানের তাৎপর্য্য

"দীক্ষা প্রদানের পদ্ধতির ভিতরেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রভেদ আছে। এই প্রভেদের দরুণ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি চলিত বর্ব্বর যুগে। বর্ত্তমান যুগ সহিষ্ণুতার যুগ, ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের মধ্যে সপ্রেম বাহু-বিস্তারের যুগ।

এই যুগে এই সকল তুচ্ছ পার্থক্যকে সজ্জনেরা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কেহ বাম কর্ণে মন্ত্র দেন, কেহ দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র দেন, আমরা উভয় কর্ণে দেই। উভয় কর্ণে দিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই দুইটী কর্ণ ব্যতীতও একটী তৃতীয় কর্ণ আছে। সেই দিব্য কর্ণে যাহাতে মঙ্গলমধুময় ওঙ্কারের পবিত্র ধ্বনি অতি দ্রুত কখনও শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পার, ইহাই তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের গুরুর অভিপ্রায় এবং আশীর্ব্বাদ। বাম কিম্বা দক্ষিণ কর্ণে প্রদান করিবার জন্য মন্ত্রসকল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতে নির্দ্দিষ্ট করা আছে কিন্তু ওঙ্কার-মন্ত্র সকল সাম্প্রদায়িক বিধানের উর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া ইহা প্রদান-কালে উভয় কর্ণে প্রদান করা হয়। তোমাদের অনেকের ভিতরে জাত্যভিমান অতীব প্রবল, সমাজের অন্যান্য জাতি যখন হয়ত তোমাদিগকে নীচ বা অপাংক্তেয় বলিয়া শূদ্রাধম জ্ঞান করিতেছে, তোমরা সেই সময় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছ যে, তোমরা কোন্ পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতির গুরুবংশ ছিলে এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও শাসন-দণ্ডধারী শিষ্যের উৎপীড়নে শূদ্রের মত অনাদরণীয় হইয়াছ। সেই তোমাদের পক্ষে ব্রাহ্মণের চিরন্তন অধিকার প্রণব অবিলম্বে বাহুবলে গ্রহণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য এবং নিজেদের পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের দাবী যে একমাত্র ওঙ্কারের উপরে অধিকার স্থাপনের মধ্য দিয়াই পূর্ণ হইবে, এই কথা আজ তোমরা বিস্মৃত হইয়া যাইতেছ কেন? ওঙ্কার

ব্রাহ্মণের মন্ত্র বলিয়াই অপরাপর সাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের ন্যায়, বামকর্ণ বা দক্ষিণ কর্ণের শাসন মানেন নাই, পরন্তু উভয়কর্ণে প্রবেশাধিকার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ওঙ্কার সর্ব্বালিঙ্গন-কারী মহামন্ত্র,—ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপে প্রত্যেক মন্ত্রেই প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন, এবং একমাত্র ওঙ্কারেরই ভিতরে জগতের সকল মন্ত্র যুগপৎ একাধারে বিরাজিত রহিয়াছেন। কৃষ্ণ-মন্ত্রে আর কালী-মন্ত্রে বিভেদ-বিচ্ছেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উপরি-উক্ত কারণেই ওঙ্কার-মন্ত্রের সহিত কৃষ্ণ-মন্ত্রেরও বিরোধ নাই, কালী-মন্ত্রেরও বিরোধ নাই। সকল মন্ত্রের এবং সকল তত্ত্বের বিরোধ-বিচ্ছেদ একমাত্র ওঙ্কারের ভিতরে আসিয়াই সমন্বয় পাইয়াছে। এই কারণেই বামকর্ণ বা দক্ষিণকর্ণের শাসন ওঙ্কার-মন্ত্রের উপরে বর্ত্তে নাই।

দীক্ষা নিয়া অসাধন

"তোমরা কেহ কেহ সাধন-ভজন বিষয়ে একটু চঞ্চল, একটু অস্থিরমতি, একটু সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছ বলিয়া আমি সংবাদ পাইয়াছি। কেন বাবা এতদিন পরে তোমাদের এ চাঞ্চল্য? আমি কি গায়ের জোরে বাধ্য করিয়া তোমাদের কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছিলাম? আমি কি একজনকেও ডাকিয়া আনিয়া দীক্ষাগৃহের অঙ্গন-তলে বসাইয়াছিলাম? 'তোমরা আমার শিষ্য হও,' বলিয়া আমি কি একটি প্রাণীর উপরেও

কোনও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলাম? দূর দূরান্তর হইতে কে তোমরা কি কারণে আসিয়া দীক্ষা নিয়াছিলে, তাহা তোমরাই জান। সভাস্থলে বক্তৃতায় পরোক্ষ ভাবেও আমি দীক্ষার কথা বলি না, বিশ্রব্ধ আলাপে সুকৌশলেও আমি দীক্ষার ইঙ্গিত দেই না, পত্র লিখিতে বসিয়া কাহাকেও দীক্ষার পরামর্শ বা উৎসাহ প্রদান করি না। তবু তোমরা দীক্ষা নিয়াছিলে। দীক্ষা যখন নিয়াছ, তখন সাধন করিবার গুরুদায়িত্ব তোমরা কিছুতেই অতিক্রম বা অস্বীকার করিতে পার না। আমার হৃদয়ের ধন আমার কাছ হইতে কাড়িয়া নিয়া তারপর তাহার অযত্ন তোমরা করিতে পার না। উৎপীড়ন আসিতেছে? আসুক। সাধন তোমাদের করিতেই হইবে। অত্যাচার আসিতেছে? আসুক। সাধন ছাড়িতে পারিবে না। তবে যদি বোঝ যে, ভবিষ্যতে তোমাদের অঞ্চল হইতে দীক্ষার্থীরা আমার নিকটে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলে পরে তাহারা অভিভাবকের উৎপীড়নে নিজ নিজ সাধন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তিকে দীক্ষা নিতে আসিতে বিরত রাখিও, কেননা, বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে পোষণ করে না, জমি কিনিয়া চাষ করে না, জমিদারী পাইয়া খাজনা আদায় করে না, এই জাতীয় লোক যেমন দুর্ভাগ্য, দীক্ষা নিয়া সাধন করে না, এমন ব্যক্তিও তেমনই দুর্ভাগ্য।"

বাঁকুড়া
৯ ভাদ্র, ১৩৪১

সধবা-জীবনে সংযম-সাধনার সহজ কৌশল

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সধবা-জীবনে সংযম-সাধনার সহজ কৌশল কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক এই কথাটাই এইমাত্র একটী মাকে অদ্য পত্র-যোগে লিখেছি।

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রখানা প্রশ্ন-কারীকে দেখিতে দিলেন। তাহার অংশ বিশেষ * আমরা নিম্নে উদ্ধার করিলাম। যথা—

"তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সধবা-জীবনে সংযম-সাধনার সহজ কৌশলটী কি? *** নিজেকে মা বলিয়া জানিতে শেখাই সেই সহজ কৌশল। বিশ্বভুবনের যে তুমি মা, এই কথাটী অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর, সংযম আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। নারীর অন্তরে মাতৃভাব যতক্ষণ না বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তার জায়াভাব প্রবল থাকে সুতরাং ভোগলিপ্সাও প্রবল থাকে। *** কিন্তু মা হইলে সন্তানের সেবাবুদ্ধি ভোগ-

* সম্পূর্ণ পত্রখানা 'সধবার-সংযম' পঞ্চম সংস্করণের ৪৭নং পত্রের ১১১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

লোলুপতার স্থানটুকু অধিকার করিয়া লয়। এই জন্যই মাতৃত্ব অসংযম-নাশক, সংযম-সাধক।"

কুমারী-জীবনে সংযম-রক্ষা

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—কুমারী-জীবনে সংযম রক্ষার কৌশল কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক কথায় আমি তার কোন কৌশলের কথা তোমাকে ব'লে দিতে পারব না। কারণ, কুমারীদের মন ক্রমবিকাশশীল এবং সংসারের জটিল আবর্ত্ত এবং কুটিল ষড়যন্ত্রের কিছুই তারা জানে না। যাকে দেখে, তারই প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ, তারই প্রতি স্নেহশীল, বিপদ-আপদ সম্পর্কে সম্পূর্ন নিঃসন্দিগ্ধ, এই হচ্ছে কুমারীর চরিত্র। তজ্জন্য, কুমারীর সংযম রক্ষার দায়িত্ব তার একার নয়, দায়িত্ব যথেষ্ট পরিমাণে তার পিতার ও তার মাতারও, তার মাসী, পিসী, খুড়ী, জ্যেঠী প্রভৃতি আত্মীয়া প্রত্যেক মহিলারও। তবে, এক কথায় যদি শুন্‌তে চাও, আমাকে বল্‌তেই হবে যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ কারো সঙ্গেই যেন সে দৈহিক মাখা-মাখি না করে, এরূপ শিক্ষা তাকে দেওয়া দরকার, আর যত নিকট আত্মীয়ই হোক বা হিতকারী বান্ধবই হোক, এবং যে বয়সেরই হোক, কোন পুরুষের সাথেই সে দিনে কিম্বা রাত্রিতে একাকিনী থাক্‌বে না, এরূপ সুপ্রবল সংস্কার তার ভিতরে সৃষ্টি ক'রে দিতে হবে।

কুমারীর ভিতরে পিতৃকুলের মর্য্যাদাবোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমারী মেয়ের ভিতরে পিতৃকুলের মর্য্যাদাবোধ জাগরিত ক'রে দেওয়া এক অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। নিজের কোন আচরণে পিতৃবংশে যাতে না কলঙ্ক আসে, এই বিষয়ে যার জেদ্‌ খুব প্রবল, সেই কন্যাই প্রকৃত কন্যা এবং সেই কন্যাকে সহজে কোনো দুষ্ট বা লম্পট নিজের ইচ্ছার অনুগামিনী কত্তে সমর্থ হয় না।

কুমারী কন্যাকে চখে চখে রাখা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমারী কন্যাকে চখে চখে রাখা মায়ের কর্ত্তব্য এবং তরুণী সধবাকে চখে চখে রাখা শ্বাশুড়ীর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনে যিনি উদাসীনা, তিনি মাও নন, শ্বাশুড়ীও নন। কিন্তু চখে চখে রাখা কথাটার মানে এই নয় যে, রাজনৈতিক কয়েদীর মত তার সকল স্বাধীনতা, সকল স্ফূর্ত্তি-আনন্দ, সকল সহজ প্রকাশ, সকল স্বাভাবিক গতি বন্ধ ক'রে দিতে হবে। সহজ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতিতে তাকে চল্‌তে দিবে, কিন্তু চক্ষু থাক্‌বে সতর্ক, যেন খেলার ছলে এই অবোধ মেয়ে হলাহল না পান করে, আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার বাড়াবাড়ির ভিতরে প'ড়ে নিজের কোনও গোপন সর্ব্বনাশ না করে। কিন্তু কৈশোর থেকে যৌবনের মধ্যবর্ত্তী

সময়টা এম্‌নি এক দুর্ব্বোধ্য রহস্যে ভরা যে, নিজের মন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং কন্যার প্রতি অকপট স্নেহশীল না হ'লে চখে চখে রেখেও বিপদ ঠেকান যায় না।

কুমারীর প্রতি পিতার কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই কুমারী-কন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য হচ্ছে তার ভিতরে ইজ্জৎ-বোধ জাগিয়ে দেওয়া, প্রবল আত্মসম্মান, সুতীব্র মর্য্যাদা-জ্ঞান ফুটিয়ে তোলা। "তোমার অপমানে মা তোমার পিতৃবংশের অপমান",—"তোমার অধঃপাতে মা তোমার মাতৃকুলের অধঃপাত",—"তোমার কলঙ্কে তোমার ভ্রাতৃগণের কলঙ্ক",—"কুবুদ্ধি কুরুচি কুকার্য্য তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতার মাথা হেঁট ক'রে দেবে",—এই কথাগুলি কন্যার অন্তরের মাঝে একেবারে পাথরে খোদাই করার মত স্থায়ী ক'রে বসিয়ে দিতে হবে। এ কর্ত্তব্য পিতার, এ কর্ত্তব্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, এ কর্ত্তব্য কতক পরিমাণে মাতার।

কুমারীর ইজ্জৎ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমারীর ইজ্জৎ যে সমাজের সব চেয়ে বড় জিনিষ, একথা ভুলে যাওয়ার মত পাপ নেই। কুমারী অবস্থায় যে নিজের ইজ্জৎ রাখতে শিখেছে, সধবা বা

বিধবা অবস্থায় তাকে প্রলুব্ধ কত্তে পারে, এমন রাবণ বা নরকাসুর এই জগতে কেউ জন্মেনি।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১১ই ভাদ্র, ১৩৪১

পুপুন্‌কী আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী একটী পল্লীতে গ্রাম-বাসিগণের মধ্যে ঘোরতর অনৈক্যের সম্ভাবনা দেখিয়া সকল বিরোধিতার অবসান কাটাইয়া শান্তি স্থাপনার্থে শ্রীশ্রীবাবামণি সেই গ্রামে গিয়াছিলেন। বিরোধী পক্ষদ্বয়ের সম্পূর্ণ তুষ্টি বিধান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কলহ নিবাইয়া আশ্রমে বেলা দুই ঘটিকার সময়ে ফিরিয়াছেন।

অশান্তির নিদান

আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কলহের কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারণ কিছুই নূতন নয়। জগতে সকল দেশে সকল কালে যে কারণে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে কলহ হয়েছে, এক্ষেত্রেও তাই। জিহ্বা এবং উপস্থ, মানুষের দুর্নিবার লোভ এবং লালসা, এই হচ্ছে কলহের কারণ। যা' খেলে আমার চলে, যা' পেলে আমার পুষিয়ে যায়, তাই খেয়ে আর তাই পেয়ে আমি তুষ্ট নই, তাই অপরের প্রাপ্যের উপরে অবৈধ অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করি,—এই থেকেই দুনিয়ার যত অশান্তির সৃষ্টি।

শান্তি স্থাপনের পথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে শান্তি যদি চাও, তাহ'লে লোভ আর লালসাকে দমন কর, নিজের সুখের দাবীর কালে পরের সুখের দাবীটাও চিন্তা কর, দশজনের সুখদুঃখের পানে তাকিয়ে নিজের সুখদুঃখের অনুভূতি কিছু কমাও,—জগতে এইটীই হচ্ছে সর্ব্বজনীন এবং চিরস্থায়ী শান্তির পথ।

স্নান-ধ্যান-আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

শান্তির পথ

হুগলী গোন্দলপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের পরমপবিত্র নামে মনকে সুনিবিষ্ট রাখ। শত সহস্র কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হউক। নামের শক্তিতে জগতের সকল ক্লেশ সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে। নামে নির্ভরই শান্তির পথ।

নাম চঞ্চলতা-হারক

"মনে চঞ্চলতা আসিলে মঙ্গলময় নামে অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে লাগিয়া থাকিবে। নামের মত দুঃখ-নাশক, বিঘ্নহারক,

ভীতি-বারক কাম-জারক, প্রেমদায়ক এবং চিত্তের স্থৈর্য্য-বিধায়ক আর কোনও বস্তু নাই। মন যত অধিক চঞ্চল হইবে, নামে তত দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকিবে।

আশ্রম-বাস

কুমল্লান্তর্গত নিলখি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশ্রমে থাকিতে চাহিতেছ? তোমার সঙ্কল্প সাধু। কিন্তু আশ্রমে আমি সহজে কাহাকেও থাকিবার জন্য অনুমতি দিতেছি না। না দিবার কারণও আছে। দুই দিন আশ্রমে বাস করিবে এবং এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সঞ্চয় যেটুকু করিবার করিয়া ত' নিশ্চয়ই কয়দিন পরে ঘরে ফিরিবে। কিন্তু তখন সরল মনে গৃহে ফিরিবার স্বকীয় আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের কথা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া আশ্রমের স্কন্ধে পাঁচটা কল্পিত দোষের দায় নিক্ষেপ করিবে। সংসারে যাহাদের ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন আছে, তাহাদের মধ্যে কম ব্যক্তিই এই ক্ষেত্রে সরল মনে নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া কহিতে পারে। একদা আশ্রম-বাসের কৌলীন্য এবং মর্য্যাদাটুকু হইতে তাহারা লোকচক্ষে ভ্রষ্ট হইতে চাহে না, কিন্তু ঘরে ফিরিয়া কেঁচে গণ্ডূষ করিবার দায় আশ্রমের ঘাড়ে চাপাইতে চাহে। ইহা যশঃপ্রতিষ্ঠালিপ্সু দুর্ব্বল মানবের এক অতি স্বাভাবিক ত্রুটি। এই ত্রুটীর দিকে

তাকাইয়াই আমি তোমাদিগকে আশ্রম-বাসের অনুমতি দিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকি। আমি দশজনের চাঁদায় আশ্রম চালাই না যে, তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের সুযোগ আশ্রমে দিতে পারিব। তোমাদের এখানে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইবে, তথাপি তোমাদের নিজেদের শ্রমে তোমাদের অন্ন আসিবে না। তেমন পরিশ্রমের পন্থা-প্রবর্ত্তন এখনও আমি করিতে পারি নাই, যে পরিশ্রম চারি ঘণ্টা করিলে একটা মানুষের দুই বেলার অন্ন আর এক বেলার জলযোগের সংস্থান হয়। কৃষি অতি কষ্টসাধ্য জীবিকা। সারাদিন নিদারুণ খাটুনি খাটিয়া কৃষককে নিজের অন্ন সংস্থান করিতে হয়। তাই, তোমাদের ধ্যান, জপ, বিদ্যার্জ্জন প্রভৃতির সুযোগ নিয়া যে অবসর সময়টুকু তোমরা অন্নার্জ্জন সম্পর্কিত শ্রমে বিনিয়োগ করিতে পারিবে, তাহাতে ঠিক্ ঠিক্ তোমাদের উদরান্ন আসিবে না। ফলে, আশ্রমবাসী একটী অবধি প্রাণীর অন্নার্জ্জনের জন্য আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। তোমরা আশ্রম-বাস করিতে আসিলে এই ক্লেশ আমার হয়। কিন্তু তোমরা যখন পুনরায় পূর্ব্বসংস্কারের টানে গৃহে ফিরিয়া যাও, তখন একথা একেবারে ভুলিয়া যাও। ফিরিয়া গিয়াছ নিজের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে কিন্তু লোকের নিকটে সে-কথা হাস্যমুখে সরল মনে কহিবার সৎসাহস তোমরা রাখ না। এ বিষয়ে আমি প্রবোধ গুপ্ত আর বরদা মজুমদারকে প্রশংসা না

করিয়া পারি না। ব্রহ্মচারী-রূপে ইঁহারা দীর্ঘকাল আশ্রম-বাস করিয়াছেন, অনশন অর্দ্ধাশনের দুঃখগুলি ইঁহারা আমার সঙ্গে সমান বিক্রমে সহ্য করিয়াছেন, কোদাল মারিতে গাইতি চালাইতে ইঁহারা একজনও এক দিনের জন্য বিন্দুমাত্র আলস্য করেন নাই, কিন্তু গৃহে যখন ফিরিয়া গেলেন, ইঁহাদের গৃহ-গমনের দ্বারা আশ্রমের সুযশই বর্দ্ধিত হইল, ইঁহাদের কোনও অসরল আচরণে একটী প্রাণীরও মনে আশ্রমের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধভাব বা সমালোচক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইল না। আশ্রমের অন্তেবাসী অপরাপর সতীর্থগণের সহিত ইঁহাদের কি কখনই কলহ হয় নাই? কোনও সময়ে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই আমি কি ইঁহাদের কখনও শাসন করি নাই? কলহও হইয়াছে, শাসনও করিয়াছি, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া গিয়া ইঁহারা নিজ নিজ পরিজনদের নিকটে সেই সকল তুচ্ছ ব্যাপারের বর্ণনা ভ্রমেও কখনও করেন নাই, বরঞ্চ আশ্রম জীবনের সেই অনাবিল শান্তির কথা, সেই শ্রমবহুল জীবনের বিরল বিশ্রামে লব্ধ প্রেমময় উপদেশের কথা ইঁহারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবোধ গুপ্ত আশ্রম ছাড়িয়াছেন, কিন্তু ইহার ফলে প্রবোধের যে আত্মীয় ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে আছেন, প্রত্যেকেই আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, প্রেমভাবসম্পন্ন এবং অনুরক্ত হইয়াছেন। বরদা মজুমদার আশ্রম ছাড়িয়াছেন, কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার পিতা, মাতা, সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং গ্রামবাসী প্রত্যেক প্রাণী আশ্রমকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া অনুভব

করিয়াছেন। এইরূপ সরল এবং অকপট মন লইয়া তোমরা কয়জন আশ্রম-বাসের অনুমতি প্রার্থনা কর? এই জন্যই কাহাকেও আমি বড় সহজে আশ্রমবাসের অনুমতি দেই না। সুতরাং ভগবান্ তোমাকে যেখানে রাখিয়াছেন, সেই স্থানকেই আশ্রম জ্ঞান করিয়া, সেই স্থানকেই ভগবানের উপাসনার মন্দির জানিয়া, শত অসুবিধা, বাধা ও বিঘ্নের মধ্য দিয়া পরমশরণ শ্রীভগবানের নামের সেবা করিতে থাক। নামের অকপট সেবার গুণে তোমার পরিজন-কলরব-মুখরিত সংসারই আশ্রমের তপোবনে পরিণত হইবে।"

সকলেই কি গৃহত্যাগী হইবে

কুমিল্লান্তর্গত ডাল্‌পা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুনিয়ার সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগী করিয়া চলিয়া যাইবে, আর সংসারী কেহ হইবে না, চাকুরী কেহ করিবে না, ব্যবসায় কেহ করিবে না, এরূপ কখনও হইতে পারে না। নিজ নিজ পূর্ব্বসংস্কার এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী এক একজনের এক এক প্রকারের পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যে যেই পন্থাতেই থাকুক, ভগবানকে কখনও যেন না ভোলে, ইহাই জীবনে একমাত্র বাঞ্ছনীয়। যে অবস্থায় যে আছ, নিজ নিজ আগন্তুক কর্ত্তব্য উপস্থিত শক্তি-সাধ্যানুযায়ী ষোল আনা যত্নের সহিত পালন করিয়া যাও এবং অবিরাম

ভগবৎ-স্মরণে নিমগ্ন থাক। ভগবানকে যতক্ষণ স্মরণে রাখিতে পারিয়াছ, ততক্ষণই জীবিত আছ বলিয়া মনে করিও, অপর সময়ে তুমি মৃত বা প্রেতাত্মা-সদৃশ মাত্র। ভগবানের নামে যতক্ষণ তোমার মন মজিয়া আছে, ততক্ষণই তুমি মানব, অপর সময়ে তুমি পশু কিংবা নরকের কীট। এই কথা স্মরণে রাখিয়া ভগবৎ-স্মরণকে জীবনের প্রথম, প্রধান এবং প্রকৃষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়া মানিয়া সাধিয়া লও।"

সাধু পরিচয়ের মোহ

নাগাহিলের অন্তর্গত ডিমাপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি নিজের নাম.............বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছ। ইহাতে তোমার অন্তরে সাত্ত্বিক অভিলাষ প্রকটিত হইতেছে। সাধারণ মানুষের সাধারণ নামে এবং সাধারণ পরিচয়ে তুমি আর পরিচিত হইতে চাহ না, তোমার নাম, পরিচয়, কার্য্য, জীবন এবং লক্ষ্য অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণরূপে অনন্যসাধারণ হইবে,—তোমার এই নবনাম-স্বাক্ষর দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা সূচিত হইতেছে। কিন্তু বাবা, সাধু বা ব্রহ্মচারী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিবার ভিতরে অনেক বিপদ আছে। অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, কপটতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা, সেবিত হইবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক মন্দগ্রহ জীবনযাত্রাকে বিপৎ-সঙ্কুল করিতে পারে।

সুতরাং বর্ত্তমানে যে পরিচয়ে তুমি সকলের নিকটে পরিচিত, সেই পরিচয়েই আগে তপঃসাধনার বলে বড় হও। সাধন করিয়া আগে অন্তরে বল-সঞ্চার কর, তাহা হইলে নাম বা উপাধির পরিবর্ত্তন-জনিত কোনও প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে তোমার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিকে বিঘ্নিত করিতে পারিবে না। সাধু হওয়াই প্রয়োজন, সাধু নামে পরিচিত হইবার মোহ তোমার কোনও কাজেই আসিবে না। অবশ্য 'বিলাসচন্দ্র ভোগী'র নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যদি সাধনানন্দ ত্যাগী' হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে যে নূতন নামের প্রভাব চরিত্রকে উন্নতিমুখী এবং মনকে সাধনরুচি-সম্পন্ন করে, ইহা সত্য। এই সত্য আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলের বড় সত্য এই যে, তোমরা সাধু হও কিন্তু সাধু-নামের প্রতি কোনও মোহ রাখিও না, তোমরা তপস্বী হও কিন্তু তপস্বি-পরিচয়ের জন্য ব্যগ্র হইও না।

সকল বিদেশীকে স্বদেশী কর

আসাম সদিয়া-প্রবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু দূরে বাস করিতেছ, কিন্তু একথা ভুলিয়া যাইও না যে, নিজ নিজ প্রেমময় স্বভাবের দ্বারা সেই দেশেরই অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত তোমাদের আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে। প্রেমে,

সেবায়, বিনয়ে এবং হিত বুদ্ধিতে তোমরা সকলের হৃদয় জয় কর এবং মঙ্গলময় ভগবান্ যে সকল সৎপ্রবৃত্তি তোমাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তোমাদিগকে মনুষ্যরূপে এই ধরায় পাঠাইয়াছেন, সেই সকল সৎ প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট সদ-ব্যবহারের দ্বারা আপন হিত এবং পরের হিত সাধন কর। জগতে কাহাকেও বিদেশী বলিয়া মনে করা উচিত নহে, সকল পরদেশীকে ভগবৎ-প্রেমবলে স্বদেশী করিয়া নিবার শক্তি তোমাদের থাকা চাই। অন্ততঃ আমি ইহা তোমাদের কাছে সর্ব্বদাই প্রত্যাশা করি, জানিও।

প্রকৃত স্বদেশ

"আর প্রকৃত প্রস্তাবে এই জগতে আমরা সকলেই বিদেশী। এই জগৎ আমাদের কাহারওই স্বদেশ নহে! সীমাবদ্ধ একটুখানি ভূমণ্ডের অংশবিশেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা নিজদিগকে সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্বদেশী এবং জগতের অপর সকল অংশের বিদেশী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। কিন্তু আমাদের সকলের প্রকৃত স্বদেশ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। সেই একমাত্র স্বদেশ হইতে সকলে এই পৃথিবীর বিদেশ-যাত্রা করিয়া আসিয়াছি এবং সকলেই এই পৃথিবীর সাময়িক সফর শেষ করিয়া পুনরায় নিজেদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। সেই স্বদেশে ফিরিয়া গেলে দেখিতে পাইবে যে, কেহই আমরা পরস্পর হইতে পর ছিলাম না কিন্তু অল্পকালের জন্য

বিদেশে আসিয়া বিদেশেরই একটা ভাড়াটে বাড়ীকে স্বদেশ স্বজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া একজন অপর জনের সহিত লাঠালাঠি কাটাকাটি করিয়াছি। যাহারা অতীত ভাবে না, ভবিষ্যৎ দেখে না, তাহারা এভাবেই অসার এবং অস্থায়ী প্রবাসকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করতঃ শুধু দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, হত্যা এবং আত্মহননের অনুশীলন করিতেছে। যত চৌর্য্য, যত দস্যুতা, যত অনধিকার, প্রবেশ, যত উৎপীড়ন, যত অনাচার, যত অবিচার সবই জগতে এই এক মহাভ্রান্তি হইতে সৃষ্ট হইতেছে। তোমরা জগতের একটী ব্যক্তিকেও বিদেশী বলিয়া ভাবিও না এবং সযত্নে, ধৈর্য্যসহকারে এই প্রকৃত স্বদেশের সংবাদ সকলের কর্ণগোচর করাও। প্রত্যেকটী পুরুষ, প্রত্যেকটী নারী নিজ নিজ স্বদেশের ভাবনায় অধীর হউক এবং মিছে ছেলেখেলা-স্বরূপে যে প্রবাস-বাসকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে নিতান্ত অনিত্য জানিয়া নিত্যের প্রতি অভিনিবেশশীল হউক। সকলের দৃষ্টি প্রকৃত স্বদেশের প্রতি আর্কষণ কর এবং জানিও, ইহাই তোমাদের জীবনের এক অতি মহৎ কর্ত্তব্য, এক পরম-করণীয়।"

স্বাধ্যায়

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বাঙ্গরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার উপদেশগুলি * আংশিক সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিয়া তোমরা ছাত্র এবং যুবকগণের মধ্যে নিয়মিত পাঠ করিতেছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। যাঁহারা তোমাদের হিতচিন্তা করেন, তাঁহাদের বাণী নিয়মিত এবং বারংবার পঠন-পাঠনের দ্বারা তোমাদের অবিমিশ্র কুশল ব্যতীত অপর কোনও অবাস্তব লভ্যের আশঙ্কা নাই জানিও। কোনও কোনও অভিভাবকশ্রেণীস্থ সজ্জন যে তোমাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইন্ধন যোগাইতেছেন, এই সংবাদ আমর নিকটে আরও উপাদেয় বিবেচিত হইয়াছে। আমি অবশ্য সাধকও নহি, সিদ্ধপুরুষও নহি, গ্রাম্য সাধারণ ব্যক্তির সহিত আমার আকারে বা বচনে মাত্র সামান্য পার্থক্য থাকিতে পারে, নতুবা আমি সর্ব্বতোভাবে সকল লোকের মতই একান্ত সাধারণ মানব। ত্যাগ-তপস্যার গর্ব্ব আমি করিতে পারি না, লোকে জোর করিয়া বা ভালবাসিয়া বা ভ্রমবশে অনেক সময়ে আমাকে ত্যাগী কিম্বা তপস্বী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমি মনে-প্রাণে জানি যে, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার ভিতরে অসাধারণত্ব বা অসামান্য কিছুই নাই। তবু, একথা সত্য যে, আমি তোমাদের অকপট হিতৈষী, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হিতৈষী, তোমাদের কাছ হইতে বিনিময়ে একটা ভক্তিপূর্ণ প্রণামের পর্য্যন্ত প্রত্যাশা না রাখিয়া আমি তোমাদের হিতচিন্তা করিয়া থাকি। শুধু এই কারণেই আমার

* "অখণ্ড সংহিতার" পাণ্ডুলিপি।

বাণী তোমাদের হিতবর্দ্ধন করিবে, এই আশা আমি রাখি এবং আমাকে তোমরা ভালবাস বলিয়াই আমার বাণী পাঠ করাকে স্বাধ্যায়-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া তোমরা গণনা করিলে আমি আপত্তি করিব না। শাস্ত্রের পর শাস্ত্রে ভগবানের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই কারণে ঐ সকলের পঠন-পাঠনকে স্বাধ্যায় বলা হয়। আমিও আমার জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে পূর্ব্ববর্ত্তী মুনি ঋষি মহাজনদের হিতবাণীর প্রতিধ্বনি ও অনুধ্বনি করিয়াছি। সুতরাং আমার বাণীকে তোমরা স্বাধ্যায় সেবা রূপে পরিগণিত করিয়া নিয়মিত ও নিত্য পাঠ করিলে আমার তাহাতে আপত্তি করিবার কোনও যুক্তি নাই। তবে একটা কথা তোমাদের স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিতে চাহি যে, আমি কিন্তু জীবনে কখনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত, পথ বা প্রণালীকে নিন্দা করি নাই, সুতরাং তোমরাও কখনো আমার কোনও বাক্যকে ঐরূপ কুকার্য্যে ব্যবহার যেন না কর। নির্ম্মল, নিষ্কলুষ মন লইয়া তোমরা গ্রন্থ পাঠ করিও এবং পড়িবার সময়ে আমাকেও একটু আশীর্ব্বাদ করিও, আমি যেন তোমাদের মত বিনীত মন লইয়া পূর্ব্বাচার্য্যদের উপদেশ পাঠ, চিন্তন ও অনুসরণ করিতে পারি। স্বাধ্যায় আত্মোন্নতির এক মহৎ সোপান। তোমরা যদি কখনও আমার উপদেশ পাঠ করিতে অরুচি বোধ কর, তাহা হইলেও স্বাধ্যায় ত্যাগ করিও না, অপর কোনও মহাগ্রন্থের নিত্য সঙ্গ করিয়া

জীবনের অপূর্ণতাগুলির পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য যত্নবান রহিও।”

মহাপুরুষ-সমাগম সম্পর্কে পল্লীর আত্মপ্রস্তুতি

শ্রীহট্ট-জেলান্তর্গত কাকাইলছাও-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“সৎসঙ্গ বা সাধু-সমাগম পল্লীতে পল্লীতে প্রত্যহ হইতে পারে না। কেননা, হয়ত তোমরা প্রকৃত সাধু চিনিবে না, নতুবা হয়ত সাধু সজ্জনের গমন-পথে অহরহ তোমাদের গ্রামটী পড়িবে না। ঈশ্বরানুগত ভগবৎ-সমর্পিত চিত্ত সাধুরা অনেক সময়ে জীবহিতকল্পে বহির্ম্মুখ-কর্ম্মপরায়ণ হইলেও এই পৃথিবীটী এত ক্ষুদ্র স্থান নহে যে, যত স্থানে তাঁহাদের সেবাহস্ত সম্প্রসারণের প্রয়োজন, তত স্থানেই তাঁহারা সশরীরে যাইতে পারিবেন কিম্বা যেখানে যাইতে সমর্থ হইবেন, সেইখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারিবেন। এমতাবস্থায় তাঁহারা প্রত্যেকটী গ্রামে যাইতে পারিলেন না বলিয়া অনুযোগ অভিযোগের ভাব রাখা উচিত নহে এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যেক পল্লীবাসীর কুটীরপ্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করার চেষ্টাও প্রশংসনীয় নহে। যাঁহারা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া ধর্ম্মদান করিতে পারিতেন এবং হয়ত দীর্ঘায়ু হইয়া সমস্তটুকু আয়ু নিঃশেষে

জগতের সেবায় সমর্পণ করিতে পারিতেন, এমন অনেক মহাপুরুষকে তোমরা এভাবে অন্যায় আবদারে শ্রমক্লান্ত করিয়া অকালে নরলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য করিয়াছ। এই জন্য তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, যদি প্রকৃত সাধু চিনিয়া থাক এবং তাঁহার চরণ-ধূলিতে তোমার পল্লীকে কৃতকৃতার্থ করিবার অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে সাধু-সমাগমের পুণ্যফলে যাহাতে একটী বা দুইটী দিনের মত অল্প-সময় মধ্যেও এক শতাব্দীর ধর্ম্ম-প্লাবন প্রবাহিত করা যায়, তদ্রূপ ভাবে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে থাক। সদ্‌গ্রন্থের পঠন ও পাঠন দ্বারা, সদ্‌বিষয়ের আলোচনা, অনুশীলনের দ্বারা এবং অবিরাম হরি-ওঁ কীর্ত্তনের দ্বারা, গ্রামমধ্য হইতে মহাপাপ কলিকে প্রাণপণ যত্নে বিতাড়িত কর, যেন মহাপুরুষের চরণ-দর্শন মাত্র সেই দর্শনের শুভফল তোমাদের জীবনে অনন্তকাল স্থায়ী হয়। স্বাধ্যায় এবং কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান-দ্বারা চতুর্দ্দিকের জড় প্রাণগুলিতে চেতনার সঞ্চার কর। প্রত্যেকটী মানবকে, প্রত্যেকটী মানবীকে জীবনের চরম চরিতার্থতার প্রকৃত সাধনায় উদ্দীপিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টাকে, কোনও যত্নকে, কোনও শ্রমকে, কোনও ব্যয়কে অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান করিও না। উদ্যোগে, উৎসাহে, উল্লাসে, উদ্যমে কোনও দিক্ দিয়াই তোমরা কৃপণ হইও না। সন্নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামকেও কিম্বা কোনও গ্রামের একটী অধিবাসীকেও

তোমরা তোমাদের প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের পরিধির বাহিরে রাখিও না। অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাস, নাস্তিকের হৃদয়ে আস্তিক্য, অপ্রেমিকের প্রাণে প্রেমসঞ্চার করিয়া তোমরা এক নবযুগের পত্তন নিজ পল্লী মধ্যে সর্ব্বাগ্রে করিয়া লও। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন,—'ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা' অর্থাৎ এই জগতে সজ্জনের সঙ্গতি যদি ক্ষণকালের জন্যও হয়, তবে একমাত্র তাহারই বলে দুস্তর ভব-বারিধি নৌকাযোগে অবহেলে পার হইয়া যাওয়া যায়। তোমরা 'সজ্জন-সঙ্গতি'র উপরে ততটা জোর দিবে, 'ক্ষণ' কথাটার উপরে তাহা অপেক্ষা অধিক জোর দিও। সময়ের যে মূল্য কত, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও। অল্প সময়ে যাহাতে বেশী লাভ উঠাইতে পার, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া চলিও। সময় জলস্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে, যেটুকু যাইতেছে, সেইটুকু আর ফিরিয়া আসিবে না। অপিচ, সাধু-মহাজনগণের উপরে নিখিল জগতের প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক মানবের সমান দাবী, সমান অধিকার, সুতরাং চক্ষের পলকে তাঁহারা তোমাদের যে সেবা করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে দিন, সপ্তাহ বা মাস কাল আটক রাখিবার বুদ্ধি ভাল নহে। তবে কোনও পল্লীবিশেষকে নিজ-সাধনার তপঃস্থল বলিয়া গ্রহণ করিয়া যদি কোনও মহাপুরুষ সেস্থানে স্বেচ্ছায় দীর্ঘকাল বাস করেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র এবং সেস্থলে তাঁহার তপোবাধা নিরাকৃত করিয়া তপস্যার অনুকূল

অবস্থার সৃজনে নিজেদের সাধ্য-সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টায় রত হওয়া তোমাদের এক পরম কর্ত্তব্য হইবে।"

পুপুনকী আশ্রম

১২ই ভাদ্র, ১৩৪১

মন্মথনাথ খাওয়াশ

দ্বারিকা গ্রামের পরহিতব্রতী ভক্ত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ খাওয়াশ শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন। কলিয়ারী অঞ্চলের জনকয়েক শিক্ষিত ভদ্রলোককে তিনি আশ্রম দেখাইতে আনিয়াছেন। প্রথমেই শ্রীশ্রীবাবামণির কুটীরে প্রবেশ না করিয়া সমগ্র আশ্রম ঘুরিয়া মন্মথ-দা আগন্তুকদের দেখাইতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণি এতদ্দেশের অজ্ঞ মূর্খ চাষাদের মধ্যে নব-নব কৃষি প্রবর্ত্তনের জন্য কি উদ্দেশ্যে কোন্ নূতন জিনিষের কৃষি করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। কি ভাবে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ হাতে ইট গাঁথিয়া ইন্দারার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত গাঁথিয়াছেন এবং কতদিন উপর হইতে ইট পড়িয়া গুরুতর আঘাত হইতে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, কি ভাবে কোন্ কুটীরখানা তিনি কি ভাবে নিজে কুলীর মত খাটিয়া তৈরী করিয়াছেন,—এই সকল বিবরণ যখন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ খাওয়াশ আগন্তুক ভদ্রলোকদের নিকট বর্ণন করিতেছিলেন,

সেই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি কুটীরাভ্যন্তর হইতে লেখনী ছাড়িয়া উঠিয়া উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিতেই সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণত হইলেন।

বিনা দীক্ষায় শিষ্য

শ্রীযুক্ত মন্মথ বলিলেন,—বাবামণি, আমাদের কুলগুরু আছেন, তথাপি আপনার চরণেই দীক্ষাশ্রয় গ্রহণের আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন বাবা, দীক্ষা ছাড়া কি শিষ্য হওয়া যায় না? আমার দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা যত, তার চেয়ে অদীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা অনেক গুণ বেশী। তুমিও সেই রকম শিষ্যই থাক। আমি কি মন্ত্র জপ করি, কেমন ক'রে জপ করি, আমার আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ কি, তা' ত' আর কারোরই অজানা নয়। আমি গোপন ক'রে কোনো জিনিষই রাখিনি। আমার 'গুরুতা'য় Trade Secret (ব্যবসায়ীর গুপ্ততা) ব'লে কোনো জিনিষ নেই। আমার ফটোখানার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌বে,—"মশাই আপনার মন্ত্র নিচ্ছি।" ব্যস। তারপর থেকে অবিরাম নাম-সাধন ক'রে যাও। আমার কাছ থেকে দীক্ষা না নিয়েও তুমি আমার শিষ্য এভাবে হ'তে পার। কাণ পাক্‌ড়ে নিয়ে মন্ত্র না দিলেই শিষ্য হ'তে পার্ব্বে না, এমন ত' নয়!

আগন্তুকদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দীক্ষা নিবেন না, অথচ শিষ্য হবে, এ কেমন কথা বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বাইরে বাবা বড়ই রোদ, এস আশ্রমের ভিতরে এস ব'স, একটু প্রসাদ পাও, জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপরে সব বল্‌ব।

দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য

সকলে আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলে এবং প্রসাদ পাইলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—দীক্ষা জীবনের এক পরম সংস্কার। কিন্তু সেই সংস্কারের মানে কি? মৃতের উপরে কাষ্ঠ-সংস্কারে যেমন শবদেহের বিনাশ ঘটে, দীক্ষারূপ সংস্কারে তেমন কামনা-বাসনা-রূপ পূতিবস্তুতে আচ্ছন্ন আত্মার কদর্য্যতা দূর হয়, আত্মা শুদ্ধ নিষ্পাপ এবং স্বভাব-প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে যে পূর্ব্বসংস্কারের বিলোপ সাধন, তারই জন্য দীক্ষা-গ্রহণ প্রয়োজন। কাণে একটা ফুঁ নিয়ে কোনও প্রকারে লোকাচারের অনুবর্ত্তনের জন্যই দীক্ষা-গ্রহণ নয়। কথায় বলে,—দীক্ষা না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তার মানে হচ্ছে এই যে, মনের ময়লা কাটানই হচ্ছে দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য। দীক্ষার বলে যার মনের ময়লা কেটেছে, তার হাতের জল সকল শুভ কার্য্যে সিদ্ধবস্তু। দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মনের ময়লা কাটান,—লোক দেখান শিষ্য হওয়া নয়।

আমার প্রতিচিত্রই আমার প্রতিনিধি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মুখ থেকে অখণ্ড-মন্ত্র শুনে নিলে তোমার যে উপকার হবে, আমার নিজেরই আদেশ এই যে, আমার প্রতিমূর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যদি সেই মন্ত্র নাও, তবে তাতেও তোমার সেই উপকারই হবে। আমার প্রিয় ভক্তদের জন্য এটা আমার চিরন্তন অঙ্গীকার। দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই সীমাবদ্ধ দেহে বদ্ধ থেকে আমি আমার অনন্ত অসীম সত্তাকে আমার প্রত্যেক অনুরাগী জনের নিকটে নিয়ে হাজির কর্ত্তে পাচ্ছি না যে, সকলের কাণে এই জড়রসনায় উচ্চারণ ক'রে অখণ্ড-নাম প্রবেশ করাই। অথচ আমার প্রাণের সাধ, তিন ভুবনে একটী প্রাণীও যেন অখণ্ড-নামের মঙ্গল-মধু থেকে বঞ্চিত না থাকে। জোর ক'রে কাউকে আমি মহামন্ত্রের সাধক কর্ত্তে চাই না, কিন্তু প্রাণে যার রুচি আছে, যে মহামন্ত্রের সাধন কর্ব্বে, সে যেন কোনও কালে কোনও যুগে আমার পার্থিব দেহের অনুপস্থিতির দরুণ নিজেকে এই মঙ্গলমধু থেকে বঞ্চিত দেখে ব্যথিত না হয়। এজন্যই আমার নির্দ্দেশ এই যে, অখণ্ড-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে সাধক জীবন গ্রহণের পক্ষে যখন প্রয়োজন উপস্থিত হবে, তখন আমার যে কোনও প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিচিত্রই আমার পরিপূর্ণ প্রতিনিধি।

অদীক্ষিত শিষ্য দ্বারা গুরুর অমরত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন কুদিন আস্‌তে পারে, যেদিন মানবদেহধারী একজন ব্যক্তিও এই জগতে আমার প্রতিনিধিরূপে পবিত্র ওঙ্কার-মন্ত্র প্রচার কর্ব্বেন না। সবাই হয়ত নিজেকে প্রধান ক'রে, দেশ-প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিজের গুরুত্বকে দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদের সমক্ষে উপস্থিত ক'রে নিজে পরব্রহ্মের সাথে অভেদরূপে পূজা পাবার বাসনা নিয়ে সঙ্কীর্ণ এক সাম্প্রদায়িক পরিবেষ্টন সৃষ্টি ক'রে অপর দশজন সমসাধন-প্রচারকদের সাথে কলহ সৃষ্টি কর্ব্বে। দীক্ষাদাতা হ'য়েও আত্মবিলোপ ক'রে নিজের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের হিতের কাছে, জগতের হিতের কাছে, পরমোৎকৃষ্ট আদর্শবাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বলিদান ক'রে চলার মানুষ যদি জগতে না থাকে, তখন কি অখণ্ড-দর্শন প্রচারক এবং সাধকের অভাবে এই অখণ্ডবাদ জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ধুয়ে মুছে যাবে? নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। আমার প্রতিচিত্র বা প্রতিমূর্ত্তিও যদি জগতে না থাকে, তাহ'লে তখন নবযোগ-নির্ম্মাতা মহাসাধক তপস্বী আমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্পণ ক'রে ওঙ্কাররূপী অখণ্ড-মন্ত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে নূতন আধ্যাত্মিক ধর্ম্মপ্লাবনে জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ড পরিপ্লাবিত কর্ব্বেন।

আমার অমরত্ব আমার দীক্ষিতানুদীক্ষিত শিষ্যের দ্বারা না হ'য়ে অদীক্ষিত শিষ্যের ভিতর দিয়ে এভাবে স্বীকৃত হবে।

দীক্ষাদানের উত্তরাধিকারী

শ্রীযুক্ত মন্মথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এমন কি হ'তে পারে না যে, দেশ-কাল-পাত্র বিচার ক'রে আপনি হয়ত কাউকে ভবিষ্যতে আপনার প্রতিনিধিরূপে সকলকে দীক্ষাদানের অধিকার দিয়ে যাবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুব হ'তে পারে। তা' অস্বাভাবিকও হবে না। সেই সুপাত্র এলে সে তার যোগ্য অধিকার যথাকালে পাবে। কিন্তু এই নশ্বর দেহের দীর্ঘকাল অস্তিত্বের বিশ্বাস কি? মৃত্যু দূরে নয়, এই কথা ভেবেই ত' কাজ কত্তে হয়।

ভদ্রলোকেরা প্রস্থান করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি ঘণ্টা তিনেক কৃষি ক্ষেত্রের কার্য্যাদি তত্ত্বাবধান করিলেন। কতকগুলি নূতন ফুলের কৃষি হইতেছে, যাহাদের উৎকৃষ্ট বীজ ভারতবর্ষে উৎপাদন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কোনও নার্সারীওয়ালা সমর্থ হন নাই। সেই সকল বিষয় নিয়াই গবেষণা চলিল।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। মধ্যে একবার ধ্যান-উপাসনাদির জন্য গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পত্রই লিখিলেন। কয়েকখানার আংশিক অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সংখ্যাল্পতা ও সাম্প্রদায়িক শক্তি

ঢাকা-শিলমান্দি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংখ্যা দ্বারা সম্প্রদায়ের বল অনুমান করা চলে না। প্রত্যেকটী ব্যক্তি যেখানে আদর্শপরায়ণ, অনিন্দক, আত্মহিতৈষী এবং পরোপকারী, প্রত্যেকটী ব্যক্তি যেখানে সাধক, সচ্চরিত্র, তপোদ্যমপরায়ণ এবং সত্যানুসন্ধী, প্রত্যেকটী ব্যক্তি যেখানে ঈশ্বরানুগত, অকুতোভয়, নিষ্ঠাবান্ এবং সৎকর্ম্মপরায়ণ, প্রত্যেকটী ব্যক্তি যেখানে আত্মবিলোপ-সমর্থ, উগ্র ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির প্ররোচনা হইতে মুক্ত, ঐক্যবুদ্ধিসম্পন্ন এবং নেতার বাক্য প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রত্যেকটী ব্যক্তি যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিগত-স্বার্থকে সমধিক বহুমানন করে, সাময়িক হিত অপেক্ষা ভবিষ্যৎ কুশলকে অধিকতর শ্লাঘ্য জ্ঞান করে, ভবিষ্যতের কুশলকে আয়ত্ত করিবার জন্য বর্ত্তমানে চূড়ান্ত দুঃখ, দুর্দ্দশা, দুর্গতিকে বরণ করিয়া লইতে দ্বিধায় কুণ্ঠিত হয় না,—সেখানে সংখ্যাল্পতা কোনও গুরুতর বিপদের কারণ হইতে পারে না।

একলা চল্ রে

"আর, মহৎ ব্রতের ব্রতী ও মহান্ পথের পথিকদিগকে ত' মা প্রায়ই একাকী পথ চলিতে হয়। দল বাঁধিয়া পথ চলা

কয়জন সৎপথাশ্রিতের ভাগ্যে ঘটে? আর দল বাঁধিতে গেলেই অনেক সময়ে নানাবিধ জটিলতা আসিয়া সাধন-জীবনে প্রবেশ করে। নিজের ধ্রুবতারাকে সমক্ষে রাখিয়া একাগ্র মনে একান্ত প্রাণে অবিরাম অবিশ্রাম আদর্শের অনুধ্যানে পথ চলার আনন্দ এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর। সহস্র সহস্র সঙ্গি-সাথী-সহ জয়ধ্বনিমুখরিত রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া চলিবার আনন্দ হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। যাঁহারা সাধনরসের আস্বাদন পাইয়াছেন, জনকোলাহলের জটিল আবর্ত্ত পরিহার করিয়া নীরব, নিথর, নিভৃত পথে চলিবার রুচি তাহাদের অপরিসীম। সাধন করিয়া যে রসের আস্বাদন পাইয়াছে, সেকথা সে-ই মাত্র বোঝে। তোমরা মা চতুর্দ্দিকে তাকাইও না। ক্ষুদ্র পল্লীতে একটী দুইটি অখ্যাতা নারী মঙ্গলময় অখণ্ড-নামের সাধন পাইয়াছ। নিজ নিজ সাধনে তোমরা একাগ্র, একনিষ্ঠ, একমুখ হও। নিজ নিজ সাধনের মধ্য দিয়া নামের অমৃতরস তোমরা নিঙাড়িয়া লও। নিজ নিজ সাধনের মধ্য দিয়া তোমরা জীবন কৃতার্থ করিবার নিশ্চয়তা বাহির করিয়া লও। জগৎ জুড়িয়া সকল প্রাণীকে ডাকিয়া আনিয়া সাধনের অমৃততরু-তলে জড় করিবার সময় যখন আসিবে, তখন তাহা করিও। এখন একাকিনী পথ চলিয়া অমা-নিশীথিনীর চক্রব্যূহ ভেদ কর, অন্ধকারের ভিতর হইতে কিরণের আকর পরমজ্যোতিকে খুঁজিয়া বাহির কর। আপনা আপনি যতদিন পর্য্যন্ত মধুলুব্ধ

ভৃঙ্গবাহিনী না আসিয়া জুটিবে, ততদিন সঙ্গিবৃদ্ধির পথে না তাকাইয়া একলাই নিজের সাধন-পথে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় চলিতে থাক।"

প্রতি অনুপলে নাম-সেবা

ঢাকা-বনগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রত্যেকটী বিগত দিন অপেক্ষা প্রত্যেকটী আগত দিনে তোমাদের নামে রুচি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, গত গত মুহূর্ত্তগুলি অপেক্ষা প্রত্যেকটী আগামী মুহূর্ত্তে তোমরা অধিকতর অনুরাগের সহিত অমৃতময় অখণ্ডনামের সেবা করিতে সমর্থ হও। প্রত্যেকটী পল, বিপল, অনুপলকে পরিপূর্ণ সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও। একটী নিঃশ্বাসের বা একটি প্রশ্বাসের বায়ুকেও তোমরা নাম-গর্ভ না করিয়া বন্ধ্যা বহিতে দিও না।

দিবসের ভিতরে শতাব্দীর সমাবেশ

"আমি চাহি, তোমাদের একবার নামোচ্চারণের ফলে অন্য ব্যক্তিদের শত-সহস্র-লক্ষ-কোটি বার নামোচ্চারণের কাজ

হইয়া যাউক এবং একটী দিনের নামের সেবায় শত শতাব্দীর সেবার ফল আয়ত্ত হউক। মনকে কেন্দ্রীভূত কর। আতসী কাচের কেন্দ্রস্থলে সমীকৃত হইয়া যেমন সূর্য্যের বিক্ষিপ্ত কিরণ অনায়াসে অগ্নি সৃষ্টি করে, তেমনি তোমার বিক্ষিপ্ত মনের সহস্রমুখ যোগ এক স্থানে কেন্দ্রীকৃত হইয়া এমন ঘনীভূত অনুরাগের সৃষ্টি করুক, যাহাতে একটি দিবসের ভিতরে শত শতাব্দীর সাধনা, একটী নিমেষের ভিতরে লক্ষ যুগের তপস্যা আসিয়া স্থান লইতে পারে। প্রেমের গভীরতার মহিমায় তোমার একটী নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়া যেন নিখিল জগতের কোটিবার সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং একটী প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া যেন নিখিল জগতের কোটিবার প্রলয়ের আলেখ্য অনায়াসে পরিদৃষ্ট হয়।

নাম-সেবার ফল

"ভগবানে শুদ্ধা ভক্তিই নামের সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় শুভফল। তাঁহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারাই জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা। নামের সেবায় অনিত্যাভিনিবেশ হ্রাস পায়, নিত্যে রুচি বর্দ্ধিত হয়। নাম বহির্ম্মুখ মনকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া তোমার প্রকৃত স্বরূপের সহিত তোমার পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেয়। এই জন্যই নামের মত বন্ধু নাই, নামের মতন আপন নাই।"

আশীর্ব্বাদ ও পুরুষকার

ঢাকা ফরাসগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশীর্ব্বাদ অনুক্ষণ করিতেছি যে, তোমার মন যেন অবিচ্ছেদে পরম মঙ্গলময় নামে ডুবিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমি যেমন আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমিও তেমন নিজের পুরুষকার প্রয়োগ করিও। আশীর্ব্বাদ যদি অকপট হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না, কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদকে নিজের জীবনে পরিপূর্ণরূপে সার্থক করিবার জন্য যদি থাকে একনিষ্ঠ শ্রম, তাহা হইলে উহা হয় চিরস্থায়ী। তোমার নামে রুচি আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং তাহার ফলে রুচি তোমার হইবেও; কিন্তু যাহাতে এই রুচি তোমার পরিপূর্ণরূপে লাভ হয়, তজ্জন্য সজ্জন-সঙ্গ, নামের রুচিবর্দ্ধক স্বাধ্যায় এবং নামের উদ্দীপনকারক কীর্ত্তন প্রভৃতির জন্য তোমার যথেষ্ট পুরুষকারেরও প্রয়োজন।

নামের সেবা ও জীবনের সার্থকতা

"নামে যে লাগিয়া থাকে, তাহার জীবন কখনই বিফলে যাইতে পারে না। নামে যে নির্ভর করে, তাহার সকল অপূর্ণতা নামের মহিমায় দূরীভূত হয়। নাম দুর্ব্বলতাকে

সবলতা দেয়, অবশকে স্ববশ করে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মুখ ভার করিও না। নামে লাগিয়া থাক, নামই তোমার জন্য মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া দিবে।"

দাম্পত্য জীবনে ঈর্য্যা ও প্রেম

ঢাকা তরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বলা হইয়া থাকে যে, ভালবাসা হইতেই ঈর্ষ্যা জন্মে। কিন্তু ঈর্ষ্যাকে যদি অঙ্কুরেই বিনাশ করা যায়, তাহা হইলে সে বাড়িতে বাড়িতে এমন মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করে যে, ভালবাসাকে সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া আর ছাড়ে না। স্বামি-পত্নীর ভালবাসার মাঝখানে যদি আবার ঈর্ষ্যার জন্য কিছু স্থান ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অচির-কালমধ্যে ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত হইয়া যায় এমন কি ধ্বংসদশাও প্রাপ্ত হয়। শুধু স্ত্রীটীকে লইয়াই স্বামীটীর জগৎ নহে এবং শুধু স্বামীটীকে লইয়াই স্ত্রীটীর জগৎ নহে। এদেশের নারী আত্মসমর্পণের যুগযুগানুক্রমিক চেষ্টার ভিতর দিয়া স্বামীতে আত্মবিলোপের অনুশীলন করিয়া থাকিলেও জগতে আরও পুরুষ নিশ্চিতই থাকিবে, যাহাদের সহিত তাহার প্রীতিপূর্ণ সদ্ভাব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেখানে ভালবাসার দাবী এই যে, একমাত্র স্ত্রীটী ছাড়া জগতে স্বামীর

অথবা স্বামীটিকে ছাড়া জগতে স্ত্রীর অপরের সহিত সদ্ভাবপূর্ণ স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক থাকিবে না, বুঝিতে হইবে, সেখানে ভালবাসার ভিতরে ঈর্ষ্যা প্রবেশ করিয়াছে এবং পবিত্র দাম্পত্য প্রেমকে শতছিন্ন করিয়া বিনষ্ট করিবার জন্য মূষিক-দংশন শুরু হইয়া গিয়াছে। অথবা মূষিক-দংশন বলিলে কম বলা হইবে, কেন না, মূষিক-দংশনে সেই জ্বালা কোথায়, যেই জ্বালা বৃশ্চিক-দংশনে জন্মিয়া থাকে? স্বামী এবং স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে এমন একটি পার্থিব রূপ আছে যেই রূপটি লইয়া স্ত্রীর বা স্বামীর ভালবাসা অপর পুরুষে বা অপর নারীতে পড়িতে পারে না, পড়িতে গেলে তাহা সামাজিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়া দোষাবহ ও নিন্দনীয় হয়, যাহাকে ধর্ম্মতঃ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু সহজ সরলতায় জগতের সকলের প্রতি নিষ্কাম নিঃস্বার্থ অভিসন্ধি-বর্জ্জিত অনাবিল ভালবাসাকে প্রসারিত হইতে বাধা দিবে যেই দাম্পত্য প্রেম, তাহা যে ঈর্ষ্যা-কলুষিত, এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমি গৃহস্থাশ্রমী কুলগুরুদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিষয় শুনিয়াছি, যাঁহারা সাধন-ভজনের ঐকান্তিক অভিনিবেশের দরুণ এই রক্তমাংসের জগতের উর্দ্ধে নিজেদের চেতনাকে তুলিয়া নিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া জাতি-কুল-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল বয়সের নর-নারীরা আধ্যাত্মিক আলোকের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাদের

চরণোপান্তে আসিয়া 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্র স্নেহ ধাবিত হওয়াতে ঈর্ষ্যা-কাতরা পত্নী নানাবিধ অনর্থ সৃষ্টি করিয়া স্বামীর ধর্ম্ম-প্রচারণার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। সন্তান-ভাবানুপ্রাণিত স্নেহ-বিকাশে যে স্থানে স্বামী তাঁর পত্নী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবেন, বলিতে কি হইবে না যে, এই স্থানে স্ত্রী তাঁর পরম স্নেহময়ী প্রেমকোমলা মূর্ত্তি পরিহার করিয়া ঈর্ষ্যাকাতরা প্রেতিনীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে? এইরূপ প্রেতিনীরা স্বামীদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কর্ম্মের গুরুতর বাধা এবং স্বামীদের অন্তরে শান্তির নির্ম্মম হত্যাকারিণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা নিজেদের ঈর্ষ্যার অন্ধতায় একটিবারও তাকাইতে অবসর পায় না যে, ঈর্ষ্যারই দরুণে ইহারা ইহকাল এবং পরকাল উভয়কাল হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। কিন্তু স্ত্রীর অন্তরে একবার ঈর্ষ্যার প্রবেশাধিকার ঘটিলে স্বামী যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহা দূর করিয়া দিতে পারিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত এজগতে অতি অল্পই বোধ হয় পরিদৃষ্ট হইয়াছে। স্বামী যদি জগতের সকল নারী-সম্পর্কে সহজ-প্রকট পবিত্র স্নেহকেও চাপিয়া রাখিয়া কন্যা, ভগ্নী বা মাতৃস্থানীয়া রমণীদের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া চলেন, তবু তাঁর ঈর্ষ্যাকারিণী পত্নীর মনকে ইহার দ্বারা মানান যাইবে না।

স্বামী যদি স্বকীয় পত্নীর প্রতি স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার আতিশয্য প্রদর্শন করিয়া প্রতি পদে পত্নীর সন্তোষ এবং অনুমোদন লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকেন, তথাপি ঈর্ষ্যাপরায়ণা পত্নীর মন উঠিবে না। সর্ব্বতোভাবে দোষহীন, নিখুঁত, নিস্ত্রুটী-আচরণের মধ্য হইতেও ত্রুটীর সমুদ্র আবিষ্কৃত হইবে এবং আসল কথাটি গোপন রাখিয়া ঈর্ষ্যাবিকারগ্রস্তা পত্নী নকল ব্যাপার লইয়া দুর্ব্বোধ্য অশান্তি-সমূহের সৃষ্টি করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিরতিশয় প্রেমময়-স্বভাব স্বামীরও মন ক্রমশঃ বিচলিত হইয়া যায় এবং একদা যে পত্নীর প্রতি তাঁহার ভালবাসার অন্ত অবধি ছিল না, সেই পত্নীর প্রতি সমস্ত ভালবাসা আস্তে আস্তে কর্পূরের মত উবিয়া যায়। বজ্র-আঁটন করিতে গিয়া মন্দভাগ্যা রমণীরা এভাবে ফস্কা-গেরোর সৃষ্টি করে। কিন্তু এই অবস্থায় পড়িলে তোমরা কি সংসার ত্যাগ করিয়া এই মূর্খ রমণীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিবে? আমি বলি, ঈর্ষ্যাকাতরা মূর্খ রমণীদের শিক্ষা এভাবেও হয় না। চিতাশয্যা পর্য্যন্ত তাহারা ঈর্ষ্যার জ্বালা সঙ্গে লইয়া চলে এবং প্রকৃতই অপূর্ব্ব স্বামি-সোহাগের অধিকারিণী হইয়াও এভাবে তাহারা স্বামি-সোহাগে চিরবঞ্চিতা হয়। তোমাদের এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু ক্ষমার, শুধু সহিষ্ণুতার, শুধু অবিচার জীর্ণ করিবার ক্ষমতার, শুধু দুর্ব্বোধ্য উচ্ছাস-সমূহের মুখে, অনুত্তেজিত নীরবতার। ভগবান্ সকলের ললাটেই পত্নীর অনাবিল

ঈর্ষ্যাবর্জ্জিত প্রেমের সুখ লেখেন না, সুতরাং বিধাতার বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়া দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যকে নতশিরে মানিয়া লওয়া ছাড়া তোমার পক্ষে গৌরবকর আর কিছুই নাই। পাশ্চাত্যেরা এই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই পন্থা তোমাদের জন্য কোনও সময়েই নহে, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ক আইন কখনও বিধিবদ্ধ হইয়া গেলেও না।"

স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা ও তাহার নিত্যত্ব বিধান

ময়মনসিংহ গচিহাটা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে আর স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে। ইহা উত্তম এবং ইহা না ঘটিলে সংসার-বাস হিংস্র-জন্তু-সমাকুল অরণ্যে বসতির ন্যায় ক্লেশকর হইত। কিন্তু এই টুকু ভালবাসাই কি জীবনের সার্থকতা? স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে কিন্তু স্বামী চিরকাল রহিল না। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে কিন্তু স্ত্রী চিরকাল রহিল না। একজন অপরজনকে ফেলিয়া পরপারের ডাকে আগে-ভাগেই চলিয়া গেল। তখন তোমার ভালবাসা কাহাকে আশ্রয় করিয়া কল্প-লতিকার মত কেবলই বর্দ্ধিত হইবে? চক্ষের সমুখে যে মরিয়া গেল, যাহার নশ্বর

দেহ নিজ হস্তে আগুন ধরাইয়া দগ্ধ করিয়া দিয়া আসিলে, তাহাকে লইয়া অতঃপর ভালবাসার অনুশীলন আর কি করিয়া চলিবে? অথচ অন্তর তোমার নিয়তই প্রেম-লিপ্সু প্রেম-ভিখারী। এই সকল ভাবিয়া, চোখের উপরে দেখিয়া, অন্তরে বুঝিয়া তোমাদের প্রাণের ভালবাসাকে নিত্য বস্তুর উপরে নিক্ষেপ কর। অনিত্যকে ভালবাসিয়া ভালবাসা অনিত্যই রহিয়া যায়, নিত্যকে ভালবাসিয়া ভালবাসা নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। ভালবাসাই তোমার স্বভাব কিন্তু এ ভালবাসার নিত্যত্ব-বিধান তোমার সাধনা। তোমার স্বভাবে এবং সাধনায় ঐক্য স্থাপন কর। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে এই বিষয়ে অবহিত হও। দেখিবে, সংসার কেবলই জঞ্জাল নহে, সংসারের অনিত্যতার মধ্য দিয়াও নিত্যসুখের উদয়কল্পে নানা অপার্থিব হেতুর উৎপত্তি ঘটিতে পারে। স্বামী হইয়া স্ত্রীর সমক্ষে আসিয়াছ, আর স্ত্রীর কোমল-পেলব দেহলতাকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তরে নানা বিচিত্রতাময় সুখ-তরঙ্গের আস্বাদন করিতেছ, ভালবাসার স্বরূপ ইহাই নহে। স্ত্রী হইয়া স্বামীর সমক্ষে আসিয়াছ আর স্বামীর সোহাগে বিহ্বল হইয়া তাহার পুরুষোচিত সামর্থ্যের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি দিতে দিতে নিজের অন্তরে কত কোমল, কত মধুর নানা রঙ্গরসের আস্বাদন পাইতেছ, ভালবাসার স্বরূপ ইহাই নহে। যাহাকে ভালবাসিলে, ইহপরজীবনে তাহার সহিত অন্তরের সম্বন্ধ আর কখনও বিচ্ছিন্ন হইল না, জনমে জনমে এই প্রেমের আর ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, বিলয় নাই,

উত্তরোত্তর অনিবার বৃদ্ধি ব্যতীত ইহার অন্য কোনও পরিণাম নাই, অনন্ত বৃদ্ধির পথে অসীম এই প্রেম অবিরাম দ্রুততর পদক্ষেপেই কেবল চলিতে থাকে,—এইরূপ নিত্য প্রেমের সম্পদ কি তোমাদের আহরণ করিতে হইবে না?"

ভগবচ্চিন্তন ও পরোপকার

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ময়নাগুড়ি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুর্লভ মনুষ্য-জন্মকে ভগবচ্চিন্তন এবং পরোপকারের মধ্য দিয়া কি ভাবে সার্থক করিতে পার, সমগ্র লক্ষ্য নিবদ্ধ কর সেই দিকে। মনকে বিষয়ের ঊর্দ্ধে রাখিয়া বৈষয়িক কর্ত্তব্য পালন করিও। এবং সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিহার করিয়া অনাসক্ত প্রেম দিয়া জগৎকে সেবা বিতরণ করিও। বিষয়-লিপ্ততাই পরম দুঃখের কারণ এবং আসক্তিই সাক্ষাৎ নরক-যন্ত্রণা, জানিও।

সৎকথার মৃত্যু নাই

কুমিল্লান্তর্গত মেড্ডা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে কোনও সৎপ্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় না, কোনও সাধু চেষ্টাই মাঠে মারা যায় না। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অসতী নারীকে পুরুষান্তরে অনুরাগ বর্জ্জন করিয়া

নিজ স্বামীতেই আত্যন্তিক অনুরাগ অর্পণের উপদেশ দিয়াছিলাম, তখন সে সেকথা না মানিয়া নিলেও দশ বৎসর পরে সে এই উপদেশাবলীর যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া পুনরায় স্বপথে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। ১৩২৯ সালে যাহাকে পত্র লিখিয়া সাবধান করিয়াছিলাম যে, যৌবনের সুলভ উত্তেজনায় প্ররোচিত হইয়া পতনের অতল গহ্বরে ডুবিও না, ১৩৩৯এ না হউক, ১৩৪৯এ হইলেও সে তাহার ভ্রম বুঝিবে এবং সেই অত্যন্ত বিলম্বেও নিজের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা পাইবে। কয় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যঋষি উপদেশ করিয়াছিলেন,—'মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্'—'পরের ধনে লোভ করিও না',—এতদিন মানব-জাতি সে শুভকথায় কর্ণপাত করে নাই, কিন্তু ঠেকিয়া, ঠকিয়া, বহুল রুধিরস্রাবে কাতর হইয়া একদিন না একদিন একথার মর্য্যাদা রাখিতে বদ্ধপরিকর হইবেই। বিশ্ব জুড়িয়া তখন ধ্বনি উত্থিত হইবে,—'বল ভাই, শান্তি আসিবে কিসে?' সৎকথার মৃত্যু নাই, এই সত্যে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া জগতের সর্ব্বসাধারণের কর্ণে অবিরাম অবিশ্রাম হিতবাণী শুনাইয়া যাইতে থাক। মনে রাখিও, কথা সকল সময়েই মুখের কথা মাত্র থাকে না, ভগবৎ করুণায় কখনও কখনও তাহা কামানের গোলা অপেক্ষা অধিকতর ওজোগর্ভ হয় এবং যত ক্ষীণকণ্ঠেই উচ্চারণ কর না কেন, সৎকথা একদিন না একদিন জগতের উপরে

আপন প্রভাব, প্রতিষ্ঠা ও প্রাণবত্তা প্রমাণিত করিয়া ছাড়িবে। নিজের অন্তরকে কলুষ-মুক্ত রাখিবার জন্য এবং অপরের চিত্তকে বিগতপাপ করিবার জন্য নিয়ত সৎকথার অনুশীলন কর। যার প্রয়োজন, তাকেও শুনাও,—'সৎ হও, সাধু হও,'—যার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, তাকে শুনাও,—সৎ হও, সাধু হও।' তাসের দুর্গ হাওয়ায় ধ্বসিয়া পড়ে, কিন্তু কথার দুর্গ বজ্র-পতনেও পতিত হয় না, যদি কথার পশ্চাতে থাকে অকপট সর্ব্বজীবহিতৈষণা।"

দুষ্কৃতির সঙ্গীদের পরিচয় অস্বীকার কর

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত হাড়মাসরা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতীত জীবনের পাপকে, স্মৃতিকে চিরজাগরূক করিয়া রাখার মত মূর্খতা আর কিছুই নাই। পাপের শাস্তি এবং দুঃখ চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য পাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হও। অতীতের অনুষ্ঠিত অপকার্য্য-সম্পর্কে তোমার করণীয় মাত্র অতটুকুই। পাপের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সহিত পরিচয় রক্ষা করিয়া চলিবার মত বিপদও জগতে আর কিছু নাই। যে যাহার সহিত সংসর্গ রক্ষা করে সে তাহার সহিত পাপানুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করিবে, ইহাই

শতকরা পঁচানব্বই স্থলে স্বাভাবিক। অথবা পঁচানব্বই-ই বা বলি কেন, 'শতকরা নিরানব্বই স্থলে' বলিলেও খুব ভুল বলা হইবে না। একদা অবিবেকী প্রমত্ত মন যাহার সাহচর্য্যে তোমাকে দিয়া অকাণ্ডের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, আজ পুনরায় দুর্ব্বল মন যে তাহার সাহচর্য্যে তাহা অপেক্ষাও ঘোরতর, জঘন্যতর নিকৃষ্টতর দুষ্কৃতির অনুশীলন করাইবে না, তাহা তুমি কি করিয়া বলিতে পার? মানুষের চরণ অভ্যস্ত পথেই বিনা দ্বিধায় বিচরণ করে, পরিচিত পথেই বারংবার গমনের প্রবৃত্তি তাহার হইয়া থাকে। এমন কি, অভ্যাসের ফল এমনই মারাত্মক যে, কোন্‌দিকে চলিতেছে কি না চলিতেছে, সেই হিসাব শুরু হইবার অনেক পূর্ব্বে পদদ্বয় পূর্ব্বানুসৃত পথে এতটা অগ্রসর হইয়া যায় যে, তখন আর প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও মানে থাকে না, অথবা তখন প্রত্যাবর্ত্তন কোনও ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই কারণেই একদা যাহার বা যাহাদের সহিত দুষ্কৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহাদের সহিত পরিচয় রক্ষার দায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কর। মুখামুখি পড়িয়া গেলেও তাহাদিগকে চিনিতে অস্বীকার কর। পত্র, বাক্যালাপ বা সামাজিক ব্যবহারের মধ্য দিয়া যাহাতে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার লেশমাত্র না রাখিতে হয়, তদ্বিষয়ে সচেতন এবং সতর্ক হও। হাসিয়া আসিয়া কথা কহিলে মুখ ফিরাইয়া অপর দিকে চলিয়া যাও, ভ্রমেও হাসিয়া কথার জবাব দিও না।"

স্বামিধর্ম্ম ও পতিতার পুনরুদ্ধার

নদীয়া জেলান্তর্গত মুন্সীগঞ্জ-নিবসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিপথগামিনী স্ত্রী ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, আশ্রয় চাহিতেছে,—এক্ষেত্রে তোমার পক্ষে ক্ষমা এবং আশ্রয়দান এক সুমহৎ কর্ত্তব্য। প্রতিহিংসা-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মন্দভাগ্যা রমণীকে জগতের দুর্য্যোগময়ী প্রবাহিনীর জটিল আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া আত্মপ্রসাদ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এই সময়ে তোমার স্বামি-ধর্ম্মের অনুগত হইবে না। নারী-ধর্ম্ম যদি পাতিব্রত্যের মহিমা অনন্তকাল কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তোমাদের স্বামি-ধর্ম্মও তাহা হইলে স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া তাহাকে নিজের ভ্রম নিজে বুঝিয়া আত্ম-সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিতে একান্তই বাধ্য, জানিও। স্বামীর বশে থাকিতে অস্বীকৃতা হইয়া বহু নারী বহু যুগে চির-সম্মানের আশ্রয় স্বামীর ভিটা ত্যাগ করিয়া ভাগ্যদেবতার অনুসরণে গিয়া চরম দুর্ভাগ্য এবং পরম দুর্গতি অর্জ্জন করিয়াছে,—ফিরিয়া আসিবার সাহস কেহই পায় নাই। আজ যুগের ধর্ম্মে ভ্রান্তা রমণীরা অপার দুঃসাহসে ভর করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথ কেহ কেহ খুঁজিতেছে। তোমরা ক্ষমাহীন রূঢ়তায় তাহাদের ফিরিয়া আসিবার অতি সঙ্কীর্ণ পথটুকুকে রুদ্ধ করিয়া দিও না। উহা তোমাদের সামাজিক ধর্ম্ম হইলে হইতে পারে, কিন্তু স্বামি-

ধর্ম্ম হইবে না। সমুদ্রের মত বিশাল এবং আকাশের মত উদার অন্তর লইয়া আশ্রয়-প্রার্থিনী শফরী-মৎস্যকে এক কণা আশ্রয় দিয়া তাহাকে প্রেতিনীর জীবন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানুষের জীবন যাপনের সুযোগ তোমরা দাও। তবে একটি কথা। পুনরাশ্রয় দিবার কালে নিজের অন্তরকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিও যে, যে রমণী একবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তোমার প্রণয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিল, তাকে ফিরিয়া ঘরে আনিবার কালে সঙ্গোপনে তোমার মনে ইন্দ্রিয়-লালসাই ত' প্রবল ভাবে শাখায়-প্রশাখায় বাড়িবার চেষ্টা করিতেছে না? যাহা করিবে, লালসা-বর্জ্জিত মন লইয়া করিও।"

স্বামি-পত্নীর পারস্পরিক সন্দিগ্ধতা

পাবনা জেলান্তর্গত হরিপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যকে বিশ্বাস করিবে না, ইহা অপেক্ষা মারাত্মক অবস্থা সংসারী-জীবনের পক্ষে আর দ্বিতীয় কিছু নাই। যাহাদিগকে ভগবান্ মিলাইয়া দিয়াছেন দেহে, মনে, প্রাণে আত্মায় সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইবার জন্য, যাহাদের পরস্পরের নিকটে পরস্পরের কোনও বিষয় অজানা

বা গোপনীয় নাই, যাহাদের দুই দেহ নিঃসঙ্কোচে মিলিয়া জগতে নূতন নূতন দেহধারীদের সৃষ্টি করিবে, যাহাদের মধ্যে একের কোনও আচরণই অপরের সমক্ষে লজ্জার বা দোষের নহে বলিয়া মনুষ্য-সমাজ মানিয়া লইয়াছে, যাহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র গুপ্ততার দাবীর অধিকার নাই বলিয়াই যাহারা পরস্পর স্বামি-স্ত্রী নামে অভিহিত, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের মত এমন বিপজ্জনক অবস্থা আর কি হইতে পারে? প্রভু তাঁহার ভৃত্যকে বিশ্বাস করেন না, ভৃত্য তাহার প্রভুতে আস্থা রাখে না, রাজা তাঁহার প্রজার প্রতি সন্দিহান, প্রজাবর্গ রাজার সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে বিরুদ্ধ-ধারণা-সম্পন্ন, এই সকল অবস্থাই জগতে কত নিদারুণ উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু স্বামী তাহার স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিহান, আর স্ত্রী তাহার স্বামীর সচ্চরিত্রতার আস্থাহীনা,— এর চেয়ে দুর্দ্দৈবজনক ঘটনা মনুষ্য-সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না।"

দাম্পত্য সন্দিগ্ধতার কারণ

"অনেক সময়ে এই সন্দিগ্ধতার সৃষ্টি হয় অসতর্ক আচরণ হইতে, যেই আচরণের পশ্চাতে কোনও মন্দ অভিপ্রায়ই হয়ত ছিল না, কিন্তু ঘটনাবশে মন্দ ধারণার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। অনেক সময়ে এই সন্দিগ্ধতা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী কিম্বা স্ত্রীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি-ঘটিত কল্পিত ধারণার ফল ছাড়া

আর কিছুই নহে। অনেক সময়ে এই সন্দিগ্ধতা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিম্বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগের অত্যধিক উচ্ছ্বাস হেতু উপজাত হইয়া থাকে, যদি সেই অনুরাগ সদ্বিবেচনার দ্বারা প্রগাঢ় এবং সংযমের দ্বারা ঘনীভূত না হইয়া থাকে। চপল চঞ্চল তরল অনুরাগই অতি সহজে ঈর্ষ্যার ভিতর দিয়া অবিশ্বাসকে আবাহন করে। অনেক সময়ে এই সন্দিগ্ধতা পৈতৃক বা মাতৃক আচরণের অজ্ঞাতসার অনুকৃতি মাত্র, এবং প্রথমতঃ ইহা প্রীতিপ্রদর্শনের 'ফ্যাসান' মাত্র থাকে এবং পরে ইহা বাড়িতে বাড়িতে বদ্ধমূল অবিশ্বাসের মূর্ত্তি ধরে। কিন্তু একার প্রতি অপরের সদা-সন্দিগ্ধতার সর্ব্বপ্রধান কারণ জানিবে, ব্যক্তিগত অন্ধ স্বার্থপরতা।

দাম্পত্য জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা

"স্বামীর মনের ভাব যেখানে এইরূপ যে, 'স্ত্রী ত' আমার নিজের সুখ-সম্পদনের জন্য; আমার তৃপ্তি, আমার আনন্দ যোগাইবার জন্যই ত' সে মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া বধূ-বেশে আমার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে; আমার প্রতিটি রোমকূপে সে হর্ষের বন্যা বহাইবে, ইহারই জন্য ত' তাহার নারীজন্ম গ্রহণ,' সেখানে স্ত্রীটীকে তাহার অপরাপর কর্ত্তব্য সম্পাদনে স্বামী ত' বাধা দিবেই। স্ত্রীর মনের ভাব যেখানে

এইরূপ যে, 'আমাকে যে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তা' কিন্তু আমাকে দাসী করিয়া রাখিবার জন্য নয়, বাহিরে আমি দাসীর মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার সেবার অভিনয় করিয়া গেলেও আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে চরম সুখ পরমতৃপ্তি দিতে তুমি একান্তভাবে বাধ্য বলিয়াই আমি বাহ্যতঃ দাসী সাজিয়াছি; বাহিরে সেবিকাই বল আর পরিচারিকাই বল, আমার তৃপ্তি, আমার সুখ, আমার আনন্দ আর আমার হর্ষ সম্পাদনই তোমার আসল কাজ, প্রকৃত কর্ত্তব্য; কাহারও কাছ হইতে যেই সুখ, যেই তৃপ্তি আমি পাইতে পারিব না, তুমি সেই সুখ, সেই তৃপ্তি আমাকে দিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়াই আমি তোমার স্ত্রীত্ব মানিয়া লইয়াছি,'—সেখানে স্বামীটীকে তাহার অপরাপর কর্ত্তব্য সম্পাদনে স্ত্রী ত' বাধা দিবেই। ব্যক্তিগত অন্ধ স্বার্থপরতাই যেখানে মূলমন্ত্র, সেখানে জগতের অন্য কোনও নারীর প্রতি ভ্রাতৃভাবে বা পুত্রভাবেও নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে স্বামী ব্রতী হইতে গেলে উহাও স্ত্রীর মনে নিবিড় সন্দেহের উদ্রেক করিবে, সেখানে জগতের অন্য কোনও পুরুষের প্রতি ভগ্নীভাবে বা মাতৃভাবে নিজ কর্ত্তব্য-সম্পাদনে প্রয়াসিনী হইতে গেলে উহাও স্বামীর মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করিবে। সন্দিগ্ধতা বা ঈর্ষ্যা কেবলই ভালবাসার ফল নহে, পরন্তু ইহারা অধিকাংশ সময়েই ঘোরতর আত্ম-পরায়ণতার ফল।

দাম্পত্য জীবন হইতে আত্ম-পরায়ণতার নির্ব্বাসন

"যেখানে স্বামীর জীবন স্ত্রীর সুখ সম্পাদনের জন্য, যেখানে স্ত্রীর জীবন স্বামীর সুখ-সম্পাদনের জন্য, জীবনের গোপনতম ইন্দ্রিয়লিপ্ততার ভিতরে যেখানে একজন নিজের সুখ, নিজের পরিতৃপ্তি বা নিজের হর্ষ কামনা না করিয়া অপরের সুখ, অপরের পরিতৃপ্তি বা অপরের হর্ষ কামনা করে, সেখানে সন্দিগ্ধতার বিন্দুমাত্র স্থান থাকিতে পারে না। বাঞ্ছিত স্বার্থপরতা যেখানে মরিয়াছে, প্রেমের শুরু সেইখানে। ইন্দ্রিয়গত মিলন-ঘটিত প্রেমকে যদিও প্রকৃত প্রেম বলিব না, কিন্তু যেখানে ইন্দ্রিয়গত মিলনটিও নিজের সুখের জন্য না হইয়া অপরের সুখের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া অন্তরে আগাগোড়া দৃঢ় প্রতীতি রহিয়াছে, সেইখানে দিব্য প্রেমের উষা-প্রকাশের অরুণচ্ছটা দাম্পত্য জীবনের ঘনান্ধকারচ্ছন্ন অকাশকে পূর্ব্বরাগে রঞ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিব। চেষ্টা করিয়া দেখ, কি করিলে তোমাদের জীবন হইতে আত্মপরায়ণতার নির্ব্বাসন হয়। আত্মপরায়ণতা যাহার গিয়াছে, তাহারই অন্তরের আকাশ চিরতরে মেঘমুক্ত হইয়াছে, জানিও। আত্মপরায়ণতা যতক্ষণ না যাইবে, ততক্ষণ শত উপদেশেও একে অন্যের মন হইতে সন্দিগ্ধতার কৃষ্ণমেঘমালা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে না।

"তুমি যদি নিজেকে ভগবানের একান্ত অনুগত সেবক জানিয়া তোমার স্ত্রীর ভিতরে পরমারাধ্য ভগবৎ-সত্তা রহিয়াছে বলিয়া ধ্যান চালাইতে থাক, এবং তোমার স্ত্রী যদি নিজেকে ভগবানের একান্ত অনুগত সেবিকা জানিয়া তোমার ভিতরে পরমারাধ্য শ্রীভগবানের বাস্তব উপস্থিতি রহিয়াছে বলিয়া ধ্যান করিতে থাকে, তাহা হইলে ইহাই ক্রমশঃ তোমাদের উভয়ের ভিতরে আত্ম-পরায়ণতার উচ্ছেদ সাধন করিবে। ভগবানই যে ভোগের কর্ত্তা, তুমি যে নহ, ভগবানই যে সেবা পাইবার মালিক, তুমি যে নহ, জগতের সকল জীবের সকল সাধনা যে ভগবানের চরণে তৃপ্তি, সুখ, আনন্দ পৌছাইয়া দিবার জন্য, নিজের নিকটে নহে, এই প্রতীতি অন্তরে জাগাও। দেখিবে, দুঃখময় সংসার মধুময় হইতে অধিক সময় লাগে নাই।"

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৩ই ভাদ্র, ১৩৪১

শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক ব্রহ্মচারীকে আশ্রমীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

উত্তম শিষ্যের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ্, রহিমপুর আশ্রমে যখন এলি, তখন দেহে, মনে, স্বাস্থ্যে বা উৎসাহে কোনো দিক্ দিয়েই তুই কোনো কাজের যোগ্য ছিলি না। তোর স্বাস্থ্যের

পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের হাতে আমি তোর তলপেটে দৈনিক একশ কলসি ক'রে জল ঢেলেছি। শরীর কঠিন শ্রমে অপটু এজন্য তোকে অন্য গুরুতর কাজ থেকে বিশ্রাম দিয়ে রান্নার অল্পশ্রমসাধ্য কাজ কত্তে পাঠিয়েছি। ব'লে গেলে সেই চিঠি-লেখা কিম্বা লেখা-চিঠির নকল করা ছাড়া কোনো গুরুতর মস্তিষ্ক-শ্রমের কাজও কখনো তোকে দিই নাই। কিন্তু আজ এখানে এসে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠানের প্রায় অধিকাংশ বৃহৎ কাজের দায়িত্ব এসে তোর উপরে পড়তে যাচ্ছে। তুই খুব উপযুক্ত, এজন্যই পড়তে যাচ্ছে, তা নয়। কিন্তু তুই লেগে আছিস্, অন্যেরা জলস্রোতের তৃণের মত ঘাটে কতক্ষণ লেগে থেকে আবার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এই একটা মাত্র কৃতিত্বের দরুণই তুই ধীরে ধীরে অপর সকল সহকর্ম্মীর উপরে নেতৃত্ব করার অধিকার পেতে যাচ্ছিস্। এসময়ে বাছা মাথাটা ঠিক্ রেখে চল্‌তে হবে। নতুবা পুনর্মূষিক হ'তে বেশী সময় লাগবে না। গুরুর কাজে কুণ্ঠাহীন আনুগত্যে দ্বিধাহীন নিষ্ঠায় মৃত্যুসঙ্কল্প দৃঢ়তায় আমৃত্যু লেগে থাকার পুরুষকারই উত্তম শিষ্যের লক্ষণ।

নেতার নিরভিমানতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে নেতা হবে, তার ক্রোধ আর অভিমান কম থাকা চাই। নিজের সম্মানজ্ঞান খুব প্রখর

থাক্‌লে, সে কখনো অনুজনদের পরিচালন কত্তে পারে না। আর অনুজনদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করার ক্ষমতা না থাকলে, কোনো অনুজন তোমাকে মানবে না, মানতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত্যের দিক্ দিয়ে তোমরা সকলে সমান,—প্রতিষ্ঠানের সেবা করার অধিকার তোমাদের প্রত্যেকের সমান, প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলকর্ম্ম-সমূহে আত্মদানের ব্যগ্রতা তোমাদের সকলের প্রায় সমান কিন্তু তবু একজন অপর ক'জনার নেতা হ'য়ে কাজ করে বা করায়। এই নেতৃত্ব তোমাকে যদি অহমিকার সিংহাসনে নিয়ে সমাসীন করে, জানবে তোমাকে পায়ে ধ'রে টেনে নামাবার লোকের অভাব হবে না। সহকর্ম্মীদের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যকে নিজের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ব'লে জ্ঞান না কত্তে পার, নিজেকে যদি সহকর্ম্মীদের প্রত্যেকের ভৃত্য ব'লে মনে না ক'ত্তে পার, তাদের সেবার জন্যই তুমি তাদের নেতা হ'য়েছ, তাহাদিগকে হুকুম দিয়ে কর্ত্তালি জাহির করার জন্য নয়, এই কথা যদি স্মরণে রাখ্‌তে না পার, তাহ'লে তোমার নেতৃত্ব পরিচালনের চেষ্টা একটা প্রহসনেই পরিণত হবে। নেতা তুমি ইচ্ছা করলেই হ'তে পার না, আমিও তোমাকে নেতা ব'লে Nomination দিলেই কেউ তোমাকে নেতা ব'লে গ্রাহ্য কর্‌বে না, যদি নেতার উপযুক্ত গুণাবলীর বিকাশ নিজের ভিতরে না কত্তে পার।

নেতার অযোগ্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক নেতা আছে, যারা খেঁকী কুত্তার দ্বিতীয় সংস্করণ। অনেক নেতা আছে, যাদের বিন্দুমাত্র ব্যক্তিত্ব নেই, বৈশিষ্ট্য নেই, ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি নেই, শুধু চেয়ারে ব'সে পায়ে তাল ঠুকে হুকুম দেওয়া ছাড়া আর কোনও কৃতিত্ব নেই। বিঘ্ন-বিপত্তি-দুর্য্যোগের সময়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অদৃষ্টে নির্ভর করা, আর যিনি অফুরন্ত বিশ্বাসকে ন্যস্ত ক'রে তোমাকে নেতার আসনে বসিয়েছেন, তাঁর বিশ্বাসকে পদাঘাতে হত্যা ক'রে ঘূর্ণী বায়ুর সাথে সাথে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চ'খ বুজে চলা,—এসব নেতার লক্ষণ নয়। সহকর্ম্মীদের ভিতরে অবিরাম প্রতি কর্ম্মে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা কত্তে অক্ষম হওয়া এবং তাদের হাতের পুত্তলিকা হ'য়ে উদ্দেশ্যহীন পথে যাত্রা করা,—এসব নেতার লক্ষণ নয়। বিপদের সময়ে কাপুরুষেরাও সাহসী নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, কিন্তু কু-নেতা বিপদের সময়ে আত্মবিহ্বলতায় অধীর হয় এবং যাদের প্রতি তার কর্ত্তব্যের দায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাদের প্রতিই উদাসীন বা উপেক্ষাশীল হয়। আমি চাই না যে, তুমি এরূপ কু-নেতা হও।

মঠ-আশ্রম প্রভৃতির নেতৃত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মঠ, আশ্রম প্রভৃতি

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের ন্যায় ভোটের জোরে মীমাংসিত হয় না। এই নেতৃত্ব আসে অকপট আনুগত্যের ভিতর দিয়ে। প্রতিষ্ঠান-প্রবর্ত্তকের প্রতি যাঁর আনুগত্য বেশী অকপট, নেতৃত্বের সেই বেশী যোগ্য। বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্য এস্থলে বড় কথা নয়, ষড়যন্ত্র-প্রিয়তার প্রশ্ন এখানে আসেই না, ভোট-সংগ্রহের পটুত্ব এক্ষেত্রে নিষ্ফল। এক্ষেত্রে একমাত্র সুফলপ্রদা হচ্ছে আত্যন্তিক অনুরক্তি এবং দ্বিধাহীন আজ্ঞাবহতা। আমার শিষ্যেরা এসে ভোট দিল, আর তুমি আমার পরিত্যক্ত সিংহাসনে বস্‌লে, এই মিথ্যা দুঃস্বপ্ন তোমরা একজনেও দে'খো না। আমার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সকলে মিলে বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে যার অধিকার নাকচ করেছে, আমি যদি দেখি, আনুগত্যে সে অতুলন, তবে আমার পার্থিব প্রতিনিধি সেই হবে, অন্য কেউ নয়।

নেতৃত্ব-প্রিয়তার বিপদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নেতৃত্ব প্রিয়তার বিপদ সব সময়ে স্মরণে রাখ। আজ তুমি নেতা, কাল তুমি নেতা নাও থাক্‌তে পার। নেতৃত্বের উপরে তোমার জীবনের সাফল্য নির্ভর করে না। তোমার জীবনের সাফল্য তোমার সেবকত্বে। নেতৃত্ব থাক কিম্বা যাক, সর্ব্বাবস্থাতেই তোমাকে সেবক থাক্‌তে হবে। সেবকত্ব নিরভিমানত্বের জনক, সেবকত্ব নিরন্তর আত্মপরীক্ষণের প্রণোদক, সেবকত্ব জগতের অনিত্যত্বের

স্মারক। নেতৃত্বপ্রিয়তা অভিমানকে স্ফীত করে, আত্মপরীক্ষায় রুচি-হ্রাস ঘটায় এবং এই অনিত্য জগৎকে নিত্য ব'লে ভ্রম জন্মিয়ে ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, কপটতা, আত্মপ্রাধান্য রক্ষণার্থে অসত্যাচারিতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয়। সুতরাং সর্ব্বদা সাবধান, নেতৃত্ব-প্রিয়তা যেন চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ কত্তে না পারে। নেতৃত্ব-প্রিয় ব্যক্তি অপর সমকক্ষ যোগ্য বা যোগ্যতর ব্যক্তির উপরে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ পোষণ কত্তে অন্তরের কাছে লজ্জিত হয় না, অপর নামে মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টিতে প্রতিবাদ করে না, বরঞ্চ নিজের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির সহায়ক হবে অনুমান ক'রে তাতে সুকৌশলে ইন্ধন যোগায়।

সর্ব্বপ্রযত্নে সেবক হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবকের সাথে সেবকের কখনো কলহ হয় না। এক প্রভুর দাসেরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে প্রভু যে প্রেমময়, তাঁর প্রেমকণাই যে জীবনের পরম-কাঙ্ক্ষিত, তাঁর কৃপাকণাই যে জীবনের চরম-বাঞ্ছিত, এই কথা সেবক কখনো ভোলে না। তাঁর কৃপার যে অধিকারী, সেও ভাগ্যবান্, তাঁর কৃপার যে প্রত্যাশী, সেও ভাগ্যবান্,—সেবকের চিন্তাধারা থাকে এইরূপ। তাই, এক সেবক অপর সেবকের সঙ্গকে সর্ব্বসুখপ্রদ জ্ঞান করে এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে সকলের প্রিয় পরমারাধ্যের গুণকীর্ত্তন ক'রে কৃতকৃতার্থ হয়। সেবকের এই

প্রেমসুখময় জীবনই শ্লাঘ্য, সুতরাং তোমরা সর্ব্বপ্রকার আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবক হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন কর।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ই ভাদ্র, ১৩৪১

পুপুন্‌কী গ্রাম হইতে মিশ্র পরিবারের জনৈক ভদ্রলোকে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিয়া বলিলেন যে, গ্রামে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু গ্রাম্য দলাদলির দরুণ সকলকে একজোট করা যাইতেছে না। যাহাতে সকলকে একতাবদ্ধ করিয়া নাম-কীর্ত্তনে রত করা যায়, তদ্বিষয়ে হিতোপদেশ চাই।

হরিনামে দলাদলি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশ দিব কি? আমি নিজে গ্রামে যাব এবং সকলকে ডেকে এনে একত্র কীর্ত্তনে রত ক'রে দিয়ে আস্‌ব। *

ভদ্রলোক কতকগুলি অসুবিধা এবং বিঘ্নের কথা নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরিনামকীর্ত্তনে আবার দলাদলি থাক্‌বে কেন? দলাদলি হ'তে হয়, সামাজিক অন্য

* কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীবাবামণি তাহা করিয়াছিলেন এবং দলাদলি ভাঙ্গিয়া পুনঃ সম্মিলিত কীর্ত্তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্যাপারে তা' হোক্। হরিনামে আপামর সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার। হরিনাম আপাপিষ্ঠ-সাধু-যতি সকলের নিত্য-সেব্য অমৃতস্বরূপ। ত্যাগীর পাশে দাঁড়িয়ে বিষয়ী, তপস্বীর পাশে দাঁড়িয়ে বিলাসী, সংযতেন্দ্রিয়ের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্ছৃঙ্খল, সত্যশীলের পাশে দাঁড়িয়ে মিথ্যাবাদী, পরার্থসেবীর পাশে দাঁড়িয়ে স্বার্থপর হরিনাম করুক,—কেউ কাউকে ঘৃণা কর্‌বে না, দ্বেষ কর্ব্বে না, বর্জ্জন কর্ব্বে না। হরিনাম জীবমাত্রেরই নিত্যতৃষ্ণার বারিস্বরূপ, নিত্যক্ষুধার আহারীয়-স্বরূপ, নিত্য অভাবের পূরণ-স্বরূপ। ধনী দাঁড়াক দরিদ্রের পাশে, গুণী দাঁড়াক নির্গুণের পাশে, বুদ্ধিমান্ দাঁড়াক নির্ব্বোধের পাশে, বিদ্বান্ দাঁড়াক নিরক্ষরের পাশে, মহতেরা দাঁড়াক পতিত জনার পাশে,—সকলে মিলে, ভেদাভেদ ভুলে এক তানে এক মনে সমস্বরে সমকণ্ঠে সমান প্রেমের প্রণোদনায় সুমধুর হরিধ্বনিতে নিজেরা মাতুক, জগৎ মাতাক। পারিবারিক, গ্রামিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার দলাদলি নামকীর্ত্তনের নর্ত্তন-রত চরণের তলে দলিত-মথিত হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক। শ্রীহরি সকলের, সবাই শ্রীহরির,—এই এক সুতীব্র বোধ থেকে সকলের সকল পার্থক্য-সম্পর্কিত জ্ঞান রহিত হ'য়ে যাক্।

সার্থক কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরিনামকীর্ত্তনে দলাদলি,

ভেদাভেদ, ছোট-বড়র বিচারবির্ত্তক কিছুই থাক্‌বে না, এই কথাটী যেমন দামী, তেমনি দামী আর একটী কথাও আছে। এইদিকে অহোরাত্র কীর্ত্তন ক'রে প্রতিবেশীদের শান্তিভঙ্গ কর্ব্ব চৌদ্দমাদলের উচ্চরবে, অন্যদিকে কীর্ত্তন শেষ হবার পরদিনই গিয়ে কেউ করব গণিকা-সঙ্গ, কেউ কর্ব্ব মদ্যপান, কেউ খেলব জুয়া, কেউ যাব ডাকাতি কত্তে, কেউ বা অসহায়া ভ্রাতৃবধূকে বলপূর্ব্বক কর্ব্ব নিজ শয্যায় আকর্ষণ, কেউ করব দলিল জাল, কেউ করব অসত্য-পথে ধনার্জ্জন,—এটা কখনো কীর্ত্তনানুরাগীর আদর্শ আচরণ হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রমুখ পুরুষোত্তমেরা ত' নামকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, কঠোর তপশ্চর্য্যার অনুশীলন ব্যতীত, যোগ-ধ্যান-সমাধির চর্চ্চা ছাড়াই সহজ পথে সাধারণ মানুষ অতি দ্রুত মনের মলিনতা পরিহার করার উপায় লাভ করুক। হরিনাম কীর্ত্তনে আমার নাম হ'ল, যশ হ'ল, সাময়িক আনন্দও খুব হ'ল কিন্তু চরিত্রের নীচতা গেল না, আচরণের হীনতা গেল না, অন্তরের কদর্য্যাসক্তি গেল না,—এই যদি হয় অবস্থা, তবে ত' কিছুই আমার হ'ল না। নামকীর্ত্তনে যারা যোগ দেবে, তারা এই সঙ্কল্প নিয়ে যেন আসে যে, জীবনের পাপাসক্তির বিলুপ্তি ঘটুক, দিব্য ভগবৎপ্রেমের উদয় হউক। লক্ষ্যহীন উদ্দণ্ড নর্ত্তনে মাংসপেশীর উন্নতি হ'তে পারে, অক্ষম দুর্ব্বল মনের এতে কোন্ লাভ? একজায়গায় একবার হরিনাম কীর্ত্তন হ'লে চতুর্দ্দিকে যেন

দলে দলে শুদ্ধচরিত দিব্য মানুষের দল মাথা তুলে দাঁড়ায়, এইটি চাই। কীর্ত্তন আমাদের সার্থক হওয়া চাই, বৃথা ভণ্ডামি না হয়।

নাম-কীর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—নামকীর্ত্তন যে সফল হয়, তারও প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায়। কীর্ত্তন সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনের উপর থেকে কামনা-বাসনার কর্ত্তৃত্ব লোপ পেতে থাকবে। অন্য সকলের অন্তরের ভক্তি-তরঙ্গের স্পর্শে নিজের অন্তরের শুষ্কতা দূর হ'তে থাক্‌বে এবং সুপ্ত ভক্তির ফল্গু-ধারা উচ্ছ্বসিত আবেগে দেহ-মনকে আপ্লাবিত কত্তে থাক্‌বে,—এইটি হ'ল নামকীর্ত্তনের সদ্যঃ এবং প্রত্যক্ষ সুফল। নামকীর্ত্তনের গৌণ ও বিলম্বিত ফল হচ্ছে, যার কাছে যা' ঋণ আছে, শোধ ক'রে নিষ্কিঞ্চন হবার জন্য অন্তরে ব্যাকুলতার সৃষ্টি। দ্রব্যে, দৃষ্টিতে, অনুগ্রহে, আশীর্ব্বাদে, শুভেচ্ছায় ও সহযোগিতায় যে যেখানে যার কাছে সহায়তা পেয়েছি, সবটুকুর জন্য ঋণের সুস্পষ্টবোধ এবং সেই ঋণ শোধ ক'রে দ্রুত ভগবৎ-পথে অগ্রসর হ'য়ে যাওয়ার দুর্ব্বার প্রেরণা নাম-কীর্ত্তনের পরোক্ষ সুফল। ফল দিয়েই ত' বৃক্ষের হয় পরিচয়। সফল নামকীর্ত্তন যদি আমরা সর্ব্বত্র ক'রে যেতে পারি, তাহ'লে নিশ্চয়ই জগৎ শুদ্ধতর,

পবিত্রতর, সুন্দরতর হবে, অশান্তির খনি বিশ্ব-সংসার শান্তির সদানন্দ-নিকেতনে পরিণত হবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১

রোগের ভাণ ও রোগের উপেক্ষা

সুকঠোর পরিশ্রমান্তে আশ্রমের অন্তেবাসীদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কতকগুলি গুণের সমাবেশ তোমাদের মধ্যে থাকা দরকার। একটী হচ্ছে এই যে, অসুখের ভান কখনো কর্ব্বে না। সত্যি সত্যি গুরুতর অসুখ কিছু হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা' জানানো দরকার এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও অবিলম্বেই আবশ্যক। কিন্তু অসুখ হ'ল কি একেবারে ভেঙ্গে পড়লে, এই রকমের মনোবৃত্তি প্রত্যেকে সযত্নে বর্জ্জন কর্ব্বে। সামান্য অসুখকে উপেক্ষা ক'রে চলার অভ্যাস প্রত্যেকের থাকা দরকার। আর সামান্য অসুখ সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে নেওয়ার যে সৈনিক-সুলভ অভ্যাস, এইটি তোমাদের প্রত্যেকের থাকা চাই। আদুরে দুলালরা দুনিয়ার কোনও মহৎ কাজের যোগ্য হয় না। তোমাদের লক্ষ্য থাকবে, যেন তোমরা জগতে কাজের মত কাজ ক'রে যেতে পার। সাধারণ লোকের চেয়ে দ্বিগুণ যোগ্যতার পরিচয়

জীবনের প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রে দেবার জন্য তোমাদের জেদ্ রাখতে হবে। গুরুতর অসুস্থতা নিয়েও জগতে অনেকে অনেক লোকবিস্ময়কর কাজ ক'রে গেছেন। ইতিহাস তাঁদের অনেকেরই কোন খোঁজ-খবর রাখে না। কিন্তু যাঁদের খোঁজ-খাঁজ ইতিহাসে মিলে, এমন ব্যক্তিদের সংখ্যাও খুব অল্প নয়। তোমরা সে সব দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ কর। বরফের স্তূপ ভেদ ক'রে হিমালয়ের শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অতিক্রম ক'রে খোঁড়া পায়ে যক্ষ্মাগ্রস্ত ফুসফুস নিয়ে নিদারুণ কাসি কাসতে কাসতে বদরিকাশ্রমে যান, এমন সাহসী ও সহিষ্ণু তীর্থযাত্রী যে-কোনও বছর ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখে হৃষীকেশে গেলে দেখ্‌তে পাবে।

শ্রম-সহিষ্ণুতার সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরকে এমন কষ্ট-সহিষ্ণু ক'রে গড়ে তোল, যেন দশ কিম্বা পনের ক্রোশ পথ পদব্রজে পর্য্যটন ক'রে গিয়েও ঠেক্‌লে তার পরে পূরা ছয় ঘণ্টা সময় নিদারুণ শ্রম কত্তে পার,—অর্থাৎ কাঠ ফাড়তে পার, মাটি কাটতে পার, পাথর ভাঙ্গতে পার, জল সিঁচতে পার, দড়ি পাকাতে পার, বোঝা বইতে পার, লোহা পিট্‌তে পার। শরীরটার ভিতর সহ্যশক্তির এমন সমাবেশ কর যেন, বাইরে থেকে কোনও ব্যক্তি যেন কল্পনায় আনতে না পারে যে, বিনা বিশ্রামে এক-নাগাড়ে কত শ্রম তুমি করতে সমর্থ।

নিজের রান্না, নিজের কাপড় কাচা, নিজের আশ্রয়স্থানটুকু নিজে রচনা করা,—এসব কাজে প্রত্যেকে অভ্যস্থ হও। একদিন এমন প্রয়োজন তোমাদের পড়তে পারে, যাতে আসমুদ্র হিমাচল পদব্রজে তড়িদ্-গতিতে ভ্রমণ কত্তে হবে এবং সমগ্র দিন ভ্রমণের পরে নিজ হাতে দুইখানা রুটী বা লিট্টি তৈরী ক'রে খেয়ে আবার দুই-চারি ঘণ্টা ধর্ম্মকথা প্রচারের জন্য কঠের শ্রম কত্তে হবে। হয়ত সবাই এসে তোমার কাছে ব'সে তোমার প্রাণের কথা শুন্‌বে না, হয়ত শ্রমক্লান্ত শরীর নিয়েই দুয়ারে দুয়ারে হেঁটে তখন যেতে হবে। কিন্তু চিত্ত হবে না চঞ্চল, মন হবে না অস্থির, স্নায়ুমণ্ডলী হবে না অবাধ্য, শক্তি হবে না অবশ। তেমন শ্রম-সহিষ্ণুতা তোমাদের চাই।

কঠোর শ্রমের পর বিশ্রাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কঠোর শ্রমের পর বিশ্রাম কত্তে হ'লে শুয়ে বিশ্রাম করাই ভাল। প্রথমে কতক্ষণ বাম কাতে শুয়ে বিশ্রাম ক'রে নেবে, তারপরে কতক্ষণ পা দুটাকে মাথার উপরে তুলে ধ'রে বিশ্রাম কর্ব্বে। এতে হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত বিশ্রাম পায় এবং ক্লান্তি খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়। কাক-চঞ্চু মুদ্রা ক'রে কুঞ্চিত ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ বায়ু গ্রহণ ক'রে জিহবাগ্রকে শীতল ক'রে নেওয়াও অত্যুত্তম।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৬ই ভাদ্র, ১৩৪১

ভগবন্নামের আসক্তি ইতর আসক্তির নাশক

মুরলিডি কলিয়ারী হইতে জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার এক আত্মীয়ের মৃগী রোগের জন্য ঔষধ নিতে আসিয়াছেন। রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা শ্রবণের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বহস্তে তাহার জন্য ঔষধ তৈরী করিয়া পুরিয়া বাঁধিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—দেখ বাবা, ভগবানের নামই সকল ব্যাধির মহৌষধ। দেহের ব্যাধির দিকে না তাকিয়ে সকলে ভবব্যাধির দিকে তাকাও এবং সেই ব্যাধির সর্ব্বরোগ-বিনাশক ভগবানের নামের প্রতি আসক্ত হও। জগতের সহস্র ব্যক্তিতে আসক্তি বর্দ্ধন ক'রে একেবারে ত' অচল হ'য়েছ, ভগবানের নামে আসক্তি লাগিয়ে এ সকল ইতর আসক্তির মূলোচ্ছেদ কর।

ধ্যানপন্থী ও নাম-পন্থী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম কত্তে কত্তেই ধ্যান জ'মে যায়, ধ্যান জমাবার জন্য পৃথক্ প্রয়াস প্রয়োজনীয় নয়। নামটী যাঁর, তাঁকে ত' কখনো দেখনি। তাই তাঁর ধ্যান জমাতে হ'লে তোমাকে বাধ্য হ'য়ে কতকগুলি কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। ধ্যানপন্থী সাধকদের এইটী একটী মহা

মুস্কিল। কৃষ্ণ ত' শ্যামবর্ণ, কিন্তু সেই শ্যাম কি রকম শ্যাম? রাম ত' দুর্ব্বাদলশ্যাম, কিন্তু কচি দূর্ব্বার মত তরল সবুজ, না প্রবীণ দুর্ব্বার মত ঘন সবুজ? কালী ত' কৃষ্ণবর্ণা মহাঘোরা, কিন্তু সেই কৃষ্ণ বর্ণ কি স্তুত্তন্দ্ব-স্তুন্তঙ্গ, না ন্দন্দ্বব্ধ-স্তুন্তঙ্গ? মা দশভূজার ত' দশ হাত, কিন্তু সেই হাতগুলি কি বেরিয়ে এসেছে বগল থেকে, না পিঠ থেকে? মহেশ্বর ত' মৃগহস্ত, কিন্তু সেই মৃগ কি বনের হরিণ, না কোনও রত্ন-বিশেষ? গণেশ ঠাকুর ত' গজানন, কিন্তু সেই গজাকৃতি মুখখানার বর্ণ কি তাঁর শরীরেরই মত রক্তবর্ণ, না হস্তীর মুখের মত শ্বেত বা ধূসর? এই সব প্রশ্ন ধ্যানপন্থীর এক মহা আপদ। কিন্তু নাম-পন্থীর সেই বালাই নেই। দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ক'ষে নাম জ'পে যাও, একমাত্র নাম ছাড়া আর কোনও বস্তুতে বা তত্ত্বে মনকে বস্‌তেই দিও না, ধ্যান কর ত' নামটীকেই একটী জীবন্ত বিগ্রহ জেনে তারই ধ্যান কর, ধ্যান না কর ত' নামেরই ঝঙ্কার, নামেরই অনুরণন অবিরাম অবিশ্রাম মনের কাণে শুনে যাও,—একদা এক শুভ মুহূর্ত্তে তোমার অন্তশ্চক্ষের সমক্ষে এমন এক মূরতি ভেসে উঠ্‌বে, যার ধ্যানে আর কল্পনার প্রয়োজন হয় না, যাকে স্বচক্ষে দেখেছ ব'লেই নাম-স্মরণমাত্র তাতে ধ্যান আপনি ব'সে যায়। 'ধ্যানে পাওয়া ঐ মূরতিখানা সাধনার সম্বল।'

ধ্যান-জমার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধ্যান যদি একবার জ'মে যায়,

তবে তার আবেশ চলে সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ধ'রে। ধ্যান যদি একবার জ'মে যায়, তখন আর শত চেষ্টা ক'রেও মনকে নাম থেকে তুলে এনে বিষয়ান্তরে সাহজে সন্নিবেশ করা যায় না। ধ্যান যখন জমে, তখন বহু বৎসরের সংস্কারের বন্ধন একদিনে ছিন্ন হয়। সর্ব্ব অঙ্গে তখন নামের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হ'তে থাকে, রক্তের প্রতি বিন্দুতে অনুক্ষণ নামের নিনাদ উত্থিত হ'তে থাকে। নখ, কেশ, অস্থি, মাংস, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, চর্ম্ম, মর্ম্ম, হৃদয়, মন, সব তখন ঐ একই পরম বস্তুর অনুধ্যানে নিমগ্ন। শরীরের প্রত্যেকটী রোমকূপে তখন বাঞ্ছিত দয়িতের মিলন-বিরহ মুহুর্মুহু যুগপৎ উপলব্ধ হ'তে থাকে।

দ্বিবিধ ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধ্যান হচ্ছে দ্বিবিধ। একপ্রকার হচ্ছে চেষ্টাকৃত বা কৃত্রিম, আর একপ্রকার হচ্ছে বিনা প্রয়াসে কৃত বা সহজ। ধ্যানের নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ কত্তে কত্তে মনকে সেই মন্ত্রানুযায়ী রূপের ভিতরে নিয়ে ঢেলে দেওয়া হ'ল কৃত্রিম ধ্যান,—যা' অধিকাংশ ধ্যান-পন্থীরা ক'রে থাকেন। আর ধ্যানের কোনও নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ না ক'রে, কিম্বা শিরে শিখিপুচ্ছ না কনক-কিরীট, মুখে মুরলী না রুধির ধারা, গলে বনমালা না মুণ্ডমালা, হস্তে খর্পর-করবাল না ধনুর্ব্বাণ, চরণে নূপুর না নরকঙ্কাল, প্রভৃতির বিচারে না

গিয়ে অবিরাম অবিশ্রাম অনন্যচেষ্ট ও অনন্যচিন্ত হ'য়ে একমাত্র নামেই লেগে থাক্‌তে থাক্‌তে যে ধ্যান আপনা আপনি জমে যায়,—তা' হ'ল সহজ ধ্যান।

উচ্চভাবের স্থায়িত্ব সম্পাদনের উপায়

কুমিল্লা নানূয়ার দীঘীর পার-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্যহীনের মস্তিষ্কে উচ্চভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই কারণেই চতুর্দ্দিকে যত আগ্রহী কুপাত্রের নিকটে তত্ত্ব পরিবেশন করিয়া করিয়া দেশের দশের হিতৈষীরা ক্লান্ত এবং শ্রম-পরিক্লিষ্ট হইয়া যাইতেছেন কিন্তু এক লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে একটী জনও সৎপথে আকৃষ্ট হইতেছে না। আজ দেশে ব্রহ্মচর্য্যের সমাদর নাই বলিয়াই বাধ্য হইয়া লোকোত্তর চরিত মহাপুরুষেরা অগত্যা hammering (হাতুড়ী মারা) এর পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। পাথর-বোঝাই শক্ত মাথায় যে-কোনও একটী তত্ত্বকে ঢুকাইতে হইলেই পেরেকের উপরে অবিরাম হাতুড়ীর চোট দিতে হইতেছে। 'জাগো' বলিলে এক কথায় কেহ জাগে না, হট্টগোল করিয়া, ঢাক-ঢোল পিটাইয়া, শিঙ্গা ফুকাইয়া, বারংবার দুয়ারে ধাক্কা মারিয়া তবে এক একটা লোককে জোর করিয়া টানিয়া টুনিয়া শয্যা

হইতে তুলিতে হইতেছে। 'উঠ' বলিলে কেহ ওঠে না, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য শাল, শূল, মুষল, মুদ্গরের যে পৌরাণিক বর্ণনা শুনা যায়, বাস্তবে তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া এক একজনকে শয্যাশ্রয় হইতে উঠাইতে হইতেছে। সমাজ-সেবকেরা এত শ্রম তোমাদের জন্য আর কত কাল করিবেন? দেখিতে দেখিতে কত জীবহিতকামী একবারের শ্রম শতবার করিতে বাধ্য হইয়া জগতে উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারার আগেই অকালে নরদেহকে শ্মশান-চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইসব দেখিয়াও তোমাদের চেতনা আসা প্রয়োজন। একবার বলিলেই যাহাতে কথা বুঝিতে পার, একবার বুঝিলেই যাহাতে তদনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইতে পার, কোনও কার্য্যে ব্রতী হইলে কার্য্য শেষ না করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করিবে না, এইরূপ নিষ্ঠা যাহাতে আয়ত্ত করিতে পার, তার দিকে দৃষ্টি দিয়া চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মচর্য্য উচ্চভাবের ধারক, বাহক ও প্রসারক। ব্রহ্মচর্য্য উন্নত চিন্তার ব্যাপকতা, গভীরতা ও মহিমার প্রবর্দ্ধক।"

প্রণবের উচ্চারণ

কুমিল্লান্তর্গত বিদ্যাকূট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রণবের উচ্চারণ 'ওম্‌-ও নহে, 'ওউম'-ও নহে, কিম্বা 'ওং'-ও নহে কিম্বা 'ওঁ'-ও নহে। প্রকৃত উচ্চারণ ইহাদের

প্রত্যেকেরই কাছাকাছি এবং সকলের মাঝামাঝি। মুখে প্রণবের উচ্চারণ চলিতে পারে না বলিয়াই জিহ্বায় উচ্চারণ করিয়া প্রণব-জপ কোনও আচার্য্যেরই উপদিষ্ট নহে। প্রণবের জপ মনে মনেই হইবে এবং শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ যাহাদের অসুবিধা, কিম্বা যখন অসুবিধা, তাহাদের পক্ষে বা তখন মালা দ্বারা জপ চলিতে পারিবে। ওঁ, ওং, ওম্‌ এবং অউম্‌ এই চারিটী বিভিন্ন উচ্চারণের মধ্যবর্ত্তী একটি সর্ব্বসামান্য ধ্বনিই ওঙ্কারের নিকটতম উচ্চারণ এবং বারংবার মনে মনে অস্পষ্ট ওঙ্কার জপিতে জপিতে অভিনিবেশের প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত উচ্চারণ তোমার মনের কাণে ধরা পড়িবে। দীক্ষা-কালে যাহা শুনাইয়াছি, তাহা মুখের মন্ত্রই শুনাইয়াছি, প্রাণের মন্ত্র অবিরাম জপিতে জপিতে স্বয়ং শুনিবে। অন্য যে রূপেই প্রণবের উচ্চারণ মনে মনে কর না কেন, অম্‌ বা আম্‌ রূপে কখনও উচ্চারণ করিও না। প্রণবই যে তোমার সর্ব্বারাধ্যের বীজমন্ত্র, এই কথা অন্তরে স্মরণ করাইবার উপায়-স্বরূপে 'হরি ওঁ' কীর্ত্তন করিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে, যেন 'হরি-ওঁ' কখনো 'হরি-অম্‌' কিম্বা 'হরি-আম্‌' বলিয়া উচ্চারিত না হয়।"

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ

"জিহ্বায় উচ্চারণ না করিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে তোমাকে নামজপ, করিতে বলিয়াছিলাম। স্বাভাবিক শ্বাসে এবং স্বাভাবিক প্রশ্বাসে নামজপ করিবে। প্রতিশ্বাসে একবার, প্রতি

প্রশ্বাসে একবার নাম স্মরণ করিতে হইবে। শ্বাস কিম্বা প্রশ্বাসের উপরে বিন্দুমাত্রও বল-প্রয়োগ করিবে না। ভগবানকেই তোমার শ্বাস ও প্রশ্বাসের চালক বলিয়া জানিবে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের পরিচালন হইতে নিজের চেষ্টা কিম্বা ইচ্ছাকে সযত্নে সরাইয়া আনিয়া তাহার ভার ভগবানেরই উপরে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্বাসবায়ু কখন কিরূপ চলিতেছে, সাক্ষিস্বরূপে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে প্রাণবায়ুর প্রত্যেকটী গতায়াতের সহিত তুমি কেবল নামের যোগ রক্ষা করিয়া চলিবে। নামকে ভগবানের সাক্ষাৎ মূরতি জানিয়া প্রেমপূর্ণ চিত্তে নামের সেবায় রত হইবে।

জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য

"নামের সেবাই যে তোমার জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য, এই কথাটী যদি স্মরণে না রাখ, তাহা হইলে নামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার উদয় হইবে না। আবার, নিষ্ঠা না আসিলে নাম-সেবার ফলস্বরূপ যে শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তাহারও সহজে সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিবে না। নামকে জীবনের অনন্যগতি, অনন্যশরণ, অনন্যাশ্রয় জানিয়া উহার সেবায় রত হইলে ভগবৎকৃপার রুদ্ধ দুয়ার দেখিতে না দেখিতে খুলয়া যায়। 'ব্রহ্মাণ্ডের সকল কর্ত্তব্য সারিয়া তাহার পরে অবসর পাইলে নামের সেবা করিব',—এই জাতীয় মনোবৃত্তি লইয়া কোনও সাধক নামের অমৃতরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই।

নামাশ্রয়ী মহতেরা জীবনকে অচিরে কালগ্রাসে গম্যমান জানিয়া নিদানের বন্ধু-জ্ঞানে নামকে আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন,—মার্কণ্ডের মুনি যেমন যমরাজকে পাশহস্তে আগুয়ান হইতে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তিকে প্রাণপণ বলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, 'পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে।' ঠিক্ এই মনোভাব নিয়া নিজেকে দ্রুত হন্যমান জ্ঞান করিয়া এবং আশ্রয়ান্তর বা উপায়ান্তর কিছু নাই জানিয়া সর্ব্বকর্ত্তব্যকে এই সুমহৎ কর্ত্তব্যের তুলনায় তুচ্ছ মনে করিয়া যে নামাশ্রয়, তাহাই নিত্যকুশলের হেতুভূত হইয়া থাকে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখিও এবং সেই মত নামের সেবা করিতে যত্নবান্ হইও।

সতীর্থদের অবিশ্বাস দর্শনে কর্ত্তব্য

"একসঙ্গে মিলিয়া যাহারা নামযজ্ঞের অহুতি হইবে বলিয়া একদা দীক্ষা নিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই নামে অরুচিসম্পন্ন বা ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তোমার বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। বিচলিত হইবার প্রয়োজন থাকিলে, আগে আমি তাহা হইতাম এবং যে পত্র একাকী তোমার নিকটে লিখিতেছি, সেই পত্র ইহাদের প্রত্যেকের নিকটে লিখিতাম। ভিন্নতর জীবনাদর্শের আলেখ্য

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাহারা অন্যপথে ছুটিতেছে, তাহাদিগকে নিজাভিলাষের পূরণ-পথে চলিতে দাও। পিছন হইতে ডাকিও না, সম্মুখে যাইয়া বাধারও উৎপত্তি করিও না। চতুর্দ্দিকের এই অবিশ্বাসের হট্টগোলের ভিতরে তুমি তোমার নিজের খুঁটী শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাক। তুমি তোমার নিজের আশ্রয় ছাড়িও না। দিগ্‌ বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া যে যেদিকে ছুটিবার ছুটুক, তুমি তোমার আপন স্থানে শক্ত হইয়া বসিয়া থাক। হয়ত ইহারা তোমাকে মূর্খ ভাবিবে, পাগল বলিয়া জ্ঞান করিবে, নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিবে, — কিন্তু তুমি উদ্বেগবর্জ্জিত প্রশান্ত মনে নিজের কাজে লাগিয়া থাক, ইহারা তোমাকে ভ্রান্ত বলিবে, বলুক। কথা কহিবার স্বাধীনতা হইতে জগতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার অভিলাষ করিও না এবং প্রতিবাদ করিয়া বৃথা কলহের সূচনা করিতেও যাইও না। সকলে যার যার আপন মনে আপন পথে চলুক, তুমি তোমার নিজের পথেই বীরবিক্রমে পাদচারণা কর। সম্মুখে তোমার অফুরন্ত ভবিষ্যৎ,—তার পানে তাকাও। দক্ষিণে, বামে বা পশ্চাতে চাহিয়া সময়ের অপচয় ছাড়া আর ত' কিছুই হইবে না। শত শত জন্ম বৃথাই কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছ, এই জন্মটীকেও সেভাবে নষ্ট করিতে পার না।

মতামত-প্রচার ও তর্কাদি বর্জ্জন

"নিজের মতামত বর্ত্তমান অবস্থায় অপরের কাছে প্রচার

করিতেও যাইও না। মতামত প্রচারের ফলে কতকগুলি যুক্তি-বিচার-বর্জ্জিত অন্ধ সংঘর্ষই ত' মাত্র বাজিবে? যেখানে কথা কহিলে শুনিবার লোক আছে, যেখানে যুক্তি দিলে তাহার বিচার যুক্তির নিকষে হয়, গলার জোরে বা গায়ের জোরে হয় না,—যেখানে তর্ক করিলেও কিছু না কিছু সদ্ভাবের কুসুম চয়ন করিয়া নিজ-গৃহে নন্দিত-চিত্তে ফিরিয়া আসা যায়, মতামত-প্রচার বা যুক্তি-বিচার সেখানেই শোভনীয়। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি বক্তা, সেখানে তুমি শ্রোতা হইও, আর যদি দেখ যে ও কথা শুনিলে সাধন-নিষ্ঠার তোমার চ্যুতি ঘটিবে, সে স্থান বিনা আড়ম্বরে এবং নিঃশব্দে পরিত্যাগ করিও। যে যাহা বলিবার বলুক, তুমি কেবল চল,—চল তোমার আপন সাধন-পথে, আপন ভজন-পথে, আপন মনন-পথে। প্রাণ-কানুয়ার বংশী শুনিয়া যে গোপিকার প্রাণ মজিয়াছে, সে কি আর লোক-গুঞ্জনের মুখ চাহিয়া যমুনা-পুলিনে নীপবিপিনে ছুটিয়া যাইতে বিলম্ব করিতে পারে?"

পরমাত্মাই গুরু

পাবনা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আপনি আমাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা আপনার অন্তরের সৌজন্য এবং সুবিনীত ভাবের

পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, জগতের একজনের সম্পর্কেও আমার মনে গুরুভাব নাই। দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত আমার সকল ভক্তকে আমি আমার সতীর্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। একমাত্র গুরু নিখিলেশ্বর পরমাত্মা। তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবেন এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে অন্তরের গুরুভাব অর্পণ করতঃ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন।"

মহতের বাণী

পাবনা-জেলান্তর্গত কাশীনাথপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা যে নানাস্থান হইতে সাধু-মহাজনগণের স্বহস্তলিখিত উপদেশবাণী সংগ্রহ করিয়া একটী প্রদর্শনী করিতে অভিলাষ করিয়াছ, ইহার আমি প্রশংসা করি। কিন্তু আমি এখনও মহাজন হইতে পারি নাই, মহাজনগণের চরণ-সেবকই রহিয়া গিয়াছি। এই কারণে প্রদর্শনের জন্য আমার কোনও হস্তাক্ষর তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তোমাদের ন্যায় তরুণমতি কোমলমনা কচি বয়সের বালকগণকে আমার সতীর্থ জ্ঞানে তোমাদিগকে একটী সদুপদেশ দিতেছি যে, মহাপুরুষগণের বাণীকে তোমরা নিজ নিজ জীবনের আচরণের ভিতর দিয়া যদি রূপ দিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে একই বাণী শতবার সহস্রবার, লক্ষবার

পড়িও। নিজেরা পড়িও, অপরকে শুনাইও,—অপরকে দিয়া পড়াইও, নিজেরা শুনিও। শ্রদ্ধাভরে, ভক্তিভরে মনের বিনীত জিজ্ঞাসা লইয়া প্রেমভরে পড়িও এবং শুনিও। যে বাণী শুনিয়া তোমার প্রাণে ভাবের বন্যা ছুটিয়াছে, সেই বাণী যাহাতে আপামর সর্ব্ব-সাধারণের কর্ণে পৌছিতে পারে, তাহার জন্যও চেষ্টিত হইও। অর্থাৎ শুনিও এবং শুনাইও, জানিও এবং জানাইও, বুঝিও এবং বুঝাইও, ভাবিও এবং ভাবাইও। মহাপুরুষের একটি বাণী সহস্র প্রাণকে ক্লেদ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অগণিত আত্মার ক্লেশ বিদূরিত করিতে পারে।"

অন্যায় করিয়া অস্বীকার

কুমিল্লা-জেলান্তর্গত কোনও গ্রামের একটী যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অন্যায় করিয়াছ, ইহা এক পাপ। পুনরায় যে কৃতকর্ম্মকে অস্বীকার করিতেছ, ইহা দ্বিতীয় পাপ। কর্ম্মফলের দাতা ভগবান্ তোমার কোন্ পাপটী আগে ক্ষমা করিবেন, চিন্তা কর। তুমি যে অন্যায় করিয়াছ, তজ্জন্য দুঃখিত হওয়াতেই তোমার অভিভাবকদের দোষ হইয়া গেল? কিন্তু তুমি অন্যায় করিয়া তাহা অস্বীকার করাতে কি তাঁহারা আরও দুঃখিত হইবেন না? যাঁহাদিগকে দুঃখিত দেখা তোমার অভিপ্রায়ের

বিরুদ্ধে, তাঁহাদিগকে বৃহত্তর দুঃখে নিপাতিত করা কি তোমার পক্ষে সৌজন্য হইল, না কর্ত্তব্য হইল? তিরস্কার করিয়া দোষ সংশোধন আমার নীতি নয়। দোষীকে নিজ দোষ বুঝিতে দিয়া আত্ম-সংশোধনের পথে চলিতে দেওয়াই আমার রীতি। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় জানিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছে এবং অন্যায় করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা অস্বীকার করিতেছে, যে ব্যক্তি মাননীয় ব্যক্তিদের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে এবং সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাত্ম-কল্প গুরুজনদিগকে মিথ্যাবাদী অসত্যাচারী বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য আদা নূন খাইয়া লাগিয়াছে, তাহাকে দোষমুক্ত করিবার আমার সামর্থ্য কোথায়?"

আঘাতের প্রতিঘাত

কুমিল্লা-জেলান্তর্গত কোনও গ্রামের অপর একটী যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অপরকে আঘাত হানিবার ব্যাপারে তোমরা যেরূপ পটুত্ব সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতে প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে তোমাদিগকে আমি উপদেশ না দিয়া পারিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তোমাদের কাজ উদাসীন দৃষ্টিতে দেখিয়া যাই, কেননা কালক্রমে তোমরাই স্বতঃপ্রণোদনায় তোমাদের এই বিদ্বেষ-বিষোদ্গার হইতে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু তাহা ত' হইলে না, এবং শীঘ্র হইবে, এইরূপ

লক্ষণও কিছুই চখে পড়িতেছে না। আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়াছি এবং এইজন্য একান্ত অযাচিত ভাবে উপদেশ বর্ষণ করিতে আসিয়াছি। তোমরা আজ যাহাদিগকে বিদ্বেষ করিতেছ, কাল তাহারা ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদ্বেষ করিবে; তোমরা আজ যাহাদের অনিষ্টচিন্তা করিতেছ, কাল তাহারা ফিরিয়া তোমাদের অনিষ্ট-সাধনে চেষ্টান্বিত হইবে। এভাবে অশান্তির পর অশান্তি শুধু বাড়িয়াই চলিবে। হয়ত দুইটা দলের মধ্যে একটা দল সংঘর্ষের পরে নিশ্চিহ্ন হইবে, কিন্তু তখন আবার উদ্বর্ত্তিত দলটাই শতধা ছিন্ন হইয়া নিজেকে নিজে কাটিতে, নিজেকে নিজে মারিতে, নিজের স্বার্থ নিজে নাশ করিতে, নিজের কুশল নিজে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইবে। শত্রুরা তোমাদের মারিল, কিন্তু শত্রুতা তোমাদের অন্তরে জীবিত রহিল এবং পরে ইহা তোমাদিগকে আত্ম-খণ্ডনে, আত্মহননে, আত্ম-বিরোধনে নিয়োজিত করিবে।"

মনকে দেহের ঊর্দ্ধে নাও

নোয়াখালী-জেলান্তর্গত ছমি-মুন্সীর হাট নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেহের দর্ব্বলতার চিন্তা লইয়াই যদি দিন কাটাও বাছা, মনকে শাসন করিবার সাধন করিবে কখন? ঐরাবতের মতন বিপুল এবং ভীমকর্ম্মা ভীষ্মের মত সবল দেহ পাইয়াও

কতজন মনের উচ্ছৃঙ্খলতার জ্বালায় অধীর হইয়া জ্বলিয়া মরিতেছে। মনকে সবল করিবার দিকে দৃষ্টি দাও, দেহের চিন্তায় চুল পাকাইয়া কোনও লাভ হইবে না। নিয়মিত আহার, সময়িত নিদ্রা, পরিমিত ব্যায়াম এবং যথাযথ বিশ্রাম দ্বারা শরীরটাকে যতটা পটু রাখা যায়, রাখ। কিন্তু শরীরের সেবাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য করিও না। মনকে দেহের উর্দ্ধে তুলিয়া নাও, তোমার অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতির পানে তাকাইয়া দেহের ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিকারগুলিকে উপেক্ষা কর। এই হিংসা-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত অশান্তিকবলিত শান্ত মানব-জীবনের ক্ষণিক সুযোগের মধ্য দিয়া প্রেমময় শান্তিময় অনন্ত দেবজীবনের উদ্বোধনের জন্য প্রয়াসী হও।"

জীবন-ব্যাপী সৎসঙ্গ

চট্টগ্রাম-জেলান্তর্গত কানুনগোপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি সাধুসঙ্গের কথা লিখিয়াছ। সত্য সত্যই জীবনব্যাপী সাধুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তির একান্তই কাম্য এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সৎসঙ্গ পাইবে কোথায়? পৃথিবীর মধ্যে কয়জন লোক সৎ, সাধু, পরমোন্নতিলিপ্সু, পরহিতকামী এবং ঈশ্বরানুগ্রহ-বিশ্বাসী? পৃথিবীতে কয়জন ব্যক্তি ভগবৎ-সেবার আগ্রহকে সকল কাজের চেয়ে বেশী জরুরী জ্ঞান করেন? কয়জন ভগবানকে

ভালবাসেন, ভগবৎ-প্রেমিককে প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং ভাবের দৃষ্টিতে দেখেন? আর, আজ যাঁহারা সৎ, কাল তাঁহাদের অসৎ হইতে কতক্ষণ? আজ যাঁহারা হরিনামকীর্ত্তন-রসের রসিক, কালই যে তাঁদের রসনা-কণ্ডুয়ন তাঁহাদিগকে পরনিন্দক পরদোষদর্শক পরপাপোদ্ঘাটক অসৎ লোকে পরিণত করিবে না, একথা বলিবার উপায় কি? চিত্তসংস্কার, প্রতিকূল পরিবেশ, অহংমদমত্ততা, অপরিণামদর্শিতা এবং হঠকারিতা কল্যকার সাধুকে অদ্য এক মহা-অসাধুতে পরিণত করিতে পারে। এই কারণেই সৎসঙ্গ-কামীর অবিরাম ভগবানের নামের সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁর নামই জগতে একমাত্র নিত্যসদ্বস্তু, অপর কোনও বস্তুই নিত্যসৎ নহে। সুতরাং অবিরাম অবিশ্রাম নামের সঙ্গের জন্যই ব্যগ্র হও, ব্যাকুল হও।"

সংসারের ঝঞ্ঝাট জয়ের উপায়

নোয়াখালী-জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসার নিতান্তই ঝঞ্ঝাটের স্থান। ইতর স্বার্থ লইয়া জঘন্য কলহ এবং কুক্কুরের ন্যায় নিজ জনের প্রতি অকুণ্ঠিত ও নির্ল্লজ্জ আক্রমণই সংসারের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। অনিত্য বস্তুকে নিত্য জ্ঞান করিয়া সেই অজ্ঞানের ভিত্তিকে চিরস্থায়ী ধারণা করতঃ অকারণে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানাই সংসারের প্রধান কাজ। নিজের প্রয়োজন নাই, তবু পরের

মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া, নিজের লভ্য নাই, তবু অপরের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করা—ইহাই সংসারের অধিকাংশ ব্যক্তির নিত্য কর্ত্তব্য। এহেন সংসারে বাস করাকে বিড়ম্বনা বলিয়া জ্ঞান করিবে, ইহা কোনও আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে, বরং ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সংসার ছাড়িয়াই বা যাইবে কোথায়? যেখানে যাইবে, সেখানেই কোনও না কোনও রূপ ধরিয়া পুনরায় সংসারই মাথা উচাইয়া উঠিবে। আশ্রমে যাইবে, দেখিবে, সকল সতীর্থের সহিত মন মিশাইয়া চলিতে পার না, কাহারও বচন মনকে বিষাইয়া দেয়, কাহারও ব্যবহার অন্তরে নিদারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। মঠে যাইবে, দেখিবে, কাহারও দাম্ভিকতার দরুণ হয়ত কাছই ঘেঁষিতে পার না, কাহারও চপলতার দরুণ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। এভাবে দেখিবে, যেখানে যাইবে সেখানেই অপরের সাথে বিভেদ-বুদ্ধি অপরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণের কোনও না কোনও কারণ ঘটিয়া যাইবে, যাহাকে তোমার নিজের দৃষ্টিতে তুমি খুবই সঙ্গত বলিয়া মনেও করিবে। অর্থাৎ, যেখানে যাইবে, তীর্থই হউক আর সাধু-বাবাজীদের আখড়াই হউক, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই সংসার তাহার দুঃখের বাহিনী নিয়া চলিবে। সুতরাং পৈতৃক সংসারের হট্টগোল এবং কোলাহল দেখিয়া ভয় না পাইয়া ভগবানের অমৃতময় নামের মহিমায় সকল বিঘ্ন জয় কর। নামে বিশ্বাস কর এবং নামকেই একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান করতঃ সংসারকে নিতান্ত

অস্থায়ী বস্তু বলিয়া বুঝিয়া লও। সংসারকে যে অনিত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, সংসারের বিষদন্ত তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, গাত্রচর্ম্মে ঠেকিয়াই তাহা খান্-খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।"

নমঃশূদ্রের শ্রেষ্ঠতা

কুমিল্লা-জেলন্তর্গত দত্তখোলা রগুনকান্দি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা জাতিতে নমঃশূদ্র বলিয়া আমি তোমাদিগকে ঘৃণনীয় মনে করি না। বরং আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান করি। সমাজ তোমাদের অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু আমি তোমাদিগকে হিন্দু-সমাজের ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। স্বাধীন ভারতে গ্রীক, পহ্লবী, শক, হূণ, পুলিন্দ, পারসিক, ইয়ুচি, বাহ্লিক, প্রভৃতি কাহাকে না আমরা ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত করিয়া আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলাম? মনু-সংহিতাতে সর্ব্ব-সাকুল্যে ছোট-বড় মিলিয়া পঞ্চাশটী জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু বিগত সতের শত বৎসরের ভিতরে ভারতবর্ষে একমাত্র ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যে আটশতের মত শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর রন্ধন-করা অন্ন অপর শ্রেণীর লোকে খুব কমই খায় এবং যাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান একেবারেই চলে না। ইহার কারণ কি? এতগুলি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আসিলেন

কোথা হইতে? ইহার সোজা উত্তর এই যে, বিদেশী দিগ্বিজয়-লিপ্সুরা যে দলে দলে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে সদলবলে এদেশের অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন এবং হয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে, নয় বিষ্ণুপাসনার প্রভাবে তাঁহারা তাঁহাদের স্বকীয় বৈদেশিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ভারতবাসী হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের জঠরে সেই সময় জারকাগ্নি অতি প্রবল ছিল, সেই জন্যই অজ্ঞাত-কুলশীল কিন্তু দিগ্বিজয়ী এই সকল নবাগতকে অনায়াসে আত্মসাৎ করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাদের অনেকের ধর্ম্মবিষয়ক সাধারণ ধারণাগুলির উপরে হস্তক্ষেপ না করিয়া কৌশলে ইহাদিগকে বৈদিক ধর্ম্মের অনুগত করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ইহাদের পুরোহিতদিগকে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়া গলদেশে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যেও যে আজ আটশতের উপরে রক্ত-সম্বন্ধ-স্থাপনে অনিচ্ছুক শ্রেণী বিদ্যমান, তাহার কারণ ইহা। কিন্তু এই অত্যদ্ভুত কার্য্যটী স্বাধীন ভারতেই সম্ভব ছিল, পরন্তু খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সুরু করিয়া প্রায় ধারাবাহিক সাত শত বৎসর কাল হিন্দু-সমাজকে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব-রক্ষার যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় হিন্দুর এই জারণ-শক্তি হ্রাস পাইল এবং ইংরেজ রাজত্বের পৌনে দুই শত বৎসরের বিজাতীয় শিক্ষার দাসত্বের ফলে নীচকে উচ্চ করিয়া তুলিবার পরিবর্ত্তে আমরা উচ্চকে নীচ করিয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দর্শন করিতেছি। নতুবা

সঙ্ঘশক্তি এবং শক্ত মেরুদণ্ডের অধিকারী এই নমঃশূদ্র জাতিকে আজ ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করা হইত। যৎসামান্য সাহস, সঙ্ঘশক্তি, দৃঢ়তা এবং অকুতোভয়তা, যাহা হিন্দুগণের অবশিষ্ট আছে, তাহার তোমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আমি মনে প্রাণে তোমাদের শ্রদ্ধা করি। তোমাদের সমাজের জন্য আমার করণীয় অনেক কিছু রহিয়াছে এবং আমি উচ্চতম ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়াছি বলিয়াই সেই বিষয়ে আমার দায়িত্বও অত্যধিক। কিন্তু আমি যে নমঃশূদ্র-অধ্যুষিত পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করিয়া তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিবার অভিযানে বাহির হইতে পারিতেছি না, তাহার একমাত্র কারণ আমার পূর্ব্বারব্ধ বহুকর্ম্মজনিত একান্ত অনবসরতা এবং শারীরিক শ্রমক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।"

দীক্ষাগ্রহণান্তর সাধন না করা

নোয়াখালী-জেলান্তর্গত জয়াগ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মঙ্গলময় নামে দীক্ষা পাইয়া তৎপরে সেই নামে অরুচি বোধ করা এক মহাদুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া জানিও। মহাদুঃখ ললাটে না থাকিলে কেহ দীক্ষা পাইয়াও নামে অবহেলা করে না। অদীক্ষিতেরা যে নামে অবহেলা করে, তাহার যুক্তি বুঝিতে পারি। স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নাম বলিয়া সকল সময়ে নামে মন একনিষ্ঠ হইয়া লাগিয়া থাকিতে চাহে না, বারংবার

ভিন্ন ভিন্ন নামকে অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু দীক্ষিতের ত' মন একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে একনিষ্ঠ করা অতি সহজ। দীক্ষারূপ অনুষ্ঠানটীই এই সহজতার সম্পাদক। তথাপি যখন নাম ভাল লাগিতেছে না, তখন জোর করিয়া মনকে নামে বসাও। মন যতই বিদ্রোহী হইবে, তুমিও ততই রণোন্মুখ হও। মন যতই অবাধ্য হইবে, তুমিও তত কড়া শাসনে রত হও। অবশ্য দুর্দ্দমনীয় মন তোষামোদে বাগ মানিবে না, তাহাকে জবরদস্তির দ্বারা অনুগত করিতে হইবে। দীক্ষিত হইলে অথচ সাধন করিবে না, ইহা তোমার পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তোমাকে যিনি দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও তেমন অপ্রশংসার। অবশ্য কোনও কোনও মহাপুরুষ জীবের কুশল সম্পাদনের বুদ্ধিতে অপাত্রেও ব্রহ্মনাম প্রদান করেন, কিন্তু তুমি যে অপাত্রই থাকিতে চাহ, ইহা কি মূর্খতার পরিচায়ক নহে?"

প্রলোভন ও নাম

নোয়াখালী-জেলান্তর্গত উলুপাড়া গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রলোভন যখন ডাকে, তখন মহদ্‌ব্রতের ভাণ করিয়াই ডাকে, অতি প্রথমেই সে তাহার নারকীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ধরে না। নীতিজ্ঞানের নয়ন-সুমুখে যে দৃশ্য দেখিলে সহজেই মন নত হইয়া পড়িতে চাহিবে, সযত্ন-রচিত অবগুণ্ঠনে সেই

দৃশ্যাবলিই সে আঁকে, কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সে তাহার বিষ-ভুজঙ্গীর প্রাণহারিণী সত্তা সতর্কতার সহিত লুকাইয়া রাখে। কঙ্কাল-সার গলিত হস্তের পচা মাংস-চর্ম্ম সে আলেয়ার আলো সৃষ্টি করিয়া রঙ্গের খেলায় ঢাকিয়া রাখে, যতক্ষণ না তুমি তার কাছে যাইয়া হাড়ের প্যাঁচে আটক পড়িয়াছ, ততক্ষণ তুমি কল্পনাও করিতে পারিবে না যে কেমন জালে বদ্ধ হইলে। গোপন-চর প্রলোভন এভাবে জীবন-নাশ করে। কিন্তু তুমি ভগবানের নাম শিখিয়াছ, নামের মহিমা জানিয়াছ, প্রলোভনে তোমার কিসের ভয়? নামে লাগিয়া থাক, প্রলোভন প্রাণ বাঁচাইতে নিজেই পলায়ন করিবে। কুহক-মায়ায় বন্দী থাক ত' বন্দিদশার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেই ফলোদয় হইবে না,—নিজের বিপদ ভুলিয়া যাইয়া বিপত্তিহরণ বিঘ্নবারণ পরম-শরণ নামের আশ্রয় লও। অবিরাম নামের শরণ নামের মনন চালাও। নামই তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন, নামই তোমার বন্দিদশা ঘুচাইবেন।"

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৭ই ভাদ্র, ১৩৪১

গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোভাব

জনৈক গ্রামবাসী প্রশ্ন করিলেন,—গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর কিরূপ ভাব পোষণ করা উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম ভাবটী হবে শ্রদ্ধার। "আমি ইচ্ছা কর্‌লেও একটা সন্তান নিজ উদরে ধারণ কত্তে পাত্তাম না; আর প্রসব-ক্লেশের মতন এমন দুঃসহ যাতনাও জগতে দ্বিতীয় নাই; স্ত্রী কিন্তু সেই ক্লেশ অবহেলে সহ্য ক'রে যাবেন,"—এইরূপ ভাব। দ্বিতীয় ভাবটী হবে কৃতজ্ঞতার। "আমার মস্তিষ্ক, আমার দেহের গঠন, আমার পুঞ্জীভূত বংশানুক্রমিক সদ্‌গুণ এবং সদ্‌ভাবনা সমূহকে নিয়ে যে শিশু একদিন ভূমিষ্ঠ হবে, আমার স্ত্রী তাকে কত ক্লেশ সহ্য ক'রে নিজের রক্ত তাকে পান করিয়ে দিনের পর দিন বড় ক'রে দিচ্ছেন, ভূমিষ্ঠ হবার পরে এই শিশুকে কোলে নিয়ে নিজের স্তন্যরস পান করিয়ে তাকে মানুষ কর্ব্বেন, অথচ এই শিশু যখন দিগ্বিজয়ী বীর হবে, জগজ্জয়ী মহাপুরুষ হবে, তখন আমারই নাম ক'রে লোকে তার পরিচয় দেবে, মায়ের নাম অনেকেরই কাণে পৌঁছুবে না, আর যাদের কাণে পৌঁছুবে, তাদের অধিকাংশই হয়ত কষ্ট ক'রে নামটা মনেও রাখবে না,—আমারই বংশধরের জন্য এই দেহমনে ত্যাগস্বীকারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ;"—এই ভাব। তৃতীয়টী হবে করুণার। "এই ত' ক্ষীণ দেহলতা, সন্তানের ভারে যেন নুইয়ে পড়্‌ছে, নিঃশ্বাসটি টান্‌তে কষ্ট হয়, প্রশ্বাসটি ফেল্‌তে প্রাণ বেরিয়ে যেন যায়, পেট ভ'রে আহার নেই, অবিরাম শরীর জুড়ে কত প্রকারের অকথনীয় উপদ্রব চল্‌ছে, আহা এই কষ্ট কি ক'রে কতটা কমান যায়, বল্‌তে পার?"—এই ভাব। চতুর্থটা

হবে বিস্ময়ের। "এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা, তবু দেখ জঠরস্থ সন্তানের কথাটী মনে পড়্‌লে মুখখানা যেন স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, চখ দুইটী যেন স্নেহের উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হ'য়ে যায়,—কি অপূর্ব্ব এই দৃশ্য, কি আশ্চর্য্য এই সন্তান-স্নেহ, ধন্য জননীর স্নেহ, ধন্য তার মাতৃভাব,"—এই ভাব। সচ্চরিত্র আদর্শ স্বামীর মনোভাব তার গর্ভবতী স্ত্রীর সম্পর্কে এই হবে।

গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি কাম-ভাব দমন

প্রশ্নকর্ত্তা।—গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি কামভাব আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এই কামভাব দমন কত্তে হবে। শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, করুণা এবং বিস্ময় এই চারিটী-ভাবের অনুশীলনের দ্বারা মনকে কামমুক্ত কত্তে হবে। এই অনুশীলন ধারাবাহিক হওয়া দরকার। কেন না, বহুবার কামাচারের অনুষ্ঠানের ফলে স্ত্রী-দেহের প্রতি কামভাবের উদ্রেক স্বামীর পক্ষে একটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে যায়। এযুগে এমন স্বামী খুবই বিরল, যাঁদের প্রথম সংসর্গেই পত্নী গর্ভবতী হন। অনেক ক্ষেত্রে দশ, বিশ, বা শতবার সহবাসের ফলে নারী অন্তঃসত্ত্বা হন। সুতরাং একটী সন্তান আসার আগেই স্বামীটীর উপেন্দ্রিয়ের

চর্চ্চা অতিরিক্ত মাত্রায় হ'য়ে যায়, এবং এই বেপরোয়া অভ্যাসের মোহপাশ ছিন্ন করা তার পক্ষে বড়ই কঠিন হ'য়ে পড়ে। এই জন্যই শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা, করুণা এবং বিস্ময়ের ধারাবাহিক অনুশীলন অত্যাবশ্যক। শুধু তাই নয়, আরও সদুপায় আছে। তুমিই যে বিন্দুরূপে তোমার পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করেছ এবং তুমিই যে পত্নীর ডিম্বকোষের সাথে নিজ অভেদত্ব স্থাপন ক'রে দিনের পর দিন ভ্রূণের রক্ত মাংস প্রভৃতিতে পরিণত হচ্ছ, তুমিই যে পত্নীর নাড়ীর যোগে তার শরীরের রক্ত দুগ্ধবৎ প্রীতিসহকারে পান ক'রে একদিন অর্দ্ধঘন তরল পদার্থ থেকে ক্রমশঃ রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-অস্থির-চর্ম্ম-পদ-চক্ষু-কর্ণাদি-বিশিষ্ট একটী পূর্ণাবয়বে পরিণত হচ্ছ, এবং তুমিই যে ভূমিষ্ঠ হবার পরে ঐ মাতার স্তন্য পান ক'রে দেহ ধারণ কর্ব্বে,—অবিরাম একথা চিন্তা কত্তে কত্তে গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি কামভাব ক'মে যাবে। আর, গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি প্রতিক্ষণে স্নেহের অনুশীলন কত্তে কত্তেও দেখ্‌বে যে স্ত্রীর প্রতি কামভাব ক'মে যাচ্ছে। গর্ভক্লেশক্লিষ্টা রুগ্না স্ত্রীর প্রতি সেবকের মনোভাব নিয়ে সাধ্যমত এবং প্রয়োজন মত তার সেবা কর এবং সেবাকালে তার গর্ভমধ্যে সন্তানরূপে জগদীশ্বর আবির্ভূত হচ্ছেন, এই চিন্তা চালাও। এতেও কামোত্তেজনা সুশান্ত হবে। আর গর্ভবতী স্ত্রীর উদরের উপরে কর বা মালা রেখে ভগবানের মঙ্গলময় নাম জপ করতে থাক, তাতেও কামভাব নষ্ট হবে।

গর্ভাবস্থায় সহবাস

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—ধানবাদের একজন ডাক্তার আমাকে বল্‌লেন যে, ইংরাজী বইতে আছে নাকি যে, গর্ভাবস্থায় প্রথম কয়েক মাস স্ত্রী সহবাস কর্ল্লে তাতে সন্তানের কোনও ক্ষতি হয় না, যদি মাসিক ঋতুর নিয়মিত সময়টা বাদ দিয়ে এবং একটু সাবধানে সে কাজ করা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওসব পাশ্চাত্য পিশাচদের মতামত। ওসব কথা বন্য জন্তু বা অসভ্য বর্ব্বরেরই উপযুক্ত। আচ্ছা, ঘরবাড়ী তোমার নাই ভাঙ্গল, কিন্তু গভীর রাত্রিতে নিদ্রার ঘোরে যদি হঠাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, তবে তাতে কি তোমার উদ্বেগ হবে না? ঘরদুয়ার ভীষণভাবে ন'ড়ে চ'ড়ে তার পরে যদি কোনো বিভ্রাট না ঘটিয়েই ভূকম্প থেমেও যায়, তবু তোমার মনের উপরে কি ক্ষতিকর প্রভাব সে রেখে যাবে না? গর্ভস্থ ভ্রূণ নিদ্রিত শিশুর ন্যায়। আর, সহবাস তুমি যত সাবধানেই কর, জরায়ুর আক্ষেপ ও বিক্ষেপ তাতে হবেই হবে। তুমি ত' ইন্দ্রিয়সুখের লোভে সহবাস কর্ল্লে, কিন্তু যে শিশুটা এক বিন্দু অর্দ্ধঘন জলের মত জরায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার গায়ে কি সমুদ্র-তরঙ্গের মত নিদারুণ উৎক্ষেপ সব লাগ্‌বে না? এতে কি তার কোনো ক্ষতি হবে না? স্বার্থপর পশুদের নিজের সুখের বাইরে অন্য কোনো চিন্তা থাকে না। ইন্দ্রিয়সুখই তাদের

জীবনের চরম কাম্য, মরতে যাবার পূর্ব্বক্ষণেও ক্ষণকালের জন্য একটু সহবাসসুখের জন্য যাদের চিত্ত অধীর, সেই সব নরপশুরাই শুধু নিজেদের তৃপ্তির কথা ভাবে, ভ্রূণটার শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি কি হচ্ছে বা কত হচ্ছে, সে কথা একবার গণনায়ও আনে না। যারা একটু বিবেচক পশু, তারা বড় জোর এই পর্য্যন্তই ভাবে যে, গর্ভে যখন একটা শিশু আছে, তখন সেটা আবার অকালে স্রাব হয়ে নষ্ট হ'য়ে গেলে ভোগ-সঙ্গিনী স্ত্রীটার না জানি কোন্ বিপদ হয়। স্ত্রীর সহযোগ ছাড়া ত' আর একা সহবাস চলে না। পূরা পশু নিজের তৃপ্তিটুকুই চায়, সঙ্গিনীর বিপদ-আপদ বোঝে না, আর অর্দ্ধ পশু অর্থাৎ দয়ালু পশু ভোগসঙ্গিনীর গর্ভনাশজনিত বিপদের কথা চিন্তা ক'রে একটুকু সাবধান হয়। কিন্তু আসলে এই দুই ব্যক্তিই পশু, মানুষ নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণের আধ্যাত্মিক জীবন

প্রশ্নকর্ত্তা।—গর্ভাবস্থায় সহবাসে ভ্রূণের আধ্যাত্মিক ক্ষতিটা কি হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।--সেটা অবশ্য ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা। বৈজ্ঞানিকের ল্যাবোরেটরীতে যন্ত্রপাতি দিয়ে তার প্রমাণ আজ হবে না। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যদি অধ্যাত্মস্তরে আরোহণ কখনো করে, তবে তখন একথা প্রমাণিত হবে যে, ভ্রূণরূপী সন্তান

মাতৃগর্ভে ব'সে অবিরাম একাক্ষর প্রণব-মন্ত্র জপ ক'রে যাচ্ছে। এই প্রণব জপ্‌তে জপ্‌তে সে বারংবার ভগবানের চরণে তার অতীত দুষ্কৃতি-সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছে এবং সঙ্কল্প কচ্ছে যে, অধোগমনকারক কুক্রিয়ায় আর সে কখনো আসক্ত হবে না। এই প্রণব জপ্‌তে জপ্‌তে সে অতীত সুকৃতিসমূহের জন্য ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে যে, তিনি কৃপা ক'রে সৎপথে রেখে ছিলেন ব'লেই না এসব সুক্রিয়ার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল এবং প্রার্থনা কচ্ছে,—"হে ভগবান্, গর্ভবাস পরিত্যাগ ক'রে যখন ভূমিষ্ঠ হব, তখন যেন তোমার পবিত্র নামের রুচি না হারাই, তোমার চরণে শুদ্ধাভক্তি থেকে বঞ্চিত না হই।" পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জীবদেহে অবস্থানকালে যে ভগবৎপ্রেম থেকে সে সুখ-লোভাতুরতা-হেতু নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিল, আজ শরীরের শ্রমের বিরতি হেতু আত্মচিন্তার অবসর পেয়ে সে সেই ভগবৎ-প্রেমের অনুকূল সাধন কচ্ছে। তার এই সাধনা, তার এই তপস্যা বিনা বাধায়, বিনা বিঘ্নে যাতে উদ্‌যাপিত হ'তে পারে, তার জন্য তার পিতামাতারই সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। কিন্তু তা না ক'রে কিছুদিন পরে পরেই যদি জরায়ুর মধ্যে কেবল আকুঞ্চন আর প্রসারণের সৃষ্টি হ'তে থাকে, তবে তাতে কি ভ্রূণের ক্ষতি হবে না?

সন্ন্যাসীর সন্তান-স্নেহ

ত্রিপুরা-রাজ্যান্তর্গত রাধাকিশোরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সন্তানগণের জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে। গৃহস্থ পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানের জন্য যেরূপ ব্যাকুল অধীর হন, আমি সন্ন্যাসী হইয়াও এই বিষয়ে অধিকতর দুর্ব্বল। সন্তানের জন্য আমার প্রাণ অবিরল কাঁদে। দৃঢ়চেতা সন্ন্যাসীরা আমার এই দুর্ব্বলতার কথা জানিলে আমাকে নিশ্চিতই গালি দিবেন, কেন না অনাসক্ত ভাবেই সন্ন্যাসের স্থিতি। আমি তোমাদের প্রতি আসক্ত কিনা, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তোমাদের কুশল-চিন্তা হইতে নিজেকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না। শিষ্যভক্তহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া যাঁহারা কঠোর সাধনায় ব্রহ্মপদ দর্শন করেন, তাঁহারা কত ভাগ্যবান্! কাহারও জন্য চিন্তা নাই, কাহারও জন্য উদ্বেগ নাই, একমাত্র পরমবাঞ্ছিতের শ্লাঘ্য সঙ্গই অনন্য কাম্য। কিন্তু আমি যে সংসার ছাড়িয়াও নিদারুণ সংসারী, বিষয় বর্জ্জন করিয়াও ঘোর বিষয়ী! তোমরা আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের রত্ন, পরমসোহাগের ধন। একদা তোমরা ভগবৎ-প্রেমের জীবন্ত জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ অপ্রেমিককে প্রেমশিক্ষা দিবে, লক্ষ লক্ষ নাস্তিককে আস্তিক করিবে, অগণিত পথভ্রান্ত শ্রমক্লান্তকে পথ চিনাইবে, শ্রমাপহরণ

করিয়া শান্তির সলিল-সিঞ্চনে স্নিগ্ধ, শীতল, বিগততাপ করিবে, এই এক আশার আনন্দে আমি মলয়ানিল-প্রহত বেতসপত্রের ন্যায় আবেগে কেবল কাঁপিতেছি। সর্ব্বত্যাগী অনাসক্ত নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী আমার অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না।"

আসক্তি ও অশান্তি

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত কুলাউড়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আসক্তিই পাপের জননী। এই আসক্তিকে বর্জ্জন কর। ধনার্জ্জনাসক্তি, রমণসুখাসক্তি, সুখাদ্যাস্বাদনাসক্তি মানুষের সরল সুন্দর পবিত্র মনকে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে। পিতা যে পুত্রকে, মাতা যে কন্যাকে নিজ হাতে ধরিয়া অসম্মান ও কলঙ্কের পথে ঠেলিয়া দিতে পারিতেছে, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, লজ্জা নাই,—ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জীবনের কচি বাঁশে আসক্তির ঘুণে ধরিয়াছে। আসক্তিই ক্রোধকে, দ্বেষকে, ঈর্ষ্যাকে, পরানিষ্টচিন্তাকে, প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে এবং জঘন্য অকৃতজ্ঞতাকে পলে অনুপলে জন্ম দিয়া যাইতেছে। মক্ষিকার যেমন অণ্ড-প্রসবের অন্ত নাই, আসক্তিরও তেমন চিরদুঃখদ মহাপাপসমূহকে প্রসব করার বিরাম নাই। ইহাতেই সমগ্র জগৎ অশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। মানুষে মানুষে শৃগাল-

কুক্কুরের ন্যায় পচা হাড় আর গলিত মাংস লইয়া টানাটানি হানিহানি চলিতেছে। স্বামী তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, বন্ধু বন্ধুর রুধিরাস্বাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রক্তারক্তি চলিতেছে, ক্ষমাহীন আক্রোশে একে অন্যের ধ্বংস-সাধনে ব্রতী হইতে পারাকেই সভ্যতা নামে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইতেছে। এই সকলের মূল আসক্তি। আসক্তি কমাও, শান্তি আসিবে; আসক্তি বাড়াও, অশান্তির অনলে জীবন্তে দগ্ধ হইয়া মরিবে। আসক্তি কমাও, উদ্বেগ কমিবে; আসক্তি বাড়াও, জগতের উদ্বেগ ও উপদ্রব দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিবে।"

আসক্তিবর্জ্জন বনাম কর্ত্তব্যে উপেক্ষা

"কিন্তু আসক্তি কমাইতে হইবে বলিয়া কর্ত্তব্য-কার্য্যে উদাসীন হইবে, এরূপ কোনও কথা নাই। কর্ত্তব্য-কার্য্যে উপেক্ষার নাম আসক্তিবর্জ্জন নহে, উহার অপর নাম কাপুরুষতা। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তব্য-কার্য্য পরিত্যাগের উপদেশ দেন নাই, পরন্তু আত্ম-কর্ত্তৃত্ব-বোধ, অহমিকা, হিংসাবুদ্ধি এবং সুখাসক্তি বর্জ্জনেরই উপদেশ দিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যদি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন উপদেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইত না, অর্জ্জুনকেও যুদ্ধে লিপ্ত

হইতে হইত না। একমাত্র অর্জ্জুনের আসক্তিহীনতাই জগৎ হইতে হিংসা-বিদ্বেষকে দূর করিতে পারে না, দুর্য্যোধনেরও আসক্তিহীনতা চাই। তোমরা যে অনাসক্ত হইবে, তাহা পরপীড়কের পীড়ন-শক্তি বর্দ্ধনের জন্য নহে, পরন্তু পরপীড়কের অন্তর হইতে আসক্তি বিদূরিত করিবার জন্য। অনাসক্ত কর্ম্মজীবন যাপন করিয়া তোমরা তাহার প্রভাব নিখিল জগতে অনুভূত করাও।"

পতিতের উত্থান এবং ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার

ফরিদপুর জেলান্তর্গত বাইশরশি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও জাতি কেবলই ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে ছোট হইয়া আছে, ব্রাহ্মণেরা কাষ্ঠ-পাদুকা-পরিহিত চরণের নৃশংস চাপে ইহাদের আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দেন নাই, এই জাতীয় কথা উষ্ণমস্তিষ্ক, অবিবেচক এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থায় অনভিজ্ঞ সমাজ সংহারপন্থি সমাজ-সংস্কারকদের মুখেই শোভা পায়। যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, নীচে পড়িয়া থাকার মত সঙ্গত কারণও তাহারা নিজেরা কতকগুলি সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য জাতিকে কেবলই দাবাইয়া রাখেন নাই, পরন্তু অনেক

অনার্য্যকে আর্য্য-পংক্তিতে টানিয়া আনিয়াছেন, অনেক অব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণের পর্য্যায় দিয়াছেন। সংহিতা-সমূহের উপর একটু বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়া চক্ষু বুলাইয়া গেলে ইহা সহজেই প্রতিভাত হইবে যে, দেশ ও সমজের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের মুখে ব্রাহ্মণেরা সামাজিক শাসন-বিধির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে এবং ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সমাজের পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তবে যে আজ জাতিভেদের অন্ধ-সংস্কার সমগ্র সমাজের উপরে পাষাণ ভার চাপাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অপটুতা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কারণ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বলিপ্সা নহে, তাহার কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে সাত শত বৎসর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ দিয়াও ক্ষত্রিয়-রাজশক্তি যে সেই মরণ-পণ সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হইতে পারিলেন না, সেই পরাজয়ের গ্লানি। ক্ষত্রিয় যদি বিধানকে প্রতিপালিত না করান, ব্রাহ্মণ বিধান গড়িবেন কিসের ভরসায়? ভারতে তুর্কী-পাঠান-মুঘল অভিযানের মুখে ক্ষাত্রশক্তি নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়িয়া ব্রাহ্মণের আর ক্ষত্রিয়ের মুখপানে তাকাইয়া থাকিবার উপায় ছিল না, তাই, ব্রাহ্মণ কমঠ-নীতির অনুসরণ করিয়া অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকে, হিন্দুর সমাজকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহা দোষ হইতে পারে, সঙ্কীর্ণতা হইতে পারে, কিন্তু ইহা

ছাড়া সম্ভবতঃ উপায়ও কিছু ছিল না। শক, হূণের পুরোহিতকে যেভাবে আর্য্য-ব্রাহ্মণেরা নিজেদের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়া নূতন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিয়া নিতে পারিয়াছিলেন, তুর্কী-পাঠানের মুঘলের মোল্লাকে সেভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিবার কোনও উপায় ছিল না। উপায় থাকিলে আজ ইসলামী-ব্রাহ্মণেরা ভারতের আটশত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই থাকিতেন। আর, ইংরাজের রাজত্ব এদেশে যে অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে সমাজকে অবস্থানুযায়ী পুনর্গঠিত করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মণের হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া ক্রমশঃ জাতি-বর্ণের প্রতি দৃষ্টিহীন গণ-ভোটের হাতে যাইতেছে। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণকে গালি দিয়া কি ফল হইবে? কতকগুলি অবনত জাতি চিরকাল অবনত হইয়া থাকিতেই চাহে, কেহ শিক্ষা, সংস্কার, সদুপদেশ লইয়া ইহাদের মধ্যে গেলে সকল সৎপ্রয়াস উপেক্ষায় উড়াইয়া দেয়। ইহাদের মধ্য হইতে কদাচারের নির্ব্বাসন ঘটাইয়া সদাচার-প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে লাঠি লইয়া তাড়িয়া আসিবার লোকও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নীচকে নীচ বলিলে তাহার ক্রোধের উদ্রেক হইবে কিন্তু উচ্চ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে সে নিজের কুশল ভাবিয়াও সহযোগ দিবে না, ইহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নীচের নিকৃষ্ট স্বভাব আঁকড়িয়া ধরিয়া কদাচারের কলুষ-পল্বলে ভাসিবে, ডুবিবে, কিন্তু উচ্চের প্রাপ্য সম্মান কেন তাহাকে দেওয়া হইবে না, ইহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ,

ঝগড়া-কলহ, সভা-সমিতি নিদারুণ ভাবে চলিবে? ইহা কি ব্রাহ্মণের দোষ? দীর্ঘকালের অপাংক্তেয় অনাচরিত জাতিরা হঠাৎ এক একবার ঘুমঘোর হইতে উঠিয়া যে আত্মোন্নতির অভিনয় করিতেছে, তাহার পশ্চাতেও কি বহুনিন্দিত ব্রাহ্মণবংশাবতংসদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, বুদ্ধি, পরমর্শ এবং প্রেরণা নাই? প্রত্যেকটা সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাস খোঁজ এবং আমাকে বল যে, উল্লেখযোগ্য কোন্ আন্দোলনটীর পশ্চাতে উদারদর্শী অকপটহৃদয় দুই চারিজন ব্রাহ্মণ-সন্তানের অতুলন শ্রম, প্রতিভা এবং আত্মবিনিয়োগ নাই? কিন্তু হঠাৎ একদল হালের চাষা একদিন মস্ত বড় প্যাণ্ডাল সাজাইয়া এক কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া বসিল এবং নিজেদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া দাবী করিল কিন্তু গৃহে ফিরিয়া সেই পূর্ব্ববৎ প্রকাশ্য ভাবে আহারে, বিহারে, শয়নে দুনিয়ার সকল রকমের অনাচার ও কদাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। ইহাই কি নীচ জাতিগুলিকে উচ্চ করিবে? ক্ষত্রিয় বলিয়াই যদি দাবী থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের সদাচার গ্রহণ কর। বৈশ্য বলিয়াই যদি দাবী থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যের সদাচার গ্রহণ কর। শুধু ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিলেই নীচ জাতি উচ্চ হইবে না, নীচত্ব পরিহারও করিতে হইবে। পতিতের উত্থান আমরা কে না কামনা করিব? ভারত জুড়িয়া বিশ বাইশ কোটি শূদ্রই রাজত্ব করুক, এ প্রার্থনা কাহার থাকিবে? আমারা প্রত্যেক শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়

বা বৈশ্যরূপে উন্নীত দেখিতে চাহি, কিন্তু রাস্তার গাধাটার গলায় ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ঝুলাইয়া দিলেই সে ব্রাহ্মণ হইবে না, কিম্বা বনের শৃগালের মাথায় ক্ষত্রিয়ের শিরস্ত্রাণ পরাইয়া দিলেই সে ক্ষত্রিয় হইবে না, অথবা বরাহের গলদেশে 'বৈশ্য' সাইন-বোর্ড টানাইয়া দিলেই সে বৈশ্য হইবে না। যে জাতি যেরূপ সামাজিক মর্য্যাদা চাহ, সেই জাতি সেইরূপ সদ্‌গুণের ও অনুশীলন কর। তবেই না তোমাদের প্রকৃত উত্থান হইবে? তবেই না তাঁহাদের সাত্ত্বিকী অকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, যাঁহারা প্রকৃতই দিবানিশি তোমাদের উন্নতি কামনা করিয়া ভগবানের চরণে মাথা খুঁড়িতেছেন?

কুসঙ্গের বিষ

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বালিচক-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হীন সংসর্গে আসিয়া তোমার যে নানা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতেছি এবং এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কিন্তু হীন সংসর্গের একমাত্র পরিণামই হইতেছে ক্ষতি। যক্ষ্মারোগীর সংসর্গ যেমন রোগ-সংক্রামক, হীনমনা, দুশ্চরিত্র ব্যক্তির সংসর্গও তেমন আত্মিক গ্লানির সঞ্চারক। বিষধর সর্পের ন্যায় ভীতিপ্রদ জানিয়া এই সংসর্গ পরিত্যাগ কর। সর্পবিষ মাত্র দেহের উপর দিয়াই যায় কিন্তু কুসংসর্গের বিষ জন্মে জন্মে মনকে বিষাইয়া মারে।"

ভগবৎ-প্রেমবর্দ্ধক কর্ম্মের সাধনা

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত ভট্টপাঠক-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কর্ম্ম ছাড়া এই পৃথিবীতে বাস এক অতি অসম্ভব কল্পনা। যতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, কাজ তোমাকে করিতেই হইবে। তবে বহির্ম্মুখ মন লইয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিলে কর্ম্মদ্বারা বন্ধনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পায়। যে কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ কর, চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া ভগবৎ-সেবার লক্ষ্যে করিবে। কর্ম্মহীন অলসের জীবন তোমার আদর্শ নহে, ভগবৎ-সেবার লক্ষ্যযুক্ত আত্মসুখ-পূর্ত্তি-লিপ্সাহীন পবিত্র কর্ম্মময় অনবসর জীবনই তোমার আদর্শ। প্রত্যেকটী কর্ম্মের ভিতর দিয়া যাহাতে ভগবৎ-প্রেমের অনুশীলন হইতে পারে, তেমন সুকৌশলে কর্ম্মসম্পাদনে চেষ্টিত হইবে। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, যেরূপ কর্ম্মই যখন তোমার হস্তে আসিয়া পড়ুক, ভগবৎ-সেবার প্রয়োজনের অধীন করিয়া তাহার দাবী মিটাইতে চেষ্টা করিবে। কর্ম্মিরূপে যশঃ-সম্বর্দ্ধনা পাওয়া তোমার লক্ষ্য হইবে না কিম্বা কর্ম্মসম্পাদনের ফলে অনিত্য জগতের কোনও বৃহৎ স্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়া গেলে, তাহাও তোমার আনন্দের হেতু হইবে না,—তোমার কর্ম্ম লোকতঃ যে ফলই প্রসব করুক, অলোকতঃ তোমার অন্তরের ভগবৎ-

প্রেমের সম্ভারই যেন সুসজ্জিততর করিতে সামর্থ হয়। এই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম এবং ইহা দ্বারা জীব নিত্য-কুশলে অবস্থিত হয়।"

পুপনকী আশ্রম

১৮ই ভাদ্র, ১৩৪১

স্ত্রীলোকের সাধন-বিঘ্ন এবং পুণ্যের ঋণ

নিকটবর্ত্তী এক কয়লার খনির ম্যানেজারের স্ত্রী ভ্রাতুষ্পুত্র সহ আশ্রম দেখিতে আসিয়াছেন। প্রসাদাদি পাইবার পরে তাঁহারা কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ চাহিলেন। সেই প্রসঙ্গেই মহিলাটী বলিলেন,—বাবা, আমরা যে একটা জাতি, এই স্ত্রীজাতি, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম হবার আর কোনো উপায় নেই। কেন না, সর্ব্বাবস্থাতেই আমরা পরাধীনা। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে পুত্রের মুখপানে তাকিয়ে আমাদের চল্‌তে হয়। তাঁদের ধর্ম্মবোধ যদি আমাদের ধর্ম্মবোধের সঙ্গে এক বা সমতান না হয়, তাহ'লেই একটার পর একটা সাধন-বিঘ্ন আস্‌তে থাকে। আবার ক্ষমতাবান্ স্বামী আর উপার্জ্জক পুত্রের ভাগ্য যার যুগপৎ হয়েছে, তার ত' সোণায় সোহাগা। সে যে কার আদেশ মেনে চল্‌বে, তার ঠিকানা পাওয়া ভার।

শ্রীশ্রীবাবামণি বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—মাগো,

কথা তোমার সম্পূর্ণই সত্য। কিন্তু এই যে এত বাধা, তার ভিতর দিয়েও ধর্ম্মের সেবা এই ভারতে তোমরাই যে মা অটুট অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছ। তোমাদের সেই ধর্ম্মের জোরে, সেই পুণ্যের প্রভাবে এদেশে রামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ—এসব মহাপুরুষদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। তোমাদের সেই পুণ্যের ঋণ আমরা শত জন্মেও শোধ দিতে পারব না মা।

স্ত্রীজাতির আত্মবিলোপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি পরিমাণ আত্মবিলোপ যে তোমরা মা এই পুরুষজাতির কুশলের জন্য ক'রে এসেছ, সেই ইতিহাস কেউ কখনো লিপিবদ্ধ করে নি। আর তার অনেকাংশই লিপিবদ্ধ করার উপায় নেই। অন্তরের ব্যথা অন্তরে লুকিয়ে রেখে যুগে যুগে সেবার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে মাতৃরূপিণী তোমরা মানুষ গড়েছ, জাতি গড়েছ, কিন্তু পশংসার জয়মাল্য পেয়েছে তোমাদের সন্তান এবং সে জগতের কোথাও মাতৃপরিচয় দিয়ে বেড়ায় নি, দিয়েছে শুধু পিতৃ-পরিচয়। পরিচয়ের বেলায় এই আত্মবিলোপ, তা তোমরা ঈর্ষ্যার চখে দেখ নি, প্রেমভরে স্নেহভরে সগৌরবে স'য়ে নিয়েছ। সেই স্ত্রীজাতি তোমরা, তোমাদের চরিত্রের এই মহিমার বর্ণনা আমার ভাষার অতীত, তোমাদের জীবনের এই মহত্ত্বের তুলনা দেবার শক্তি আমার নেই।

স্ত্রীজাতির অহং-বুদ্ধির লোপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা মা জগৎকে শিখিয়েছ কি ক'রে অহংবুদ্ধিকে লোপ ক'রে দিয়েও মমত্ব বজায় রাখা যায়। শাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে এই যে, অহং-মমাদি-বোধ দূর ক'রে দাও, "আমি" "আমি" রব স্তব্ধ হোক্, "আমার" "আমার" বুলি উঠে যাক্। কিন্তু তোমরা নিজেদের চরিত্র দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছ যে, শাস্ত্রকারদের চেয়েও তোমরা অধিকতর যোগ-কুশলা। তোমরা তোমাদের অহংকে পদতলে চেপে নিষ্পেষণে নির্ম্মূল করেছ কিন্তু মমত্ব-বোধ পরিত্যাগ কর নি, তোমাদের জীবনে আমিত্বের হুহুঙ্কার নেই কিন্তু মমতার মাধুরী আছে। এমন অত্যাশ্চর্য্য কুশলতা, তা কি শাস্ত্রকাররাই কল্পনা কত্তে পেরেছেন? তোমাদের এই অহংবুদ্ধি-বিলোপের কাছে আমি বারংবার সম্ভ্রমে মাথা নত করি মা।

স্ত্রীজাতির দিব্য মমতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের মহিমা তোমাদের মমতায়। কথাটা আমার গর্ভধারিণী জননীকে দিয়ে বুঝেছি। আমার মায়ের নাম রেখেছিলেন, আমার দিদিমা,—"মমতা।" এখন আমি দেখ্ছি, শুধু আমার গর্ভধারিণী জননীই মমতা-স্বরূপিণী নন, নারীমাত্রেই মমতা-স্বরূপিণী। জগতের প্রত্যেক

প্রাণীর সম্পর্কে অহং-বুদ্ধির দাবী চেপে রেখে দিয়ে "আমার" বোধে অনুপ্রাণিত নির্ম্মল নিষ্কাম স্নেহ একমাত্র তোমরা ছাড়া আর কে দিতে সমর্থ মা? সহস্র বৎসর যদি তোমাদের এই অনাবিল দিব্য মমতার মহিমা কীর্ত্তন করি, তবু জেনো, আমার অন্তরের আশা মিট্‌বে না।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৯ ভাদ্র, ১৩৪১

আইন ও ধর্ম্ম

অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় মটর-বাসে শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আশ্রম ছাড়িয়া একটা দীর্ঘ ভ্রমণ-তালিকার অনুসরণে বাহির হইবেন। আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে কয়েকমাস দেরী হইবে। আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারীকে কতকগুলি জরুরী বিষয়ে উপদেশ দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস ক'রে কেউ যখন তোমাকে তাঁর অতীব গোপনীয় কোনও মর্ম্ম-কথা বলেন, তখন তিনি তোমাকে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নাও করেন যে, এসব কথা তুমি জগতে কারো কাছে প্রকাশ কর্‌বে না, তবু জানবে যে, একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই তুমি প্রকাশ কর্‌বে না ব'লে এক মহাসত্যে আবদ্ধ হ'য়ে গেছ। আইন বল্‌বে তুমি আবদ্ধ নও, কিন্তু ধর্ম্ম বল্‌বে, তুমি আবদ্ধ হয়েছ। এসব ক্ষেত্রে আইনকে রক্ষা না ক'রে তোমাকে ধর্ম্মই রক্ষা কত্তে হবে।

সত্যরক্ষা বনাম বিশ্বাসঘাতকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্য রক্ষা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সত্যের সেবাই তোমার জীবনের পরম সাধনা। কিন্তু যে সত্যপালনে বিশ্বাস-ঘাতকতা কত্তে হয়, সেই সত্য, অসত্য। যে সত্যরক্ষণে ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্য্যাদা নষ্ট কত্তে হয়, সেই সত্য পাপ। একজন একটী সত্য তোমার নিকটে অতি সন্তর্পণে রক্ষা ক'রে গেলেন এই ভরসায় যে, তোমার কাছ থেকে এর সন্ধান নিয়ে অপরে তাঁর অনিষ্টাচরণ কর্ব্বে না, কিন্তু তুমি সেই বিশ্বসের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ল্লে না এবং তার ফলে তোমাকে বিশ্বাস করার দরুণ একজন সরল-চিত্ত অকপট-বুদ্ধি বিশ্বাসশীল ব্যক্তির দারুণ অনিষ্ট হ'ল। তখন অবশ্য জগতের অপূর্ণবুদ্ধি মানুষের গড়া আইন তোমাকে প্ররোচনা দিয়ে বল্‌বে, না, তুমি ত' সত্যই প্রকাশ করেছ, তোমার এতে কোনও দোষ নেই, কিন্তু ইহপরজগতের ধর্ম্ম তোমাকে ধিক্কার প্রদান কর্ব্বেন। যে বিশ্বাসঘাতক, সে আর সহস্র গুণে গুণান্বিত হ'লেও কখনো ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় পেতে পারে না।

বিশ্বাসঘাতক তথা গুপ্তঘাতক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের লোক এত কুটিল,

কপট ও স্বার্থপর, এত পঙ্কিলমনা ও বহির্ম্মুখ যে, বিপন্ন মানব তাদের সকলের উপরে সমান নির্ভরশীল হ'তে কখনো পারে না। লোকের ষড়যন্ত্র-প্রিয়তাই তা'দিগকে নির্ভরের অযোগ্য ক'রে রেখেছে। এমতাবস্থায় নিজের বিঘ্নবিপত্তির চাপ একটু হাল্কা হবে ভরসা ক'রে কেউ কেউ তোমার কাছে তার মনের নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত গোপন কথা বল্‌তে পারে। প্রতিশ্রুতি সে আদায় করুক আর না করুক, তোমাকে সে যখন প্রাণ ঢেলে তার অন্তরের অন্তঃস্থল দেখিয়েছে, তখন তুমি কোনও কারণেই কোনও অবস্থাতেই তার গোপন কথা অপরের কাছে প্রকাশ কত্তে পার না। তোমার প্রতি যদি সে ভবিষ্যতে কখনো কোনও অন্যায় করে, অবিচার করে, উৎপীড়ন করে, তবু, এমন কি প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যও তুমি তা' পার না। যদি তা' কর, তবে নৈতিক ও ধার্ম্মিক দৃষ্টিতে তুমি গুপ্তঘাতকের সমকক্ষ অপরাধী হ'লে ব'লে জানবে।

নিকৃষ্টতম পাপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাসঘাতক গালির চেয়ে নিকৃষ্টতর কোনও গালি নেই, বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে জঘন্যতর কোনও পাপ নেই। চোর, জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী, লম্পট,—এসব গালি বিশ্বাসঘাতক গালির চেয়ে অনেক

ঠাণ্ডা গালি। চৌর্য্য, দুশ্চরিত্রতা, মদ্যপান জালিয়াতি প্রভৃতি পাপ বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে অনেক ছোট পাপ।

পুরুলিয়া

২০শে ভাদ্র, ১৩৪১

কল্য রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি পুরুলিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহতাব ভট্টাচার্য্যের বাসায় অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় একজন দেশকর্ম্মী শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শন করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি একের-পর-এক উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

ধার্ম্মিক কে

প্রশ্ন।—ধার্ম্মিক লোক কাকে বলা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যিনি কোনও আচরণের জন্য নিজের অন্তরের কাছে অপরাধী হন না এবং যিনি বাইরের লোকেরও অনিষ্ট কামনা করেন না, তিনি ধার্ম্মিক।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও পরের অহিত

প্রশ্ন।—অনেক ধার্ম্মিক লোককেই ত' দেখা যায়, যথেষ্ট পরিমাণে পরের অহিত সাধন কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পরের অহিত যদি ইচ্ছাকৃত বা সঙ্কল্প-মূলে না হয়, পরন্তু নিজের নিকটে নিজে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়

নিরপরাধ থাকার জন্য চেষ্টা কত্তে গিয়ে যদি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অজ্ঞাতে অপরের অনিষ্ট হ'য়ে যায়, তবে এর জন্য তাঁকে অধার্ম্মিক বলা চল্‌বে না।

দেশকর্ম্মী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি

প্রশ্ন।—আমরা ত' দেশকর্ম্মী, নিজের দেশের হিতই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের দেশের হিতের যারা বিঘ্ন, আমাদের দেশ-সেবার চেষ্টায়ও তাদের অহিত হচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের ধার্ম্মিক বল্‌বেন, না অধার্ম্মিক বল্‌বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অপর দেশবাসীর অহিত কামনাই যদি তোমাদের লক্ষ্য না হয়, এবং অপর দেশবাসীর হিতকে আঘাত না ক'রেও নিজের দেশের হিত কি ভাবে সম্ভব, এই বিষয়ে যদি তোমার প্রখর দৃষ্টি থাকে, এবং সর্ব্বোপরি তোমাদের যারা হিতের বিঘ্ন, তাদের প্রতিও যদি তোমাদের কোনও বৈরভাব না থাকে, তাহ'লে নিশ্চিতই তোমরা ধার্ম্মিক।

কেন ভারত বিদেশীর প্রতি বৈরভাব বর্জ্জন করিবে

প্রশ্ন।—এটা হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ। কে কোন্

উৎকৃষ্টতর কৌশল অবলম্বন ক'রে অন্য জাতিকে নিজের পদতলে চেপে রাখ্‌তে পারে,. সেই ফিকিরেই সকল দেশের প্রধান প্রধান মনীষীরা রয়েছেন। এই অবস্থাতে অত্যাচারিত দুর্ব্বল জাতি কি অত্যাচারী সবল জাতির বিরুদ্ধে অন্তরের বৈরভাব পোষণ না ক'রে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না-পারাই সাধারণ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু এটা ভারতবর্ষ। এই দেশের অতীত ঐতিহ্য পৃথিবীর অপর সকল দেশ থেকে আলাদা। পর পর চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর এদেশে অহিংসা প্রচার ক'রে গেছেন। তথাপি বুদ্ধ অহিংসার বাণীকে এই জাতির মেরুমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিয়ে গেছেন। এদেশের যোগশাস্ত্র অহিংসার মহিমা শুধু কীর্ত্তন ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, কোটি কোটি যতিকে দিয়ে তার অনুশীলন করিয়েছেন। এই দেশের দেশভক্ত-কর্ম্মী জগতের অপর সকল জাতির প্রতি বৈরভাব বিসর্জ্জন দিয়েই দেশের সেবা কর্ব্বেন। এদেশের পূর্ব্বাচার্য্যগণের তপস্যা পৃথিবীর সকল দেশের সকল পূর্ব্বজগণের তপস্যা থেকে পৃথক্। এই জন্যই জগতের অন্যত্র যা অসম্ভব, এই ভারতকে তাই সম্ভব কত্তে হবে।

লাগিয়া থাক

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েক খানা পত্র লিখিলেন।

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত কোনও গ্রামবাসী একটী কর্ম্মী-যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার হাঁড়ি কোনও স্থানেই কালো হইতেছে না,—দুই চারি দিনের বেশী কোনও স্থানেই থাকিতে পার না, একটা না একটা উপলক্ষ্য করিয়া স্থান পরিবর্ত্তনের নেশা তোমার অদ্বিতীয়। নূতন এক স্থানে গিয়াছ, খুব ভাল কথা; কিন্তু কোনও কাজের কাজ না করিয়া যদি দুদিন পরে চলিয়া আস, তবে এই যাওয়ার কোনও সার্থকতা নাই। কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের ইচ্ছাতে যখন খুসী এবং যেখানে খুসী যাওয়া কিম্বা আসা আমার মোটেই ভাল লাগিতেছে না। তোমার এই অব্যবস্থিতত্বের দরুণই তুমি কোনও স্থানেই কাহারও আদর পাইতেছ না। এত টানাটানি করিয়াও তোমার গেরুয়াটা আমি নামাইতে পারিলাম না। যতবার জোর করিয়া তোমার গেরুয়া খুলিয়া রাখিয়াছি, ততবারই তুমি নূতন করিয়া গেরুয়া কাপড় পরিয়াছ। কোনও নীতি, কোনও শৃঙ্খলা, কোনও আদেশ, কোনও নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিবে না বলিয়াই সাহস করিয়া আজ পর্য্যন্ত তোমাকে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজে বসাইতে পারিলাম না। অপর সহস্র সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও তুমি একমাত্র কারণে সকল কাজের অযোগ্য হইয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, নূতন স্থানে যখন গিয়াছ, চেষ্টা করিও লাগিয়া থাকিতে। কথায় বলে,—'লাগিয়া থাকিলে মাগিয়া খায় না'। যে একটা কাজে একটা

স্থানে দীর্ঘকাল দরদী মন নিয়া একনিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করে, নিষ্ঠুর গুণেই ক্রমশঃ অনেক অপ্রত্যাশিত প্রতিভার দুয়ার তাহার খুলিয়া যায়। তুমি কীর্ত্তন করিতে জান, গান গাহিতে জান, কবিতা লিখিতে জান, বক্তৃতা করিতে জান, কিন্তু জান না এক স্থানে এক কাজে এক উদ্দেশ্যে লাগিয়া থাকিতে। তুমি এই দোষটাকে নিজ চরিত্র হইতে সমূলে উৎখাত করিতে যত্নশীল হও। নতুবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমূল্য জীবন মাটি করিয়া দিবে। কিন্তু তাহা কি কখনো কাহারও কাম্য হইতে পারে?"

স্বামীর অনিষ্ট ও পিতৃ-ভ্রাতৃ-কুশল

ত্রিপুরা জেলার বুড়ি-চং-থানার অন্তর্গত কোনও পল্লীর অধিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামীদের স্বেচ্ছাচারের সহিত বর্ত্তমান যুগের অনাদর্শ স্ত্রী-শিক্ষা মিলিত হইয়া স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ককে বড়ই অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে এবং তোমার অসুবিধাগুলিকেও আমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার ইহাই উপদেশ যে, স্বামী অপেক্ষা অপর কোনও আত্মীয়কে প্রিয়তর জ্ঞান করিতে যাইও না। কেননা, ইহাই

তোমার সংসারের সকল অনর্থের মূল। আগে স্বামীর স্বার্থ দেখ, পরে ভ্রাতার বা পিতার স্বার্থ দেখিও। স্বামীর জন্য তোমাকে অবশ্য আমি অধর্ম্মাচরণ করিতে বলি না, কিন্তু স্বামিকুলের অনিষ্টের ভিতর দিয়া যেই রমণী পিতৃকুলের বা ভ্রাতৃবংশের মঙ্গল-বর্দ্ধন করিতে চাহে, তাহাকে আমি মানবী না বলিয়া দানবী আখ্যা দিব। তুমি দানবী হইতে যাইও না।"

শ্বাসকষ্টে নামজপ

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত বরহিত-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও কারণে শরীর অসুস্থ থাকিলে বা শ্বাসযন্ত্রের পীড়া হেতু শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ কষ্টকর হইলে জোর করিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপিও না। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে না তাকাইয়া অবিরাম মনে মনে নাম জপ করিয়া যাইতে থাকিবে অথবা একটী মালা লইয়া তাহার সাহায্যে জপ করিবে। একটি করিয়া রুদ্রাক্ষ ঘুরিবে আর একবার করিয়া নাম জপিবে। তুলসী, বিল্ব, স্ফটিক বা অপর যে-কোনও সজ্জন-গণ-প্রচলিত মালায় নামজপ চলিতে পারে, কিন্তু মালাটী যেন ওজনে ভারী না হয় এবং দীর্ঘ না হয়। মেরুবিহীন মালাই আমি নিজে এই সব ক্ষেত্রে জপিয়া থাকি, অর্থাৎ এই মালায় কোন সাক্ষী থাকে না। সাক্ষী বা

মেরুযুক্ত মালা সম্পর্কে প্রচলিত বিধান এই রহিয়াছে যে, কখনও উহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে নাই, মেরু পর্য্যন্ত আসিয়াই মালা ঘুরাইয়া নিয়া জপিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য জপের সংখ্যা ঠিক্ রাখা। কিন্তু মেরুর নিকটে আসিয়া যে থামিতে হইবে, এই বিধান মানিতে গেলে সমগ্র মালা একবার জপা হওয়ার পরে অল্পক্ষণের জন্য হইলেও মনটা একটু বাধাপ্রাপ্ত হয়, মনের নামমুখিনী একতানতা স্বল্পের জন্য হইলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই কারণে আমি মেরুযুক্ত মালার জপ-কার্য্য করি না। এই কারণে ছোট্ট একটী মালা হইলেও কাজ চলিয়া যায়, যেহেতু অনন্তবার আর্বত্তনেও কোথাও আসিয়া বাধা পাইবার সম্ভাবনা নাই। শ্বাস-ক্লেশ-কালে এইভাবে অবিরাম অবিচ্ছেদ নাম জপিয়া গেলে উহা শরীরের পক্ষে নিরুদ্বেগ হইবে।"

শ্বাসে প্রশ্বাসে জপে সতর্কতা

"নামজপ যখনই শ্বাসে প্রশ্বাসে কর, একটী কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্বাসের উপরে বলপ্রয়োগ কোনও অবস্থাতেই করিবে না। উপদেশের অসম্পূর্ণতার দরুণ এক সময়ে আমি নামজপকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে কঠিন চাপ দিতে গিয়া এক নিদারুণ শারীরিক দুর্দ্দৈবে পতিত হইয়াছিলাম। দেহ হয়ত খসিয়াই পড়িত, কিন্তু কেন জানি না, যাইতে যাইতে রহিয়া গেল। এই কারণেই এই বিষয়ে

আমি তোমাদিগকে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছি। আপনা আপনি যখন শ্বাস-প্রশ্বাস যে ভাবে চলিবে, তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে নামের সেবা চালাইবে, বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা বা চেষ্টাকে শ্বাস-প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে না। তোমার ইচ্ছাকে বা চেষ্টাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে দাবাইয়া রাখিবে এবং ভগবদিচ্ছাকে প্রধান এবং একমাত্র কার্য্যকর হইতে দিবে। তাঁর ইচ্ছাতে শ্বাস-প্রশ্বাস যখন দ্রুত, তখন সেই দ্রুতগমনাগমনশীল বায়ুর সহিতই নাম চলিবে; তাঁর ইচ্ছাতে বায়ুর গতি যখন স্থির, ধীর, মন্দ ও মন্থর, তখন তাহারই সহিত-ধীরলয়ে-স্মরিত নাম চালাইয়া যাইবে। শ্বাস-প্রশ্বাস বহুক তাঁর ইচ্ছাতে আর নাম সংযোগ ঘটুক তোমার চেষ্টায়। নির্ভর এবং পুরুষকারের এইরূপ সমন্বয়-সাধন করিতে তোমাকে চেষ্টা পাইতে হইবে।"

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের সুফল

"শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপের শারীরিক সুফল এই যে, ইহা ক্রমশঃ সাধকের অজ্ঞাতসারেই তাহার বায়ুধারণের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়,—হিন্দু যোগীদের সর্ব্বসম্মতিতে যাহা সুনিশ্চিতই জীবনের দীর্ঘায়ুতাসম্পাদক। মানসিক সুফল এই যে, ইহা বিনা প্রয়াসে মনের চঞ্চলতা প্রশমিত করে এবং চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তিকে তাহার অজ্ঞাতসারে ধীর, স্থির এবং

অচঞ্চল করিতে থাকে। আধ্যাত্মিক সুফল এই যে, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ববোধের সহিত ভগবৎ-সত্তাবোধের ক্রমশঃ নিরতিশয় নৈকট্য এবং পরিশেষে অদ্বৈতোপলব্ধি এত সহজে শুধু শুষ্ক বিচার দ্বারা বা শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা কখনই ঘটিতে পারে না, এমন কি অন্যান্য পন্থায় সাধন করিয়াও এত সহজে এই উন্নত উপলব্ধির নাগাল কেহ পাইয়াছেন বলিয়া বিচক্ষণ সাধকগণের মুখেও কখনও শ্রুত হওয়া যায় নাই।"

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের অদ্বৈতোপলব্ধি

"শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের দ্বারা যে অদ্বৈতোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, তাহা 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা'—গোছের নহে, আমিই আছি, আর কিছুই নাই,—গোছেরও নহে;—পরন্তু এই উপলব্ধিতে জগদ্বিকাশের প্রত্যেকটী স্তর পূর্ণ সত্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাঁহাতে আর আমাতে মিলিয়া যে মিলন-সোহাগ-মধুর অদ্বৈত-বোধ, আর তাঁহাতে আমি ডুবিয়া গিয়া নিজ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়া একমাত্র তিনি-ময় হইয়া যাওয়ার দরুণ যে আত্মবিলোপ-মূলক অদ্বৈত-বোধ এবং আমাতে আসিয়া তিনি নিজেকে এমন ভাবে লুকাইলেন যে, কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও একমাত্র আমি ছাড়া আর কিছু নাই, এই অহং-বোধ-প্রসারিত যে অদ্বৈতবোধ,—এই সকল বিচিত্র

বোধই যুগপৎ প্রতিভাসিত হয়। দর্শন-বিজ্ঞানের সকল কলহকে একটী সামঞ্জস্যে আনিয়া নিরাকৃত করিবার সাধনই হইতেছে শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ।"

আমরণ সাধন

"শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ অতীব সহজ বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। জগতে অনেক সময়ে সহজ কার্য্যগুলিই সবচেয়ে কঠিন হইয়া থাকে। মনের একান্ত অনুগত ভাব ব্যতীত শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কখনও সহজ কার্য্য হয় না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে বলিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপকে 'সহজ-সাধন' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু মরণ-কাল পর্য্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবে বলিয়া এই সাধনকে 'আমরণ-সাধন' আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। জন্মকালে যে শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়াছ, তখন কি জানিয়াছ যে, সঙ্গে সঙ্গে নামজপ চালাইতে হইবে? আজ জানিয়াছ এবং মরণকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলে শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ চালাইতে সমর্থ হইবে। সুতরাং ইহাকে 'আমরণ সাধন' বলাই শ্রেয়ঃ। সাময়িক অসুখ-বিসুখে শরীর দুর্ব্বল, অবসন্ন বা শ্বাসকষ্ট হইলে অবশ্য শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ আপাততঃ পরিহার করিবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখ যেন মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটী ভগবানের পরম পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ফেলিতে পার।"

মরণ-কালের মহাকার্য্য

"জীবন ভরিয়া কে কি করিলাম আর না করিলাম, তাহা যদিও একান্ত উপেক্ষার কথা নহে, কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মরণকালে কে কি করিয়া চলিয়া গেলাম, ইহাই জীবনের সবচেয়ে বড় কথা। মরণকালে কি বিষয়-বাসনায় জর্জ্জরিত চিত্ত লইয়া ভগবানকে ভুলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে, বা বিষয় ভুলিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের দিব্য স্মৃতিকেই চিত্তে উদ্দীপিত রাখিয়া হরি-ওঁ স্মরিতে স্মরিতে জয়যাত্রা করিবে? মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুশ্চিন্তার বিষয় আমি আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু জীবন ভরিয়া যে শ্বাস-প্রশ্বাসে নামের সেবা করিতে চেষ্টা করে নাই, মরণকালে হঠাৎ কি করিয়া তাহার শেষ নিঃশ্বাস ভগবানের নাম করিয়া বসিবে? অবশ্য, অঘটন জগতে অজস্র ঘটিতেছে, কিন্তু অঘটনের আশায় হাত-পা ছাড়িয়া না দিয়া স্বাভাবিক নিয়মে যাহা ঘটিতে পারে, তাহার জন্যই নিজেকে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত করিতে থাকা সর্ব্বোত্তম কার্য্য। মরণকালে মহাকার্য্য উদ্‌যাপনে যাহাতে না অসমর্থ হও, তাহারই জন্য জীবৎকালে অবিশ্রাম নামের অনুশীলন চালাও।"

সিনি জংশন

২১শে ভাদ্র, ১৩৪১

কল্য রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি সিনি আসিয়াছেন। সিনি ষ্টেশনের বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজী রেল-কর্ম্মচারীরা ষ্টেশনে শ্রীশ্রীবাবামণিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং একজন রিলিভিং ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অদ্য প্রাতে সাতটার সময়ে জিজ্ঞাসু ভদ্রলোকেরা সমবেত হইয়াছেন। একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক ইহাদের মুখপাত্র-রূপে শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানা প্রশ্ন করিতেছেন।

ভগবদ্দর্শী ও ভগবদ্ভক্ত

প্রশ্ন হইল,—ভগবদ্দর্শী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, না ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে ভক্তি ব্যতীত ভগবদ্দর্শন হয় না। আর ভগবদ্দর্শী ব্যক্তির ভিতরে ভগবানে পরিপূর্ণ ভক্তি বিরাজমান। ভগবদ্দর্শী আর ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের প্রশ্ন ওঠেই না।

আসক্তি-নাশের উপায়

প্রশ্ন—সংসারের প্রতি আসক্তি নাশের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অজ্ঞানতাই আসক্তির মূল। সুতরাং অজ্ঞান-বিনাশের চেষ্টাই আসক্তি নাশের উপায়।

অজ্ঞান-বিনাশের উপায়

প্রশ্ন?—অজ্ঞান-বিনাশের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সংসার যে অনিত্য, এই চিন্তা বারংবার করা। কিন্তু এই উপায় শুষ্ক। ভগবানই যে একমাত্র নিত্য, এই চিন্তা বারংবার করা। এই উপায় মধুর এবং রসাল।

পরোপকারের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন।—পরোপকারের প্রয়োজনীয়তা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা করাই হচ্ছে পরোপকার চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু পরোপকার তুমি যতই কর, জীব যদি নিজের দুঃখ নিজে দূর কত্তে চেষ্টা না করে, বাইরে থেকে তুমি গিয়ে তার দুঃখ কত দূর কর্ব্বে? আজ অন্ন দিয়ে যার ক্ষুধা নিবারণ কর্ল্লে, সে যদি নিজের অন্ন নিজে রুজি কত্তে না শেখে, তবে কালও তোমাকে অন্নপাত্র নিয়ে তার কাছে যেতে হবে।

শ্রেষ্ঠ পরোপকার

প্রশ্ন।—শ্রেষ্ঠ পরোপকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—জীবকে ভগবন্মুখ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পরোপকার, আর তাকে ভগবান্ থেকে বিমুখ করাই হচ্ছে, পরের শ্রেষ্ঠ অপকার। ভগবৎ-প্রেমের উন্মেষে বাধা দেওয়া হচ্ছে পরের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর অপকার এবং তার ভগবৎ-প্রেমের বাধাগুলিকে অপসারিত ক'রে দিয়ে তাকে সহজে, অনায়াসে, পূর্ণ উৎসাহে ভগবৎ প্রেম-পথাভিমুখী ক'রে দেওয়াই হচ্ছে তার প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার।

জাগতিক পরোপকার এবং পারমার্থিক পরোপকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাগতিক পরোপকার আর পারমার্থিক পরোপকার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য এই যে, জাগতিক পরোপকার কত্তে গেলে একজনের অপকার ছাড়া আর একজনের উপকার সাধারণতঃ বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু পারমার্থিক পরোপকারের বিশেষত্ব এই যে, একজনের উপকারে অপরের অপকার নেই। বরং প্রত্যক্ষে পরোক্ষে অপরের উপকার অবশ্যম্ভাবী।

স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ ভগবৎপ্রেম

প্রশ্ন।—ভগবৎ-প্রেমে কি স্বার্থপরতা থাক্‌তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব পারে। ভগবান্‌কে ডাক্‌লে আমার

সুখ হয়, তৃপ্তি হয়, আনন্দ হয়, সুতরাং আমি ভগবান্‌কে ডাকি। এইটাই যেখানে আমার ভগবৎ সেবার প্রেরয়িতা, সেখানে আমার ভগবৎপ্রেম স্বার্থপরতা বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু ভগবানকে সেবা দিব তাঁরই প্রীতির জন্য, আমার তৃপ্তির জন্য নয়, এই রূপ যে ভগবৎ-সেবা, তাকেই বলা চলে নিষ্কাম ভগবৎ-সেবা বা প্রেম। প্রেমে স্বার্থপরতার বা নিজেকে তৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষার কোনো স্থানই নেই। আমি আমার ঠাকুরের সেবা কচ্ছি, এতে আমার ভিতরে সুগভীর সাত্ত্বিক ভাব সমূহের সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল, হাত কাঁপল, পা কাঁপল, কেমন আনন্দময় অনুভূতি সব হ'তে লাগ্‌ল এবং প্রেমানন্দের আতিশয্যে হাত থেকে পাখা প'ড়ে গেল, আরতির বাতি স্খলিত হ'ল। এতে যদি আমার মনে ধিক্কার না আসে এবং নিজের সুখানুভূতির চেয়েও বড় ব'লে সেবাকার্য্যটিকে যদি মনে কত্তে না পারি, তাহ'লে আমি স্বার্থপর সেবক। আর, আমার সেবাকার্য্য যাতে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হ'তে পারে, তার জন্যই যদি নিষ্কপট চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কত্তে পারি,—"হে ভগবান্, আমাকে সাত্ত্বিক আনন্দের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রেখেও তোমার সেবাকার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করার সমর্থ্য দাও", তবে বুঝা যাবে যে, আমি সত্যই প্রেমিক, আমার প্রেমে ভেজাল নেই।

অশ্রু ও প্রেম

প্রশ্ন।—অনেক ভগবৎ-সেবক ব্যক্তির চ'খে অশ্রু দেখা যায়। এটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অশ্রু অনেক সময়ে প্রেমের লক্ষণ, অনেক সময়ে অভ্যাসজাত ব্যাপার, কিন্তু কোনও সময়েই প্রেমের স্বরূপ নয়। প্রেমের স্বরূপ হচ্ছে নিজসুখে অভিলাষহীন ভগবৎ-সুখে অভিলাষযুক্ত নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োজন।

জাগতিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—জাগতিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমাদের কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যেখানে জাগতিক প্রতিষ্ঠা নিজের কোনও চেষ্টা ব্যতীত আপনি এসে যাচ্ছে, সেখানে নিজেকে লুকিয়ে লাভ নেই, কেন না, প্রতিষ্ঠার যে যোগ্য, প্রতিষ্ঠা-দেবী তাকে বনের গহন অংশ থেকেও খুঁজে বের ক'রে বরমাল্য গলদেশে অর্পণ কর্‌বেই। কিন্তু যে এল, সে দুদিন পরে থাক্‌বে না, এই বোধ রেখেই প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারেরা প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠার ন্যায় অপবিত্র জ্ঞানে বর্জ্জন কত্তে বলেছেন। কিন্তু বর্জ্জন কর্ল্লে কি হবে? প্রতিষ্ঠার যে যোগ্য, তার কাছে প্রতিষ্ঠা এসে পায়ের তলায় মাথা-কপাল খুঁড়ে মরবেই।

জাগতিক প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা দমনের উপায়

প্রশ্ন।—মন জাগতিক প্রতিষ্ঠার জন্য লালসাপরায়ণ হ'লে কি করণীয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথমতঃ বিচার্য্য প্রতিষ্ঠার অনিত্যতা। মহাবিক্রমী রাম সীতাকে উদ্ধার ক'রে অযোধ্যায় ফিরলেন, দেশ জুড়ে জয়ধ্বনি হ'ল,—"ধন্য বীর রামচন্দ্র", কিন্তু দুদিন পরেই তাঁর নামে অপবাদ হ'ল যে, তিনি ঘোরতর স্ত্রৈণ এবং এজন্যই অসতী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর কত্তেও বাধ্‌ছে না। লোকপ্রতিষ্ঠার পরমায়ু এইরূপই ক্ষণস্থায়ী। প্রফেসার রামমূর্ত্তি মস্ত বড় বীর, বুকের উপরে পোষা হাতী রাখেন, একখানা মটরকার চলন্ত অবস্থায় টেনে ধ'রে রাখেন, দেশ-জোড়া তার কি অসম্ভব খ্যাতি। কিন্তু দুদিন না যেতেই ভীম ভবানী বন্য হস্তী বুকের উপরে রাখ্‌লেন, দুখানা চলন্ত মটর-কার টেনে রাখ্‌লেন। রামমূর্ত্তির যশ নিমেষে যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। জাগতিক প্রতিষ্ঠা এইরূপই অনিশ্চিত। মূহূর্ত্তের জন্য একজন প্রতিষ্ঠা লাভ কর্ল্ল, কিন্তু তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আত্মগোপন কর্ল্ল। এসব দেখে, এসব বিচার ক'রে মনকে প্রতিষ্ঠালোভ থেকে ফিরাতে হবে। তাতেও যদি সম্যক্ সুফল না পাওয়া যায়, তা' হলে ভগবানের কাছে সকাতর প্রার্থনা কত্তে হবে,—"হে ভগবান্,

তোমারি চরণ-সেবার যোগ্যতা লাভের জন্য আমার মনকে তুমি যশঃ প্রলোভন থেকে রক্ষা কর।” একান্ত চিত্তে যে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, ভগবান্ তাকে রক্ষা করেন।

প্রণবই শ্রেষ্ঠ নাম

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানের কোন্ নাম জপের পক্ষে শ্রেষ্ঠ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে নামে সকল নামের সমন্বয়, সকল নামের সমুচ্চয়, সকল মতের স্বীকৃতি, সকল পথের সম্মান, সে নামই ভগবানের শ্রেষ্ঠ নাম। কেন না, সে নাম সকলের উপযোগী।

প্রশ্ন।—সেটি কোন্ নাম?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সেটি ভগবানের ওঙ্কার নাম, প্রণব-মন্ত্র।

প্রণবের অধিকার

প্রশ্ন।—সবাই কি সে নাম কত্তে অধিকারী? শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণেরা কি কাউকে সে নাম কত্তে নিষেধ করেন নি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ব্রাহ্মণেরা নিষেধ করেছেন। কিন্তু নিজেরা আবার অনেকেই এই নামের সাধনা না ক'রে অন্যান্য নাম ও মন্ত্রের সাধনা করেছেন। ফলে তাঁরা প্রণব-মন্ত্রের সিন্দুকই পাহারা দিয়েছেন, সাধনার পুণ্যফল পান নি।

শাস্ত্রের কথা তুলতে গেলে বড়ই বিপদ ঘটে। শাস্ত্রবচনের সহজ সরল মানে যদি কোথাও অব্রাহ্মণ-সন্তানের প্রণবাধিকারের অনুকূলে আসার সম্ভাবনা দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে মহাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা এমন সব ভাষ্য-রচনা ক'রে বসেন, যাতে অন্য অর্থ মেনে নিতে হয়। তথাপি পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ। একদল পণ্ডিত শাস্ত্র-সমুদ্র থেকে যদি মণিমুক্তা আহরণ ক'রে দেখাতে গেলেন, অমনি অন্যদল পণ্ডিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'রে মকর-কুম্ভীর হাঙ্গর-অক্টোপাস দেখিয়ে দেবেন। সুতরাং তোমার আর আমার মতন অপণ্ডিত সাধারণ মানুষের ঐ সব জ্ঞানের কথায় গিয়ে লাভ নেই। রুচি যদি হয়, প্রণব-মন্ত্র জপ ক'রেই দেখ না কেন? রুচি যদি না হয়, অন্য নামে ভগবানকে ডাক। প্রণব ভগবানের সর্ব্বসমন্বয়ী নাম। যার ভাল লাগ্‌বে, সে তা জপ কর্ব্বেই,—কেউ নিষেধ করেছেন ব'লেই সে থেমে থাক্‌বে না। প্রণবের যে সাধন কর্ব্বে, প্রণবে তারই অধিকার। যে সাধন কর্ব্বে না, তার আবার এতে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন আসে কি ক'রে? যে সাধন কর্ব্বে না, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেও তার অধিকার নেই বলেই বুঝতে হবে। অধিকার নেই বলেই ত' সে ব্রাহ্মণের সন্তান হ'য়েও ইষ্ট-মন্ত্র রূপে অন্য নামই জপ করে।

অন্যমন্ত্র জপকারীরা কি হেয়

প্রশ্ন।—অন্য মন্ত্র জপ করে ব'লেই কি সে হেয় হ'ল?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়ই না। তিনি যদি তাঁর স্বীয় মন্ত্র নিষ্ঠাপূর্ব্বক, ভক্তিসহকারে, অনন্যব্রত হ'য়ে জপ করেন, তা হ'লে, তিনি মানুষমাত্রেরই পূজ্য হবেন। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত জগৎপূজ্য,—তাঁর সেই ভগবদ্ভক্তি যেই নামের আশ্রয়েই সৃষ্ট, পুষ্ট ও বিকশিত হোক্ না কেন।

প্রণব সকল নামের প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর একটি পরম সত্য মনে রেখো যে, সকল নামেরই অতি প্রচ্ছন্ন একটি প্রাণ আছে। সেই প্রাণ সকল ক্ষেত্রেই এক। যেমন আমার প্রাণ, তোমার প্রাণ, রামের প্রাণ, শ্যামের প্রাণ, সকলেরই প্রাণই এক বস্তু, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র, সকলেরই প্রাণবস্তু এক। সেইটী হচ্ছে প্রণব। সুতরাং যে নামই জপ কর, আত্যন্তিকী সাধনা কত্তে কত্তে প্রণবে গিয়ে তোমাকে পৌছুতে হবে, প্রণব তোমার আস্বাদনে, তোমার উপলব্ধিতে সুনিশ্চিত এসে যাবেন। এই কারণেই কোনো নামের একাগ্র সাধককেই অশ্রদ্ধা করা চল্তে পারে না। জগতে কোনো মত, কোনো পথ, কোনো মন্ত্র, কোনো তন্ত্রই তুচ্ছ নয়।

জামসেদপুর (সিংভূম)
২২ ভাদ্র, ১৩৪১

কল্য দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি জামসেদপুর আসিয়া পৌছিয়াছেন। বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত.............মুখোপাধ্যায়

তাঁহার জামসেদপুরস্থ বাসা-বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

আসন-মুদ্রা ও মনের একাগ্রতা

শ্রীশ্রীবাবামণি সমাগত ব্যক্তিদিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শন করিতেছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন, আসনমুদ্রাদি ত' দৈহিক ব্যাপার। এসবের অভ্যাস দ্বারা কি মনকে দেহমুখ করা হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহের পটুতা না থাক্‌লে মনের স্থিরতাসাধন কঠিন। এই কারণে, দেহের যেরূপ পটুতা সম্পাদন কর্‌লে মনকে সহজে স্থির করা যাবে, এমন উপায়-সমূহ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যদের উদ্ভাবন কত্তে হয়েছিল। সেই উদ্ভাবন-চেষ্টার ফলই হচ্ছে অধিকাংশ আসন-মুদ্রা। কতকগুলি আসন বা মুদ্রা আছে, যা প্রকৃত প্রস্তাবে কসরৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন, কুস্তি করলে শরীর সবল হয়, কিন্তু তাতে মনকে এককেন্দ্রক করবার কোনও প্রত্যক্ষ সহায়তা হয় না। যে সব আসন-মুদ্রার অভ্যাসে মনকে এককেন্দ্রক করার সহায়তা হয়, যোগীরা সেইগুলিকেই শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। যথা,—পদ্মাসন, মহামুদ্রা। কোনও মুদ্রার অভ্যাসে অতি দ্রুত কামভাব প্রশমিত হয়। যথা,—অশ্বিনীমুদ্রা। কোনও মুদ্রার অভ্যাসে সহজে শুক্রের ক্ষয়-প্রবণতা ক'মে আসে। যথা,—সন্দীপনী মুদ্রা। শুক্রের ক্ষয়ে

চিত্তে চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। অতএব, সন্দীপনী মুদ্রার দ্বারা পরোক্ষ ভাবে মনকে এককেন্দ্রক করারই সাহায্য করা হ'ল। কোনও মুদ্রার অভ্যাসে মন ঊর্দ্ধগামী হয়। যথা,—যোনিমুদ্রা। কোনও মুদ্রার অভ্যাসে ঊর্দ্ধগামী মনকে ঊর্দ্ধদেশেই দীর্ঘকাল ধ'রে রাখা যায়, মনের নিম্নগামিনী প্রবৃত্তি কতকটা রোখা যায়। যথা,—খেচরী মুদ্রা।

আসন-মুদ্রাভ্যাসে এবং কুস্তি-কসরতে পার্থক্য

অতঃপর অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসন-মুদ্রা প্রথমে অল্প অল্প ক'রেই অভ্যাস কত্তে হয়, একদিন হঠাৎ অনেক কত্তে নেই। ক্রমশঃ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এমন স্থানে যাওয়া দরকার, যাতে স্বল্প সময়ে মনটা যে একাগ্র হ'য়ে আসছে, এইটী স্পষ্ট অনুভব করা যায়। কুস্তিগীর পালোয়ানদের ব্যায়াম-চর্চ্চার সঙ্গে আসন-মুদ্রাভ্যাসকারীদের অভ্যাসের এইখানেই বিশেষ পার্থক্য। একজন পালোয়ানকে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত দৈনিক দুই ঘন্টা কসরৎ কত্তে হয়। আসন-মুদ্রাভ্যাসীর তা নয়। মনের একাগ্রতার দিকে তাকিয়েই তার এই শারীরিক ক্রিয়া-সমূহের অনুশীলন। মনের একাগ্রতা আসিয়া গেল ত' আসল উদ্দেশ্য সফল হ'ল।

পারিবারিক কলহের বিপদ

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত হোদল-নারায়ণপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পারিবারিক কলহ অপেক্ষা আত্মঘাতী বস্তু জগতে আর অল্পই আছে। বাহিরের পৃথিবীতে সংগ্রাম করিয়া দুই মুষ্টি অন্ন আহরণ করিয়া গৃহে নিয়া আইস নির্ব্বিঘ্নে তাহা খাইবে বলিয়া, কিন্তু গৃহকলহ তাহার স্বাদ তিক্ত করিয়া দেয়, অমৃতমধুর বস্তুকেও বিষময় করিয়া তোলে। বাহিরের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে যে প্রাণপণ লড়াই করিয়াছিলে এবং সেই সংগ্রামের সময়ে যত আঁচড়, যত কামড়, যত আঘাত, যত বেদনা পাইয়াছ, সবই যে গৃহের নিরাপদ শান্তিময় জীবনটুকু প্রত্যাশা করিয়া, একথা গৃহে আসিয়া ভুলিয়া যাইও না। পৃথিবী ধ্বংস হউক কিন্তু তোমাকে গৃহের শান্তি রাখিতেই হইবে। স্ত্রী দুঃশীলা মুখরা কটুভাষিণী হইতে পারে, তবু তোমাকে কলহের কারণ অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে। অপিচ, তোমার পক্ষেও অবিবেচনা, ঔদ্ধত্য, অত্যাচার-প্রিয়তা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। দোষ যখন মাত্র একদিকে থাকে, তখন কলহ আর দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। দোষ যখন থাকে দুই দিকে, তখন কলহের অগ্নি অবিরাম তাহার লেলিহান রসনাকে বিস্তারিত করিতে থাকে

এবং একেবারে চিতার অনলকে স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত থামে না। নিজের দোষে যাহাতে এমন প্রাণান্তকর কোনও পরিস্থিতি সৃষ্ট না হয়, তার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নশীল থাকিও। কলহপ্রবণ মানুষ টোটাভরা বন্দুকের ন্যায়ই বিপজ্জনক,— সামান্য কারণে কোন্ সময়ে কি ভাবে যে কাহার প্রাণহানি ঘটাইয়া দেয়, কেহ বলিতে পারে না। চরিত্র হইতে কলহ-পরায়ণতা দুর করিয়া দাও, নতুবা জীবনে শান্তি পাইবার আশা রাখিও না। সব কিছুতেই রুখিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি অতি বিপজ্জনক এবং পরিণামে মহৎ দুঃখের জনিকা। যে যতটুকু পার, কেবল সহিয়া যাও। সহ্যশক্তির গুণে অনেক অশান্তি দমিত হইবে। কলহ-শান্তির মূলই হইল রসনা-সংযম। যে তোমাকে অসম্মান করিয়াছে, তাহাকেও রুক্ষ প্রতিবাদ শুনাইও না, প্রতিবেশীদের কাণেও নিয়া এ কদর্য্য কাহিনী ঢালিও না। অন্তরের বেদনা লুকাইয়া রাখিয়া চলিতে না শিখিলে এ জীবনে কলহের হাত হইতে মুক্তি পাইবে না। এ বেদনা ভগবানের কাছে অর্পণ কর, মানুষের নিকটে গাহিয়া বেড়াইও না। যে স্ত্রী কিম্বা যে পুরুষ পারিবারিক কলহের কাহিনী লোকের নিকটে কহিয়া বেড়ায়, সে ক্ষুদ্র ক্ষতকে বৃহৎ করে, স্বল্প বেদনাকে অধিক করে, সামান্য অপমানকে অসামান্য করে। ঘরের ভিতরে কলহ মিটিয়া

গেলেও তখন বাহিরের লোক আসিয়া উস্কানি দিয়া নূতন কলহের সৃষ্টি করে। আর, লোকলজ্জার কথাও ভাবিয়া দেখিও। ঘরের বিচ্ছেদ মিটিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের লোকের মুখগুলিতে লাগাম কষিবে কিসের বলে? সন্তানবান্ দম্পতীর নিজ পুত্রকন্যার হিতের দিকে চাহিয়াও কলহ হইতে বিরত থাকা উচিত। কেননা, এই কলহে দ্বিবিধ ক্ষতি হইতেছে। প্রথম ক্ষতি, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে শিশুগুলি কলহের সব মারাত্মক মার-প্যাঁচ শিখিতেছে,—ইহাতে ইহাদের ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হইবে। যত ভাল ঘরের যেরূপ সুশীলা মেয়েই তোমার ঘরে বধূ হইয়া আসুক, তার জীবনটী তোমার পুত্র নিশ্চিতই মাটী করিবে, আর যত ভাল ঘরে যত ভাল বরেই তোমার কন্যা যাউক, শান্তির নীড় অশান্তির অনলে দগ্ধ করিয়া সে ছাড়িবে, লক্ষ্মীর সংসারে অলক্ষ্মীর হাট বসাইবে, সুখী পরিবারকে সে দুঃখে কণ্টকাঘাতে জীর্ণ করিয়া দিবে। দ্বিতীয় ক্ষতি,—রাস্তা দিয়া তোমার পুত্রকন্যারা চলিবে লোকে অঙ্গুলী-হেলনে বলিবে,—ঐ দেখ ঝগড়াটে দম্পতীর পুত্র-কন্যা।' একথা কর্ণে প্রবেশ করিতে করিতে তোমার পুত্রকন্যাদের আত্মসম্মানবোধ ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। ফলে, হয় তাহারা নূতন করিয়া পথের লোকের সঙ্গে কলহ করিবে নতুবা তাহারা অন্তরের ভিতরে নিজেদের হীনতা সম্পর্কে

সর্ব্বদাই সচেতন থাকার দরুণে পরাজিতের মনোবৃত্তি গ্রহণ করিবে। উভয়ই পরম ক্ষতি।

কলহ-প্রবৃত্তি কিসে কমে

"জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কলহ-প্রবৃত্তি কিসে কমে? আমার একমাত্র উত্তর এই যে, ভগবানের মুখপানে তাকাইয়া চলার অভ্যাসই কলহপ্রবৃত্তির সমূলে বিনাশের উপায়। ক্ষমা বল, সহিষ্ণুতা বল, আত্মাপরাধ অন্বেষণ বল, প্রতিপক্ষের প্রতি বিনয় বল, সবই এই একটি অভ্যাস হইতে আসিবে। দশটী কটু কথা কাণ পাতিয়া শোন, কিন্তু একটি কথা কহিবার আগে শতবার ভগবানের মুখপানে তাকাও। কটুকথার সদুত্তর তিনিই কি দিতে পারেন না? অন্তরের নিদারুণ ক্ষোভ কি কটুতর কথা শুনাইয়া দিলেই চলিয়া যাইবে, না, ভগবানের উপরে ভার দিয়া রাখিলে ভাল হইবে? অবিরাম যে অবিচার চলিতেছে, তার পঙ্কিল উৎসমুখ কি তোমার চোপার জোরে বন্ধ হইতে পারে? অতীতে কি কখনও হইয়াছে? না, ভগবান্ ইচ্ছা করিলে তাহা আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। অকারণে যে নিদারুণ কলহের উৎপত্তি হইল, ভগবদিচ্ছা হইলে কি চেষ্টা ছাড়া, প্রতিশোধ ছাড়া, অধিকতর তিক্ততার সৃষ্টি ছাড়া এই কলহ মিটিয়া যাইতে পারে না? দুরাত্মাকে সদাত্মা করিবার ক্ষমতা কি তোমার আছে? না, ভগবান্

ইচ্ছা করিলে যে-কোনও মুহূর্ত্তে যে-কোনও দুঃশীল ও দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে সুশীল ও সুশান্ত করিয়া দিতে পারেন? এই ভাবে বিচার করিবে এবং যাহা তোমার অসাধ্য, তাহা তাঁহার সুসাধ্য জানিয়া একমাত্র তাঁহার ইচ্ছার চরণে আত্মসমর্পণ করিবে। 'হে ভগবান' আমাকে দলিত মথিত নির্জ্জিত করিয়াই যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে লাঞ্ছিত গঞ্জিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত করিয়াই যদি তোমার প্রাণে আনন্দ পাও, তবে তোমার সুখেই আমার সুখ ইউক, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ ইউক,—আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইয়া তোমার প্রতি দ্রোহ ঘোষণা করিতে পারিব না,—এই ভাব অবিরাম অন্তরে পোষণ কর। দেখিবে, ইহাতে তোমার কলহ-প্রবৃত্তি কত দ্রুত দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

কলহান্তরিতের কপটতা

"নিদারুণ কলহের পরে কলহান্তরিত প্রীতি সংস্থাপন আরও এক কঠিন কার্য্য। বাহিরের লোকের সহিত কহলের পরে যখন আপোষ রফা হয়, তখন উভয় পক্ষই একমাত্র কলহের দিগ্‌দারী হইতে বাঁচিবার জন্য আপোষ করে, সুতরাং এই আপোষ সংঘটন করিবার জন্য কাহাকে কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইহা কতকটা বিবেচনার বাহিরে চলিয়া যায় এবং আপোষকারী উভয় পক্ষই, 'অপরের ক্ষতি

অপেক্ষা আমার ক্ষতি অল্প হইয়াছে'—এইরূপ এক মনোভাবের অনুশীলন করিয়া ক্ষতির ক্লেশটাকে দাবাইয়া রাখেন। কিন্তু পরিবারস্থ প্রিয়জন গণের মধ্যে কোনও কলহ হইলে মিটমাটের পরে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দাবী হইয়া দাঁড়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেম-প্রীতির গভীরতা। অথচ কলহে প্রেম বাড়ে না, তাহাই চূড়ান্ত বিক্রম সহকারে করিয়া, মিটমাটের পরে প্রেমের বৃদ্ধি দাবী করা এক অন্যায্য ব্যাপার। কিন্তু এই অন্যায্য ব্যাপারটাই প্রিয়জন সম্পর্কে প্রিয়জনের স্বাভাবিক আচরণ হইয়া রহিয়াছে। তখন আপোষের খাতিরে কপটতা করিয়া প্রিয়জনকে প্রিয়জনের জন্য অধিক দরদ, অধিক প্রীতি, অধিক ভালবাসা, অধিক মনোযোগ দেখাইতে হইবে। এই কপটতা অনেককে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দেয়, অনেককে ভালবাসার অনুশীলনে অধিকতর দক্ষ করে,—অর্থাৎ, ইহা কাহারও কাহারও পক্ষে অহিতকর, কাহারও পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে, সুনিশ্চিতরূপে প্রত্যেকের পক্ষে হিতকর হয় না। পবিত্রতার ব্রতে আবদ্ধ দম্পতী কলহ করিল, কলহ মিটিয়া যাইবার পরে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি প্রাণের গভীর প্রীতি প্রদর্শনের জন্য পবিত্রতার ব্রত ভঙ্গ করিল, স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি গভীর প্রীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই ব্রতের বিধানানুযায়ী স্বামীকে তিলমাত্র বাধা প্রদান করিল না, পরিপূর্ণ সহযোগ দিল। উভয়েই কপটতা করিল, কিন্তু গৃহীত ব্রতের মর্য্যাদা গেল। এই সকল কারণেই সৎপথাশ্রিত

দম্পতীর কোনও অবস্থাতেই কলহে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কলহ করিলেই কলহ মিটাইবার সময়ে কিছু অতিরিক্ত নত হইতে হইবে, কিছু অতিরিক্ত ক্ষতি বরণ করিতে হইবে।"

সৎকার্য্যে সহযোগ ও চিত্তের অশুদ্ধতা

নোয়াখালী জেলান্তর্গত সোণাপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকার্য্যে লোকের সহযোগ পাইতেছ না বলিয়া দুঃখ করিতেছ, কিন্তু বাছা, সৎকার্য্যে সহযোগ কি সকলেই দিতে পারে? না, সকলেরই এইরূপ সদ্‌রুচি হয়? দুনিয়া অশুদ্ধচেতা নরনারীতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চিত্ত যাহার অশুদ্ধ, সৎকার্য্যে সহযোগ দিতে তাহার রুচিই বা হইবে কেন, সামর্থ্যই বা হইবে কি করিয়া? ইহা বুঝিয়া মনের ক্ষোভ দূর কর। পার যদি, অপরের চিত্তে শুদ্ধতা-সঞ্চারের জন্য সদুপায় গ্রহণ কর এবং স্বয়ং যেটুকু সৎকার্য্য করিবার তাগিদ অন্তরে অনুভব করিতেছ, আপাততঃ একাই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া যাও।

অশুদ্ধচেতার দানে বিপদ

"আর, অশুদ্ধচেতারা সহযোগ দিলেও তাহাতে যে কত অনর্থ ঘটিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। আমি ত' পুপুন্‌কী

আশ্রমটার জন্য এক কপর্দ্দকও সাহায্য কখনও কাহারও নিকট চাহি নাই। প্রণামী বলিয়া দুই চারি মুদ্রা যাহা এতগুলি বছরে আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বসাকল্যে এই সাত বৎসরে কত টাকা পর্য্যন্ত যাইবে, তাঁহার হিসাব খুঁজিতে একজন অঙ্কনবীশের প্রাণ থাকিবে কি না, সন্দেহের কথা। হিসাবের খাতা খুলিলে পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর পাতা পরে কদাচিৎ দুই আনা বা চারি আনা প্রণামীর বার্ত্তা মিলিবে। কিন্তু বিগত কয়েকটা মাসে আশ্রমের আয়প্রদ বিভাগগুলির মধ্য দিয়া একটা মোটা টাকা আসিয়াছে। অবশ্য, এই আয়প্রদ বিভাগগুলির মধ্যে প্রাণামী, দান বা চাঁদা-সংগ্রহের কোনও স্থান নাই। তবু, তোমাদের প্রতিবেশী এক জেলার কোনও গ্রাম হইতে তোমাদেরই ন্যায় সমাজহিতৈষী এক ব্যক্তি আমাকে সুদীর্ঘ এক পত্র লিখিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন যে, আশ্রমের এই আয়টাকে আমি কি ভাবে ব্যয় করিব, তাহা যেন ইঁহাকে অবশ্যই জানান হয়। পত্রলেখক আরও বলিয়াছেন যে, পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোনও পত্রিকা কেন বাহির করা হইল না এবং গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠাইয়া ইঁহাদিগকে কেন নিয়মিত সৎশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করা হয় নাই, এই বিষয়ে আমি যেন কারণ প্রদর্শন করি। ট্রেণে উঠিবার কালে রেলষ্টেশানের ভক্তদের দেখাদেখি যে সকল অজানা লোক প্রণাম করিবার জন্য ভীড় করে এবং আমি আমার ঝোল্‌না হইতে কলাটা কমলাটা তুলিয়া

নিয়া প্রসাদ দেই, সেই সকল লোকের সহিত আমার বাধ্যবাধকতা যতটা, এই পত্রলেখকের সহিত বাধ্যবাধকতা তাহা অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু দেখ, এক পয়সা কখনও দান না করিয়াও কৈফিয়ৎ চাহিবার বেলায় কণ্ঠের জোর মেঘ-গর্জ্জনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তৃত্বলিপ্সা ও হাম-বড়াই এমনই অদ্ভুত চীজ। কেহ হয়ত তোমার সদনুষ্ঠানে কিছু দান-দাক্ষিণ্য করিবেন কিন্তু একদিনের দানের জন্য তোমার চৌদ্দপুরুষকে অনন্তকালের জন্য যে কিনিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ অভিমান অন্তরে পোষণ করিবেন। এইরূপ লোকদের দান গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি না বাড়িয়া অশান্তি বাড়িবে, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ না বাড়িয়া বিপদ বাড়িবে। সুতরাং তোমার কার্য্যে অশুদ্ধচেতা ব্যক্তিরা সহযোগ যত কম করেন, ততই ত' ভাল! তুমি এজন্য দুঃখবোধ করিতেছ কেন?

অহমিকা-বর্জ্জিত দান

"সেবা করিব কিন্তু অহমিকা রাখিব না, এই রূপ সেবক জগতে কয়জন? অধিকাংশ দাতার দানই ত' অহঙ্কারের পূজা। কৃপণকে দাতা বলিলে, লম্পটকে জিতেন্দ্রিয় বলিলে, কাণাকে পদ্মলোচন বলিলে, তোত্‌লাকে বাগ্মিপ্রবর বলিলে এই তোষামোদের জোরে যে দান পাওয়া যায়, তাহা কি পবিত্র বস্তু? নিজের নাম-গোত্রের পরিচয় রাখিব না; কর্ম্মীরা

কর্ম্ম করিয়া যাউন, আমি নিজেকে অলক্ষ্যে রাখিয়া তাঁহাদের হস্তে ছাড়িয়া দিব; পত্রিকায় নাম উঠিল কি না, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে আমার এই দানের কথা মুদ্রিত হইল কি না, সেই সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ উদাসীন থাকিব; যাহা দিয়াছি, তাহা পুনরায় তুলিয়া আনিবার জন্য ফন্দী-ফিকির খুঁজিব না, সৎপাত্রে দিলেও দিয়াছি, অসৎপাত্রে দিলেও দিয়াছি, দান করিয়া মনে আর অনুতাপের লেশমাত্র রাখিব না; আমার দানের কোনও সাক্ষী থাকিবে না, কেবল জানিব আমি, আর জানিবে আমার বিমল আত্মপ্রসাদ;—এইরূপ পবিত্র ভাব লইয়া দান কি করিবে তাহারা, যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, পরধর্ম্মে বিদ্বেষী, কদাচারী, অসংযমী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং হীনস্বার্থপর? শুদ্ধচেতাই শুদ্ধভাবে দান করিতে পারেন, অপরে খাঁটি সোণা দিবার সময়েও তাহাতে একটু শূকরী-বিষ্ঠা মাখিয়া দেন। অহমিকাকে বলি দিয়া যে দান, সেই দানের প্রত্যাশা তুমি সর্ব্বত্র কেন করিতেছ?"

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ সোসাইটির হলে একটী বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার নোট রাখা হয় নাই।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বর্ত্তমানের অবনতি দর্শনে ভারতবাসীর হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। হতাশা কর্ম্মে অনুৎসাহ এবং নিরুদ্যমতা এনে দেয়।

বক্তৃতার শেষে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত একটী কবিতার অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করিলেন,—

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার, জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে জন্ম লভিবে ভবিষৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ, শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।

মহাপুরুষ ও সাধারণ মানুষ

দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলী শ্রীশ্রীবাবামণিকে মুখোপাধ্যায়-ভবনে অনুসরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখানেই ত' আর একটা সভা সুরু হ'ল।

জামশেদপুর টাটা-কোম্পানীর বিশাল হাস্পাতালের চীফ সুপারিণ্টেন্ড ডাঃ শ্রীযুক্ত রক্ষিত বলিলেন,—আমরা কল্পনাই কত্তে পারি নি যে, এত বড় একজন মহাপুরুষ জামশেদপুরে পদধূলি প্রদান করেছেন। লোকমুখে শুনেছি, একজন সাধু

'সোসাইটি হলে' বক্তৃতা দেবেন এবং ভেবেছি যে, শ্রোতা যদি একেবারেই না হয়, তবে এটা এ' স্থানের পক্ষে অসম্মানজনক কথা। তাই নিতান্ত ভদ্রতার অনুরোধে সভাতে গিয়েছিলুম। কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লুম, ভুল করেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অর্থাৎ, না গেলেই ভাল হ'ত এই না?

ডাঃ রক্ষিত বলিলেন,—না, না, তা নয়। গিয়ে ভুল করি নি, ধারণাটা ভুল করেছিলাম। অর্থাৎ আমি ভেবেছিলাম যে, সাধারণ একজন লোক এসেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার সাথে সাধারণ লোকের পার্থক্য কোথায়? তাদেরও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, তাদেরও রেলে চড়তে টিকিট লাগে, আমারও লাগে, তারাও নিজ নিজ কর্ম্মফলের বাধ্য, আমারও অবস্থা তাই।

ডাক্তার রক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—একজন মহাপুরুষে এবং একজন সাধারণ লোকে কি কোনও তফাৎ নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছে। কিন্তু সেই পার্থক্য বাহ্যিক নয়, সে পার্থক্য আভ্যন্তরিক। সাধারণ মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাবার তাগিদ আত্মপ্রীতির লক্ষ্যে, মহাপুরুষের আত্মসেবাও ভগবৎপ্রীতির লক্ষ্যে। সাধারণ মানুষ সুখদুঃখ ভোগে আমিত্বের অভিমান নিয়ে, মহাপুরুষের সকল সুখ-

দুঃখ-ভোগ ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য-রূপে। কিন্তু মহাশয়, আমি মহাপুরুষ, নই, আমি সাধারণ মানুষ।

জামশেদপুর

২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১

প্রাতঃকালে আসন-মুদ্রার ক্লাস হইল। সহরের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসন-মুদ্রা-শিক্ষার্থী ভদ্র-সজ্জনেরা আসিয়াছেন। আসন-মুদ্রার শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

স্ত্রীগুরু তথা যোষিৎ-সঙ্গ

একজন বলিলেন,—শাস্ত্রে আছে যে, যোষিৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ কর্ব্বে। এদিকে আবার অনেক স্ত্রীলোককে গুরুর লীলাভিনয় কত্তেও দেখা যাচ্ছে। শাস্ত্রে যখন যোষিৎ-সঙ্গ বর্জ্জন কত্তে বলেছেন, তখন স্ত্রী-গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া কি উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি গুরু, তিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, গুরুই তার একমাত্র নাম, একমাত্র পরিচয় এবং একমাত্র পদবী। তিনি শারীরিক ভাবে স্ত্রী-চিহ্ন, না পুংচিহ্ন ধারণ ক'রে নরদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই প্রশ্ন অবান্তর। গুরু লিঙ্গাতীত সত্য। গুরু ত' একটা দেহ নন, গুরু একটা শক্তি, একটা অবস্থা। সুতরাং স্ত্রীদেহধারিণী মহাভাগবতী সাধিকাকে গুরুরূপে গ্রহণ কর্ল্লে তাতে যোষিৎ-সঙ্গ হয় না। এতে যারা যোষিৎ-সঙ্গ আশঙ্কা করেন, তাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত রুগ্ন ব্যক্তি।

ছোট-হরিদাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পার্থিবাসক্তি-যুক্ত-ভাবে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই যোষিৎ-সঙ্গ। আধ্যাত্মিক ভাবানুপ্রাণিত সঙ্গ যোষিৎসঙ্গ নয়। অবশ্য, ছোট হরিদাস শিখি মাইতির ভগ্নী মাধবী দেবীর কাছ থেকে তণ্ডুল পরিবর্ত্তন ক'রে নিয়ে এসেছিলেন ব'লে শ্রীগৌরাঙ্গ তাকে 'বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন' প্রভৃতি ব'লে চিরতরে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এই আচরণের অর্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে আমরা এই মাত্র বুঝ্‌তে পারি যে, নিষ্প্রয়োজনে বা সমান্য প্রয়োজনে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি কত্তে গেলে ক্রমে তার ফলে আসক্তি এসে পবিত্র বৈরাগ্য-ব্রত নষ্ট ক'রে দেবে, অতএব শুরুতেই ছোট হরিদাসকে একটা শক্ত রকমের শাসন ক'রে নিখিল গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সাবধান প্রত্যেককে হ'তে হবে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাই আবার দুই দলে শ্রীগৌরাঙ্গের এই আচরণের দুই প্রকারের ব্যাখ্যা করেন। একদল আমাদেরই মত সাধারণ ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, ছোট-হরিদাসের প্রতি শাসনের উদ্দেশ্য আদর্শ স্থাপন মাত্র। অন্য দল বলেন,—ছোট-হরিদাসের মনে পাপ এসেছিল, তাই এই শাসন। অবশ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণের বিচার-কার্য্য তাঁদের

দ্বারাই হওয়া ভাল, আমাদের পক্ষে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান-ব্যবহারের ঊর্দ্ধে যাওয়া নিরাপদ নয়।

যোষিৎ-সঙ্গী কে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একথা মানতে হবে যে, মন যদি থাকে আসক্তিযুক্ত, তবেই হবে যোষিৎ-সঙ্গ। নতুবা আমি ষ্টিমারে যাচ্ছি পূজার ছুটীতে গোয়ালনন্দ থেকে চাঁদপুর, আর লোকের ভীড়ের চাপে আমার পৃষ্ঠদেশে এসে একটী সুন্দরী যুবতী হুমড়ী খেয়ে পড়্‌ল—এতেই আমার যোষিৎ-সঙ্গ হ'য়ে যাবে না। মেহার কালীবাড়ীর মেলার সময়ে মাল-গাড়ী বোঝাই হ'য়ে যাত্রী যায়, অনেককে এমন কি গাড়ীর ছাদে পর্য্যন্ত বস্‌তে দেখা গেছে; সেই সময়ে স্ত্রীপুরুষে ঠেলাঠেলি ক'রে বস্‌তে বা দাঁড়াতে সবাই বাধ্য হয়। তেমন অবস্থায় কারো মনে যদি পাপ না থাকে, তবে তাকে যোষিৎ-সঙ্গী বলা অন্যায় হবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে প্রকৃতি-পরিত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীধামে গরুড়স্তম্ভের নিকট থেকে জগন্নাথ-দর্শন কচ্ছেন, এমন সময় এক উড়িয়া স্ত্রীলোক জগন্নাথদর্শন-মানসে অগ্রসর হ'তে গিয়ে একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের স্কন্ধদেশেই নিজের চরণ নিক্ষেপ করেন। এজন্য কি বল্‌তে হবে যে শ্রীগৌরাঙ্গ যোষিৎ-সঙ্গী? আর এক সময়ে দেবদাসী অর্থাৎ দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃতা এক গণিকা গুর্জ্জরী রাগিণীতে গীতগোবিন্দ গাচ্ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই

সুমধুর কৃষ্ণ লীলা গীতি শ্রবণে ইষ্টচিন্তায় উদ্বেলিতহৃদয় হ'য়ে সেই দেবদাসীর পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন। এজন্য কি বল্‌তে হবে শ্রীগৌরাঙ্গ যোষিৎ-সঙ্গী? অন্তরে ভোগ-লালসা নিয়ে স্ত্রীলোকেদের সাথে চক্ষুর, কর্ণের, স্পর্শের, কথোপকথনের বা চিঠিপত্রের সম্পর্ক রাখাই যোষিৎ-সঙ্গ। পিতা কন্যাকে পত্র লিখ্‌ছেন, ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে কথোপকথন কচ্ছেন, স্বামী পত্নীকে ভোগ-লালসা প্ররোচনা ব্যতীত স্পর্শ কচ্ছেন, শ্রোতা তপস্বিনীর মুখে ভাগবতী কথা শুন্‌ছেন, দর্শক দেবভাব নিয়ে দেবী-বিশেষের বা নারী বিশেষের ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি দর্শন কচ্ছেন,—এগুলি যোষিৎ-সঙ্গ নয়। যুষ্‌ ধাতুর মানে সেবা করা। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যেই প্রাকৃত মানব স্ত্রীলোকের, সেবা ক'রে থাকে, এই জন্যই স্ত্রীলোকের অপর নাম যোষিৎ। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ-প্রাপ্তির পরোক্ষ উদ্দেশ্যটুকুও যেখানে নেই, সেখানে স্ত্রীলোকের কাছে গেলেই তা যোষিৎ-সঙ্গ হবে না কিম্বা দুটা কথা বল্লেই তা যোষিৎ-সঙ্গ হবে না। কিন্তু চখে তুমি কখনো দেখ নি অমুক চিত্র তারকাকে কিন্তু মনে মনে তার বলয়িত দেহলতার ধ্যান লালসাযুক্ত ভাবে করেছ,—তুমি যোষিৎ-সঙ্গী। মুখে কখনো কথা বলনি অমুক রমণীটার সঙ্গে কিন্তু তার নামটী কারো মুখ থেকে শোনামাত্র প্রকৃত উত্তেজনায় নিজের ভিতরে মিলন বিরহের নানা সুখদুঃখ সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছ,—তুমি যোষিৎ-সঙ্গী। অমুক মেয়েটী কংগ্রেসের চাঁদা তুল্‌তে তোমার বাড়ীতে

আসেন, অধিক কথাবার্ত্তা বল না তাঁর সঙ্গে, আসা মাত্রই চাঁদাটী দাও, কিন্তু একটী পুরুষ কিম্বা অপর কোনও মেয়ে এলে এত বেশী পরিমাণ চাঁদা দিতে রুচি বোধ কর না,—তুমি একজন প্রচ্ছন্ন যোষিৎ-সঙ্গী। যে অনুরাগ এই পৃথিবীর অপবিত্র মৃত্তিকায় জন্মায়, যে অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হ'তে হ'তে রক্তামংসের ক্ষুধার বিশ্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি ধারণ করে, যে অনুরাগ অপরের নিকটে প্রকাশে লজ্জা অপেক্ষা ভয় থাকে বেশী এবং সঙ্গোপনে যা বুকের রক্ত শুষে নেয়, ঘাড়ের মাংস কাম্‌ড়ে খায়, সেই অনুরাগের ছন্দাংশমাত্রবিজড়িত কোনও তরল ভাব নিয়ে কোনও নারীর প্রতি তোমার চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, দেহ, আচার, ব্যবহার, রুচি, চেষ্টা, মন, প্রাণ বা অনুরাগ ধাবিত হ'লেই তুমি যোষিৎ-সঙ্গী।

নারীর গুরুরূপে আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন হইল,—স্ত্রীদেহধারিণীদের গুরুরূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাতে ক্ষতি কি? অতীতে যখন ভারতবর্ষে গুরুবাদ্‌ ছিল না, তখন বহু নারী আচার্য্য-রূপে পুরুষ-শিষ্যদের-বেদ পড়িয়েছেন, শাস্ত্র শিখিয়েছেন। অত্রিবংশীয় বিশ্ববারা ছয়টী ঋক্‌ রচনা করেন, অম্ভৃণ ঋষির

কন্যা বাক্‌দেবী ঋগ্‌বেদের একটী সূক্তে আটটী মন্ত্র রচনা করেন, অত্রিবংশীয়া অপালা ঋগ্‌বেদের একটী সূক্তে আটটী মন্ত্র রচনা করেন, ইন্দ্রের জননী অদিতি ঋগ্‌বেদের তিনটী ঋক্ রচনা করেন, যমী ঋগ্‌বেদের দুইটী ভিন্ন সূক্তে দশটী মন্ত্র রচনা করেন, অঙ্গিরার কন্যা শাশ্বতী ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র রচনা করেন, কাক্ষিবানের কন্যা ঘোষা ঋগ্বেদের দুইটী সূক্ত রচনা করেন, সূর্য্যা ঋগ্বেদের একটী সূক্ত চরনা করেন। এরা সকলেই গুরু বা গুরুস্থানীয়া। বেদ-রচনার পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ উপনিষদের যুগে আত্রেয়ী ও গার্গী নিজেদের আধ্যাত্মজ্ঞানে অতুলনীয়া হয়েছিলেন এবং বহু জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান-শিক্ষা দিয়েছিলেন। এতগুলি নারীর গুরু-রূপে অবির্ভাবে অতীত কালে যদি কোনও ক্ষতি না হয়ে থাকে, তবে আজও ক্ষতির কারণ কিছু নেই! কিন্তু তবু যদি জিদ্ কর যে, নারীর গুরুত্বে লাভ কি, তবে তাও সানন্দে বল্‌ব। তোমরা একটু ফুরসুৎ পেলেই নারী জাতিকে এক অতি নিকৃষ্ট জাতি ব'লে অবজ্ঞা ক'রে থাক। দুই চারিজন শক্তিশালী স্ত্রীগুরু আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের সেই ভ্রম ভেঙ্গে এবং স্ত্রীজাতির সেই গ্লানি দূর ক'রে দিচ্ছেন। তোমরা কামচর্চ্চায় ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-বিষয়ক ধ্যানে এত ঘোরতর ভাবে নিমগ্ন হচ্ছ যে, নিজের জননীকে পর্য্যন্ত পূজার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পার না। এই জন্য নারী-দেহ ধারণ ক'রে কেউ কেউ আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের অন্তরের বিচলিত মাতৃ-শ্রদ্ধাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্যক্ কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদনে যোগ্য পুরুষ-গুরু কদাচ মিলে, এই কারণে অবহেলিতা স্ত্রীজাতির প্রতি পরিপূর্ণ ভাবে গুরুর কর্ত্তব্য প্রতিপালনের প্রয়োজনে শক্তিশালী স্ত্রী-গুরুদেরও আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হচ্ছে।

নারীর স্ত্রী-গুরু, পুরুষের পুরুষ-গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী গুরুই বল, আর পুরুষ-গুরুই বল, উভয়ের মধ্যেই কার্য্যপরিচালনের কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। স্ত্রী-লোকেরা শুধু স্ত্রী-গুরুর কাছেই দীক্ষা নেবে, পুরুষেরা শুধু পুরুষ-গুরুর কাছেই দীক্ষা নেবে, এই জাতীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠা কত্তে পার্ল্লে অবশ্য সেই লেঠা করতকটা চুকে যায়। যেমন ধর, একটি পুরুষ অনুরাগিণী স্ত্রী নিকটে থাকা সত্ত্বেও কামবেগ-ধারণে অক্ষম হ'য়ে পরনারীর প্রতি আসক্ত ভাব অনুভব কচ্ছে। স্ত্রী-গুরুর নিকটে গিয়ে একথা প্রকাশ ক'রে বলা তার পক্ষে কঠিন কাজ, আর স্ত্রী-গুরুর পক্ষে আবশ্যকীয় সকল উপদেশ দেওয়া সহজ নয়। অথবা ধর, একটী নারী স্বামীর যথেষ্ট যত্নসোহাগ সত্ত্বেও একটা পরপুরুষের প্রতি অন্তরের তীব্র আকর্ষণ অনুভব কচ্ছে। এক্ষেত্রে পুরুষ-গুরুর কাছে গিয়ে এসব কথা খোলাখুলি

ব'লে প্রতিকারের পন্থা জানতে চাওয়া তার পক্ষে একরূপ অসম্ভব, এবং খুব সহজ ক'রে কথাটা ব'লে ফেললেও পুরুষ-গুরুর পক্ষে এতৎসম্পর্কিত আবশ্যকীয় উপদেশ নিজ স্ত্রী-শিষ্যকে নিঃসঙ্কোচে দেওয়া অতি কঠিন। নৈতিক জীবনে এতজ্জাতীয় সঙ্কটের মুহূর্ত্তে নারীদের পক্ষে নারী-গুরু এবং পুরুষদের পক্ষে পুরুষ-গুরু বিশেষ সহায়তা কত্তে পারেন।

আধ্যাত্মিক সঙ্কটে গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সঙ্কট যতক্ষণ নৈতিক, ততক্ষণ নারীকে পুরুষ গুরুর চেয়ে স্ত্রী-গুরুই শ্রেয়ঃ মনে কত্তে হবে এবং পুরুষকে নারী গুরুর চেয়ে পুরুষ-গুরুকেই বরণীয় জান্‌তে হবে। কিন্তু শিষ্যের সঙ্কট সর্ব্বদা শুধু নৈতিকই থাকে না, আধ্যাত্মিক সঙ্কটই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সঙ্কট। অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসই শিষ্যের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ। ইষ্টে অবিশ্বাস, মন্ত্রে অবিশ্বাস, সাধন পন্থায় অবিশ্বাস এসবের চেয়ে বৃহত্তর সঙ্কট সাধক-জীবনে আর কিছু নেই। সেই সময়ে যিনি এই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে দিতে পারেন, বিচলিত অবস্থাকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে পারেন, প্রকৃত গুরু হচ্ছেন তিনি। সেই সময়ে কার চিবুকে আছে দাড়ি, আর কার কাণে আছে দুল, কার নাকের নীচটায় আছে গোঁফ, আর কার হাতে আছে চুড়ী কিম্বা বলয়, এই

বিচারের অবসর নেই। তখন স্ত্রী-দেহধারিণী হোন, আর পুরুষ দেহধারী হোন, নিজের আধ্যাত্মিক সম্পদ দিয়ে যিনি শিষ্যের হিত সাধন কর্ব্বেন, তাঁর মত বন্ধু নেই, তাঁর মত আত্মীয় নেই, তাঁর মত হিতৈষী নেই। তখন তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই পালয়িতা, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই পরিত্রাতা।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিপ্রহরে আহার এবং বিশ্রামের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

সিংভূমেরই অন্তর্গত কোনও গ্রামের একটি যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের জেলায় বিখ্যাত সহর জামশেদপুরে আসিয়া তোমাদের গ্রামটিতে যে যাইতে পারিলাম না, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। এবার আশ্রম হইতে বাহিরই হইতেছি একটা পরিশ্রান্ত পরিক্লান্ত শরীর লইয়া। তদুপরি একটা অতি দীর্ঘ ভ্রমণ সম্মুখে রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সমস্ত রাত্রি গোযানে কাটাইয়া পরদিন তোমাদের গ্রামে পৌছিয়া সকল কাজ সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতে নিশ্চিতই অত্যধিক শারীরিক বেগ পাইতে হইবে। কিন্তু তথাপি পশ্চাৎপদ হইতাম

না। কিন্তু অদ্য সূর্য্যোদয়কালীন ভ্রমণের পরে হঠাৎ শরীর আমার এমন অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল যে, মনে হইল রাস্তাটুকু অতিক্রম করিয়া বাসস্থানে আর ফিরিতে পারিব না। সহকর্ম্মীর স্কন্ধে ভর করিয়া কতক পথ অতিক্রম করিবার পরে শরীরে আস্তে আস্তে বল আসিল। বাসস্থানে আসিয়া দেখি, আসন-মুদ্রা-শিক্ষার্থীরা সমবেত হইয়াছেন। নিজের শরীরকে চালনা না করিয়া সহকর্ম্মীর সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অদ্যকার বিকালের বক্তৃতা বন্ধ করা চলিবে না, কেননা ইহাতে সত্যের অন্যথা করা এবং লোককে কষ্ট দেওয়া হইবে। অনেককে নিন্দা করিবারও সুযোগ দেওয়া হইবে যে, সাধু-সন্তের আবার শরীর খারাপ হইবে কেন? পরনিন্দায় ইহাদের পাপ হইবে। ইহারা ত' জানেনা যে, সাধুর দেহও মানুষেরই দেহ এবং এই একটা নির্দ্দিষ্ট দেহ চারিটা বলবান্ ব্যক্তির শ্রম অকাতরে যুগপৎ বছরের পর বছর করিয়া আসিতেছে, বিশ্রাম কাহাকে বলে এই দেহটা জানে না? অবশ্য অমি বলিয়াই রাখিয়াছি যে, এই দেহের বিশ্রাম মৃত্যুর পরে, কিন্তু তথাপি বিশ্রাম ব্যতীত রেলের ইঞ্জিন, কারখানার বয়লার প্রভৃতিরও চলে না। সুতরাং তুমি জানিয়া রাখ যে, এবারকার ভ্রমণে আমার আর তোমাদের গ্রামে যাওয়া হইবে না। এজন্য দুঃখও করিও না।

বীরপূজা এবং ভক্তপূজা

"আমি বা আমার ন্যায় তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতেচ্ছু কোনও ব্যক্তি তোমাদের গ্রামে যাইয়া তোমাদের অন্তরের জাগরণ এবং সদ্‌বৃত্তির উন্মেষণের জন্য কিছু করিতে না পারিলেও তোমরা এজন্য হতাশ হইও না। বর্ত্তমানের সমাজ-সেবকদিগকে সশরীরে যদি তোমাদের গ্রামে পাইবার অসুবিধা ঘটে, তবু অতীতের মহাপুরুষদের আনিয়া তাঁহাদের পদসেবা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে শৈথিল্য করিও না। সেই উপায় হইতেছে তাঁহাদের স্মৃতি-পূজা। বীর-পূজা এবং ভক্তপূজা তোমাদের এক অবশ্য করণীয় কার্য্য হউক। যেই তিথিতে বা তারিখে যেই বীর বা যেই ভক্ত আবির্ভূত হইয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং তিরোহিত হইয়া জগৎকে কাঁদাইয়াছিলেন, সেই তিথিতে বা তারিখে সেই সকল বীর ও ভক্তগণের জীবনের লোককল্যাণকর গুণাবলির আলোচনার দ্বারা নিজেদের মধ্যে তাঁহাদের উপস্থিতি অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। একাজে বৃহৎ একটা দলের প্রয়োজন হয় না। দুই চারিজন সমভাবের ভাবুক একত্র হইয়া অনুষ্ঠানটী করিবে আর গ্রামবাসী সকলকে অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিবে। যিনি আসেন, তাঁকেই সমাদরে গ্রহণ করিবে, যিনি না আসিবেন, তাঁকে নিন্দা করিবে না। একটীর পর একটী করিয়া অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে চালাইয়া

যাইতে থাক, অর্থব্যয় বা আড়ম্বরের দিকে হাত বাড়াইও না, প্রাণের প্রাচুর্য্যই প্রধান কথা। বীরের পূজায় তামসিকতা বিদুরিত হয়, ভক্তের পূজায় রাজসিকতার স্থানে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। দুর্ব্বলকে সবল করিবার জন্য বীরের পূজা, বহির্ম্মুখকে অন্তর্ম্মুখ করিবার জন্য ভক্তের পূজা।

বীরপূজা ও ভক্তপূজার উপকরণ

"কিন্তু বীরপূজার মানে কি ফটোর গলায় মাল্যার্পণ করা? ভক্ত-পূজার মানে কি ভক্তের প্রতিমূর্ত্তির চরণে সচন্দন বিল্ব-তুলসী ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া? ইহারা অন্যতম উপকরণ হইতে পারে, ইহাদের বাদ দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু পূজার প্রকৃত উপকরণ হইতেছে, ইঁহাদের জীবনের শিক্ষাকে নিজ নিজ জীবনে গ্রহণের জন্য অকৃত্রিম আগ্রহ রক্ষা করা। এই পূজার মন্ত্র হইতেছে ইঁহাদের উপদেশাবলী পাঠ, এই পূজার তন্ত্র হইতেছে ইঁহাদের প্রিয় অনুষ্ঠানগুলির আংশিক হইলেও অনুষ্ঠান। প্রকৃত পূজার অনুষ্ঠান এইভাবেই পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

মহাপুরুষ-বাণী

"পল্লীর বালকগুলিকে আনিয়া একত্র কর। প্রত্যেককে মহাপুরুষ-বাণী শ্রবণে ও পঠনে অভ্যস্থ কর। উৎকৃষ্ট ভক্তবাণী-

সমূহ ইহাদের দ্বারা কণ্ঠস্থ করাও। তেজোগর্ভ বজ্রসার উদ্দীপক মন্ত্র-সমূহ আবৃত্তি করাও, গান করাও, আলোচিত, সমালোচিত ও ব্যাখ্যাত করাও। যাঁহারা পরধর্ম্মদ্বেষরহিত-চিত্তে মহাপুরুষ-বাণীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া নির্য্যাস নিষ্কাশন করিতে পারেন, তাঁহাদের দিয়া বালকদের সমক্ষে তাহা করাও। অনুষ্ঠান-গৃহের ভিতর-বাহির মহাপুরুষ-বাণী দিয়া ছাইয়া ফেল, সুন্দর সুবিশাল অক্ষরে, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া মন্ত্রবৎ শক্তিগর্ভ বাণী-সমূহ চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া রাখ। এইরূপ করিতে করিতে দেখিবে, বালখিল্য ঋষিদের মত এক দল নবীন তাপসে নিখিল ভারত তোমরা পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ। শব্দের যে শক্তি কি, তাহা শব্দকে বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে তবে ত' প্রত্যক্ষ করিবে! সত্যময় মন্ত্র-সমূহের উচ্চারণে, প্রত্যুচ্চারণে পুনরুচ্চারণে ক্রমশঃ তাহার শক্তি, প্রভাব ও মহিমা উচ্চারণকারীর ও শ্রবণকারীর জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে।"

সাধু-দর্শন

নোয়াখালী জেলান্তর্গত কোনও গ্রামবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঠিক এক মাস পরে আমি বোধ হয় ফেণী পৌছিতেছি। সেই সময়ে যদি পার, দেখা করিও। 'দেখা করিও' কথাটার মানে এই মনে করিও না যে, আসিয়া একটী প্রণাম করিবে

এবং কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে। দর্শন করিবার পশ্চাতে নিজের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য অকপট আকাঙ্ক্ষা নামক দৈব বস্তুটী থাকা দরকার। আমি সামান্য মানব, একথা আমি যেমন জানি, তোমরা আর কেহই তেমন জান না, কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য অকপট আকাঙ্ক্ষা নামক দৈব বস্তুটি নিয়া যদি দেখা করিতে আস, তাহা হইলে এই সামান্য মানবকে দর্শন করিয়াই তোমার হিসাবের খাতায় জমার ঘরে কিছু অঙ্ক বসিয়া যাইবে। এই দৈব বস্তু লইয়া একটা শৃগাল, একটা কুক্কুর বা একটা বিড়ালের পানে তাকাইলেও তাহাতে আধ্যাত্মিক লাভ সঞ্চিত হয়। আমাকে দর্শন করিতে আসার মানে আমার চুল, দাড়ী, গোঁফ দেখিয়া যাওয়া নহে, পরন্তু আমারই ভিতরে যে তুমি রহিয়াছ, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যাওয়া। যেখানে গিয়াই যাহাকে দর্শন কর, প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শন করিবে তুমি নিজেকে। এই জন্যই সাধু-দর্শনে তোমার নিজের লাভ। তোমরা যখন আমার নিকটে আস, আমি তখন প্রকৃত পক্ষে তোমাদের মধ্যে আমাকেই দর্শন করি। এই কারণে তোমরা কাছে আসিলে আমি নিজে লাভবান্ হই। সাধক ব্যক্তিদের জন্য জন-সংসর্গ পরিহার করার উপদেশ এই জন্য রহিয়াছে যে, জন-সংসদে মন ইষ্টচিন্তা হইতে বিভ্রষ্ট বহির্ম্মুখ হয়। কিন্তু তোমরা কাছে আসিলে আমি তোমাদের ভিতরে ইষ্ট-চিন্তা-নিরত আমাকেই দেখি। এই হেতুতে ঐ সময়ে জন-

সংসদ আমার বহির্ম্মুখতার কারণ হয় না। যুবকদিগকে আমি ধ্যানের দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকি কেন জান? যেহেতু ইহাদের ভিতরে ইষ্ট ধ্যান নিরত আমার নিজের মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তোমরা যদি সেইরূপ মনোগতি এবং মনোভাব নিয়া সাধু-দর্শন কর, তাহা হইলে দর্শনোপলক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃতই সাধু হউন বা না হউন, তোমার সাধু-দর্শন সার্থক হইল।

সাধুসঙ্গে সদাচার

"পুনরায় বলিতেছি, আমি সাধু নহি, সামান্য মানব মাত্র। কিন্তু সাধুদের দর্শন করিতে যাইয়া যে সদাচার পালন করিতে হয়, সমান্য মানবদের বেলায়ও তাহা পালনে ক্ষতি নাই। প্রথম সদাচার হইতেছে, বাক্‌সংযম। অনেক দর্শনার্থীকে বৃথা বাচালতায় চঞ্চল দেখিয়া মনে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি। দ্বিতীয় সদাচার, সঙ্গকালে নিজ নিজ ইষ্ট-চিন্তা অবিরাম করিতে থাকা। অনেককে অনিষ্ট বিষয়ে আলোচনা-রত দেখিয়া থাকি। তৃতীয় সদাচার, তর্ক বর্জ্জন এবং জিজ্ঞাসুর মন লইয়া প্রশ্ন করা। অনেক ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসু-ভাব বিজিগীষার ভাবে পরিণত হয় এবং কোনও শান্তিপ্রদ অমৃত-বাণীর উদ্গিরণকে অসম্ভব করিয়া তোলে। তোমার বিনীত শ্রদ্ধা আমার বিনীত শ্রদ্ধার উদ্বোধিকা হইবে। তোমার প্রেমময়

সহিষ্ণুতা আমার প্রেমময় সহিষ্ণুতার প্রস্ফুরিকা হইবে। তোমরা যখন সাধুসঙ্গ করিতে যাও, তখন মনে রাখিও যে, যাঁহার সঙ্গ করিতে যাইতেছ, তিনিও সাধুসঙ্গই চাহেন, অসাধু-সঙ্গ নহে। তাঁহার সঙ্গে তোমাদের উপকার হউক, তোমাদের সঙ্গে তাঁহার উপকার হউক। সৎসঙ্গ পারস্পরিক, সৎসঙ্গ-জনিত উপকারও পারস্পরিক।

গুরুর আত্ম-বিলোপ

"তোমার গুরুদেব সম্পর্কে যে সকল কথা লিখিয়াছ, তৎসম্পর্কে স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে আমার কোনও মতামত প্রকাশ না করাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটী কথা না বলিয়া পারিব না। আমি আমার শিষ্যদিগকে অকাতরে উপদেশ দিয়া থাকি যে,—'আমার ভিতরে দোষ দেখিলে তোমরা সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত ও সুন্দরতর করিও, আমার ভিতরে সংশোধনাতীত দোষ দেখিলে বিনা দ্বিধায় এবং নির্ম্মম চিত্তে আমাকে বর্জ্জন করিও, আমার প্রতি আনুগত্য বা বাধ্যতার অনুশীলন করিয়া করিয়া নিজ স্বাধীন সত্তার বিসর্জ্জন দিবার কোনও প্রয়োজন নাই, আত্মশক্তির বিশ্বাসকে পরাকাষ্ঠায় নিয়া পৌছাইয়া তোমরা পরমোপাস্য পরব্রহ্মকেই তোমাদের গুরু বলিয়া উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইও,—ইত্যাদি।' কোনও গুরু জগতে যাহা

বলেন নাই, আমি আমার শিষ্যদিগকে তাহা বলিয়াছি। পৃথিবী জুড়িয়া শিষ্যরা গুরুর নিকটে আত্মবিলোপ করে, আমি শিষ্যদের নিকটে আত্মবিলোপ করিয়াছি। শিষ্যকে প্রধান রাখিয়া আমি ক্রমশঃ যবনিকার অন্তরালে সরিয়া যাইতেছি। তাহাকে সর্ব্বকার্য্যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমি নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিজ স্বাধীন সত্তার সঙ্গে সঙ্গেই বারিধির অতল-তলে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছি। আমার প্রভুত্ব, আমার কর্ত্তৃত্ব, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার নেতৃত্ব আমি নির্ম্মম ভাবে শিষ্যের আত্মপ্রকাশের নিকটে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। ইহা আমি বর্ত্তমান যুগের গতি, রীতি এবং প্রয়োজনের মুখপানে তাকাইয়া করিয়াছি, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না।

অদোষদর্শী গুরু

"কিন্তু আমার পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের ভিতর দিয়া আমার জীবনের সার্থকতা আসিতে পারে, আমার আত্মবিলোপে আমার শিষ্যের কোন্ সার্থকতা থাকিতে পারে? গুরুরূপে একটী শিষ্যকেও যে জীবনে কোনও আদেশ প্রদান করিলাম না, পরন্তু দিনের পর দিন আর যুগের পর যুগ কেবলই প্রতীক্ষা করিয়া গেলাম যে, তার সহজ স্বভাবে সে আপনি যাচিয়া কখন আদেশ চাহিবে, আমার এই নিজস্বতার

বিসর্জ্জন আমার পক্ষে মহাশ্লাঘার হইতে পারে, কিন্তু আমার এই বিসর্জ্জনে আমার শিষ্যের শ্লাঘার কি আছে? কোনও শিষ্য এই একটা কথা কখনও ভাবিয়া দেখে নাই কিম্বা এই বিষয়ে কখনও প্রশ্ন পর্য্যন্ত করে নাই। বারংবার কদর্য্য অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্য আমার নিকটে ক্ষমা পাইয়াছে, পরনারীকে সে আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া কাঁদিয়া অধীর হইয়াছি, কিন্তু তাহাকে বর্জ্জন করি নাই, পরস্ব সে অপহরণ করিয়াছে দেখিয়া ব্যথায় ঢলিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করি নাই, গুরুদ্রোহ করিয়াছে দেখিয়া লজ্জায় ক্ষোভে বেদনায় মথিত হইয়াছি, কিন্তু তবু অভিসম্পাত করি নাই। শত দোষ, সহস্র ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া প্রাণময় স্নেহ দিয়া তাহাকে ভালই বসিয়াছি। মানবের পরিজ্ঞাত অপরাধের তালিকামধ্যে এমন কোন অন্যায় আছে, যাহা আমার কোনও না কোন শিষ্য না করিয়াছে? ব্যথিত হইয়াছি, তাহার কুশলের জন্য বিশ্বনাথের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছি, তাহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের জন্য সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ লক্ষবার জপ করিয়াছি, কিন্তু 'তুই আমার পরিত্যক্ত'—এই কথা মুখে বা মনে একটী বারের জন্য উচ্চারণ করি নাই। এই যে করি নাই, ইহাতে আমার লাভ হইয়াছে, কিন্তু শিষ্যের লাভ কি হইয়াছে?

শিষ্যের অদোষদর্শিতা

"অথচ শিষ্যের দিক্ হইতে যদি বিচার করিতে হয়, শিষ্য যদি নিজের অন্তরের দিকে তাকাইয়া চলে, তাহা হইলে চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাসজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাহাকে বলিতেই হইবে,—

'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে,
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, কহিলুঁ তোমারে।'

শিষ্য যখন সুস্থ, শিষ্য যখন সুস্থমনা, শিষ্য যখন নিশ্চিতই সাধন-পরায়ণ, শিষ্য যখন সাধনের ফলে প্রেমময় অবস্থায় আরূঢ়, শিষ্য যখন নাম-সাধনের প্রকৃত ফলকে আয়ত্ত করিয়াছে, শিষ্য যখন নামে একান্ত রুচি-সম্পন্ন এবং আস্থাবান্ হইয়াছে, সেই সময়ে তাহাকে অকাতরে একথা আপনা আপনিই বলিতে হইবে,—

'যদ্যপি আমার প্রভু শুঁড়ি-বাড়ী যায়,
তথাপি আমার প্রভু নিত্যানন্দ রায়।'

তুমি যখন তোমার গুরুদেব-সম্পর্কে নানা অপ্রিয় মন্তব্য করিয়া আমার নিকটে পত্র দিতেছ, তখন আমি প্রত্যুত্তরে তোমাকে জানাইতেছি যে, শিষ্যের প্রতি গুরুর অদোষদর্শিতা যদি গৌরবজনক বা মঙ্গলজনক হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরুর প্রতি শিষ্যের অদোষদর্শিতা আরও গৌরবজনক, আরও মঙ্গলজনক।"

সংযম

অপরাহ্নে যথাকালে বিবেকানন্দ সোসাইটি-হলে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অদ্য সভাগৃহে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। সিঁড়িতে এবং বাহিরের প্রাঙ্গণে শত শত লোক দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "সংযম"। আড়াই-ঘণ্টা-ব্যাপী ভাষণে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা এক মহাশক্তির উৎস। এই চেষ্টা যার সফল হয়, সে ত' শক্তিধর হয়ই হয়, যার সম্মুখে বারংবার বিফলতার গ্লানি এসে তার কলঙ্কিত হস্ত প্রসারিত করে, সেও নিজের অজ্ঞাতসারে শক্তি লাভ করে। ইন্দ্রিয়-সংযম-চেষ্টায় বিফল হ'য়েও যে তা' ছাড়ে না, সে একদা নিজের ভিতরে পূর্ণ সংযমকে সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে সমর্থ হয়। ভারতীয় ঋষিদের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই পরম সত্যটী ধরা পড়েছিল ব'লেই ব্রহ্মচর্য্যকে তাঁরা জীবনের মূল ভিত্তি ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র জাতির সমক্ষে দিনের পর দিন কত রকমের বিপত্তি এসে পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়াতে চাইবে, উচ্ছ্বাসপ্রবণ মানসিকতার অধিকারী আমরা আজ তা হয়ত চিন্তাও কত্তে অনিচ্ছুক। কিন্তু একদিন সমগ্র জাতির প্রতিটি মানুষের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা কত্তে হবে। সেদিন যদি চরিত্রহীন লম্পটেরা

হয় দেশের কাণ্ডারী, তা' হ'লে মানুষের দুর্দ্দশার কোনও অন্ত অবধি থাক্‌বে না। সেদিন যদি হয় জাতির সাধারণ মানুষ দুর্ব্বল তা' হলে প্রতিকারেরও কোনও পথ থাক্‌বে না। জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই জাতিকে সর্ব্বজনীন ভাবে সংযমের সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। পশুবলকে রুখতে হ'লে চরিত্রবল চাই। সংযম একটা অন্ধ কুসংস্কার নয়, সংযম এক রহস্যময় কল্পপাদপ। দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, বুদ্ধি, চেষ্টা ও সঙ্কল্পকে উৎফুল্ল ও প্রসন্ন ক'রে তোলবার পক্ষে সংযম-সাধনার মতন দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নেই।

জামশেদপুরে সঙ্গীত-শিল্পীদের মহত্ত্ব

জামশেদপুরের সঙ্গীত-শিল্পীরা অদ্য একটী অসাধারণ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিন সভার বিজ্ঞাপন প্রচারের পরে জানা গেল যে, অদ্য হল পাওয়া যাইবে না। কারণ, সঙ্গীত-শীল্পীরা নাকি আজ সঙ্গীত-সম্মেলন করিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী একটী করিয়া প্রতিটি সঙ্গীত-শিল্পীর সহিত দেখা করিলেন, আলাপ করিলেন। তাঁহারা প্রতিজনে এই দিন সঙ্গীত করিতে বিরত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে বক্তৃতাটি করা সম্ভব হইল। বক্তৃতা শ্রবণান্তে একজন সঙ্গীতজ্ঞ বোদ্ধা ব্যক্তি বলিলেন,—"এই

আড়াইটি ঘণ্টা আমরা কি শুনিলাম? সঙ্গীতই ত' শুনিলাম। কণ্ঠের আরোহণে, অবরোহণে, যুক্তির উচ্চাবচ গতিপথে, তথ্য-সমাবেশের প্রয়োগশৈলীতে সঙ্গীত-শাস্ত্রেরই কি অনুরূপ অনুশীলন লক্ষ্য করিলাম না? গান আমরা রোজই গাই, কিন্তু বক্তৃতা কি রোজই পাইব?"

(—ঃ ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত ঃ—)

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥

দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥
কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন,
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥
নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান ॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

(৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়॥

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়॥

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব-মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,
আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়॥

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৬' নং গান।

(৯)

তোমারে যেদিন
প্রচার করিতে হবে,
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে!

লঙ্ঘিছে কত হিমগিরিচয়,—
বিষম বিঘ্নে চির-নির্ভয়,
কত দিগ্‌দেশে তোমারি বিজয়
বিঘোষিছে ভৈরবে;
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে॥

কিন্তু প্রথম প্রার্থনা নাথ,
থাকিতে হইবে সদা মোর সাথ,—
প্রতি পরমাণু মোর দেহমনে
তোমাতে ডুবিয়া রবে,
তবে ত' তোমার এ দীন সেবক
কত কি করিবে ভবে॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '২৪' নং গান।

(১০)

অনাদি অসীম অনন্ত আমি
সসীম হইনু তোদের তরে,
উদার বিশাল বিপুল আকাশ
প্রবেশিল এক ক্ষুদ্র-ঘরে॥

সবারে শিখাতে প্রেমের মিলন,
ধরিনু মূরতি কত অগণন,
সবারে লইয়া খেলিতেছি খেলা
দিবস-রজনী বিশ্ব-ভ'রে॥

এত বিচিত্র, তবু আমি এক;
প্রকটিত, তবু নিবিড় অলেখ;
সব বিপরীত একের মাঝারে
মিলিত হইয়া এ' চরাচরে
কভু হয় প্রভু, কভু বা সেবক,
নিজেরেই নিজে ভজনা করে॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১০৪' নং গান।

(১১)

আমায় তুমি শিখাও প্রভো
জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক'রে ভাসাতে হয়
অকূল মাঝে ভেলা।।

কেমন ক'রে ঝড়-বাতাসে
তোমার প্রেমে পরাণ হাসে,
কেমন ক'রে অভয় মিলে
ডুবে মরার বেলা।।

কেমন ক'রে আঁধার রাতে
আকাশ ভেঙ্গে পড়লে মাথে
তুচ্ছ অতি তুচ্ছ ব'লে
করব অবহেলা।।

বিদ্যুতের ঐ চক্‌মকানি,
ঊর্ম্মিমালার ক্রুদ্ধ বাণী
কেমন ক'রে সাজাবে মোর
আনন্দেরি মেলা।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৮২' নং গান।

অখণ্ড সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

—শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ—

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

ত্রয়োদশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অকিঞ্চন-বৃত্তির তাৎপর্য্য	১৯২	অযোগ্যের আস্ফালন	১২৩
অখণ্ড-মন্দিরের আকৃতি	৭৮	অর্থপিশাচের ধ্যানজপ	১২০
অখণ্ডের অবশ্য পালনীয় সদাচার	২৫১	অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিও না	১২৪
অজ্ঞান বিনাশের উপায়	৩৭৩	অর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী	১৮৮
অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্বপ্রধান কর্ম্মী	৩০	অশান্তির নিদান	২৬৩
অদীক্ষিত শিষ্য দ্বারা গুরুর অমরত্ব	২৮২	অশুদ্ধচেতার দানে বিপদ	৩৮৯
অদোষদর্শী গুরু	৪১১	অশ্রু ও প্রেম	৩৭৬
নিত্যসেবা ও অনিত্যসেবা	১৫৮	অহমিকা বর্জ্জিত দান	৩৯১
অন্তর্বিবাহ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী	৩৪	অহংবুদ্ধি ও সেবা বুদ্ধি	১৯৫
অন্তরের সৌন্দর্য্যের বিনাস নাই	১৫৬	আইন ও ধর্ম্ম	৩৫৮
অন্য মন্ত্র জপকারীরা কি হেয়?	৩৭৯	আগে চলা না পিছে চলা	২১৫
অন্যায় করিয়া অস্বীকার	৩২৯	আঘাতের প্রতিঘাত	৩৩০
অবসাদ কেন আইল রে	৮৩	আচরণীয় কি	২৪৩
অভিনন্দন	১৮৭	আধ্যাত্মিক সঙ্কটে গুরু	৪০২
		আধ্যাত্মিক সতীত্ব	১৬০
		আমরণ সাধন	৩৭০
		আমার প্রতিচিত্রই আমার প্রতিনিধি	২৮১
		আশীর্ব্বাদ ও পুরুষকার	২৮৮
		আশ্চর্য্য ব্যাপার	১৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আশ্রম তথা সাধনদীপ্ত জীবন	৫০
আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য	১০৫
আশ্রম-বাস	২৬৫
আশ্রম মনে না মাটিতে	১৮২
আশ্রমের মর্য্যাদা	১৮৩
আসক্তি ও অশান্তি	৩৪৭
আসক্তি-নাশের উপায়	৩৭২
আসক্তি-বর্জ্জন বনাম কর্ত্তব্যে উপেক্ষা	৩৪৮
আসন-মুদ্রা ও মনেরএকাগ্রতা	৩৮১
আসন মুদ্রাভ্যাসে এবং কুস্তি-কসরতে পার্থক্য	৩৮২
ঈশ্বর-ভজনকারীর লক্ষণ	২৪১
ঈর্ষ্যা মারাত্মক পাপ	২১৯
উচ্চভাবের স্থায়িত্ব সম্পাদনের উপায়	৩২১
উৎসবের লক্ষ্য	২৫
উত্তম শিষ্যের লক্ষণ	৩০৫
উপাসনা-কালীন পরিধেয় বস্ত্রাদি	৮২
উপাসনা-কালীন স্থান-বণ্টন ও আসন	৮০
উপাসনা মন্দিরের বিগ্রহ	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
উপাসনার লয়এবংযন্ত্র-সঙ্গত	৮২
উভয় কর্ণে মন্ত্র দানের তাৎপর্য্য	২৫৫
একজন মাত্র নেতা কর্ত্তৃক দেশোদ্ধার	৩৫
একত্র প্রসাদ গ্রহণ	৯৫
একদা আমি থাকিব না	২২২
একলা চল রে	২৮৪
এখনই নামজপ শুরু কর	১০২
ঐকান্তিকতা	২০
ওঙ্কার-সঙ্গীত	১১৪
ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব	৪০
ওঙ্কার সর্ব্বস্বরের সমাবেশ	১১৫
কঠোর শ্রমের পর বিশ্রাম	৩১৭
কথকতা-প্রথার উৎপত্তি	১৩৩
কন্যাকে চিরকুমারী রাখা	২০৫
কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনে দৃঢ়তা	১১৯
কর্ম্ম মাত্রই সম্যক্ মনোযোগ	১২৩
কর্ম্মি-সমাজের প্রতি ভক্তদের ঋণ	১৫১
কর্ম্মীর অহমিকা	১৮
কলহ প্রবৃত্তি কিসে কমে	৩৮৬
কলহান্তরিতের কপটতা	৩৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কায়িক সতীত্ব	১৬৩
কায়িক সতীত্বের সহিত মানসিক সতীত্বের সম্বন্ধ	১৬৫
কাহার স্মৃতিপূজা শ্রেষ্ঠ	১৫০
কিসের হিসাব রাখিতে হইবে	২০৪
কীর্ত্তনে পূর্ণানন্দ লাভ	৫৭
কীর্ত্তি লাভের লোভ	১৫২
কুমারী কন্যাকে চোখে চোখে রাখা	২৬১
কুমারী-জীবনে সংযম-রক্ষা	২৬০
কুমারীর ইজ্জৎ	২৬২
কুমারীর প্রতি পিতার কর্ত্তব্য	২৬২
কুমারীর ভিতরে পিতৃকুলের মর্য্যাদা-বোধ	২৬১
কুমিল্লার বিশেষত্ব	১৮৬
কুসঙ্গের বিষ	৩৫৩
কে কাহার জন্য	১৯
কেন ভারত বিদেশের প্রতি বৈরভাব বর্জ্জন করিবে?	৩৬২
কোথা হইতে আসিয়াছি	১২
কোন তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ	২২৬
খাদ্য, বস্ত্র, শয্যায় সমব্যবহার	৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
খ্যাতির অসারতা	১৫৩
খ্যাতির প্রকারভেদ ও কৌলীন্য	১৫৩
গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি কামভাব দমন	৩৪১
গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোভাব	৩৩৯
গর্ভস্থ ভ্রূণের আধ্যাত্মিক জীবন	৩৪৪
গর্ভাবস্থায় সহবাস	৩৪৩
গুরুর আত্মবিলোপ	৪১০
গুরুগিরির উভয় সঙ্কট	২৭
গ্রহণীয় কি	২৪৩
চট্টগ্রামের বিশেষত্ব	১৮৫
চরিত্র-বল	১১৭
চেনা আর না-চেনা	৯৮
ছোট কাজও শিখিতে হয়	১৭৯
ছোট হরিদাস	৩৯৬
জগৎ-সেবার জন্মস্থান	১৯৯
জগতের গুরু হও	৯৭
জগতের সকল স্ত্রী ও সকল পুরুষের স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব বিস্মরণে লিঙ্গ-পূজাদি	১৩৮
জনতা বনাম সেবকের সঙ্ঘ	১০৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জাগতিক পরোপকার এবং পারমার্থিক পরোপকার	৩৭৪
জাগতিক প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা দমনের উপায়	৩৭৭
জাগতিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কর্ত্তব্য	৩৭৬
জাতির উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়	৪৩
জামশেদপুরে সঙ্গীত-শিল্পীদের মহত্ত্ব	৪১৫
জীবনের জটিলতার নিদান	৯৬
জীবকে ভালবাসা ও ভগবানকে ভালবাসা	১৫৬
জীবনব্যাপী সৎসঙ্গ	৩৩২
জীবনের প্রধানতম বিপত্তি	৭৭
জীব-মাত্রেই শিববুদ্ধি	২০৬
জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য	৩২৪
জ্ঞানে ও প্রেমে কলহ	৩৮
ডায়োজিনিস ও কুৎসা রটনাকারী	২১০
তীর্থ কাহাকে বলে?	২২৬
তীর্থ পর্য্যটনের উপকারিতা	২২৬
তীর্থবাসকালীন কর্ত্তব্য	২৩৫
তীর্থে অবিশ্বাসীর কর্ত্তব্য	২২৭
তীর্থের পাণ্ডার কর্ত্তব্য ও দৌরাত্ম্য	২৩২
তীর্থের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশঙ্কা	২২৯
দানের বস্তু কি?	২৪৩
দাম্পত্য জীবন হইতে আত্ম-পরায়ণতার নির্ব্বাসন	৩০৪
দাম্পত্যজীবনেঈর্ষ্যাও প্রেম	২৮৯
দাম্পত্য-জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা	৩০২
দাম্পত্য সন্দিগ্ধতার কারণ	৩০১
দাম্পত্য সংযমে স্নেহ-ভালবাসার স্থান	১৩১
দিবসের ভিতরে শতাব্দীর সমাবেশ	২৮৬
দ্বিবিধ ধ্যান	৩২০
দীক্ষা, তাহার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত গুরুবাদ	২৩
দীক্ষা দানের উত্তরাধিকারী	২৮৩
দীক্ষাগ্রহণান্তেসাধন না করা	৩৩৭
দীক্ষা নিয়া অসাধন	২৫৭
দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য	২৮০
দুই কর্ণে মন্ত্র দানের উদ্দেশ্য	৪১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দুর্ব্বল মানব-জাতির বান্ধবেরা	১৭
দুষ্কৃতির সঙ্গীদের পরিচয় অস্বীকার কর	২৯৭
দেশকর্ম্মী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি	৩৬২
দেহের মিলন, শ্বাসের মিলন, আত্মার মিলন	৭২
দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কলহ	২৫২
দোষদৃষ্টি-বর্জ্জিত ও একলক্ষ্য হও	১৯৯
দ্রৌপদী ও সীতা	১৬৬
দ্রৌপদী-চরিত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা	১৭৬
দ্রৌপদী-চরিত্রের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা	১৭৪
দ্রৌপদীর ইতিবৃত্ত	১৬৭
ধনেরদাস ও ভগবানেরদাস	১২১
ধ্যানপন্থী ও নামপন্থী	৩১৮
ধ্যান জমাইবার লক্ষণ	৩১৯
ধ্যানভাব ও ভক্তিভাব লইয়া বিগ্রহ দর্শন	২২১
ধর্ম্ম অনুশীলনের বস্তু	২৪৪
ধর্ম্মহীন সভ্যতার পরিণাম	১০৬
ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার পরিচয়	৩১
ধার্ম্মিক কে?	৩৬১
ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও পরের অহিত	৩৬১
নমঃশূদ্রের শ্রেষ্ঠতা	৩৩৫
নাম অব্যর্থ	১৯৮
নাম-কীর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফল	৩১৪
নাম চঞ্চলতা হারক	২৬৪
নামই একান্ত শরণ	৩৯
নামই না ভুলে যাই	৭৬
নাম-সেবার ফল	২৮৭
নামাশ্রয়ের লক্ষণ	২৩৯
নামের বলে ভগবৎ-প্রেম সঞ্চার	২৪৬
নামের সেবা ও জীবনের সার্থকতা	২৮৮
নারীর গুরুরূপে আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা	৩৯৯
নারীর স্ত্রী-গুরু, পুরুষের পুরুষ-গুরু	৪০১
নিকৃষ্টতম পাপ	৩৬০
নিজ স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্ব বিস্মরণের উপায়-স্বরূপে লিঙ্গপূজাদি	১৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নিজালয়	১৩০
নিত্য প্রভুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ	১৫৪
নিত্য সম্পদের জন্য ব্যগ্র হও	১৯৭
নিত্যসেবাওঅনিত্যসেবা	১৫৮
নির্ব্যক্তিক গুরুবাদের প্রয়োজনীয়তা	১৯৬
নিষ্কলুষ জীবন, নিষ্পাপ জীবিকা	১১৯
নূতন তীর্থের সৃষ্টি ও উদ্ঘাটন	২২৮
নূতন পাণ্ডা-গোষ্ঠীর সৃষ্টি-প্রতিরোধ	২৩৫
নেতার অযোগ্যতা	৩০৮
নেতা ও সহকর্ম্মী	২৪৭
নেতার নিরভিমানতা	৩০৬
নেতার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৮৮
নেতা হওয়ার মানে	৮৭
নেতৃত্ব প্রিয়তার বিপদ	৩০৯
নোয়াখালির বিশেষত্ব	১৮৫
পতিতের উত্থান এবং ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার	৩৪৯
পথের সম্বল	৫৩
পরমাত্মাই গুরু	৩২৭
পরোপকারের প্রয়োজনীয়তা	৩৭৩
পাকা নেতার লক্ষণ	৯০
পা ছুঁইয়া প্রণাম	২৫
পাপ-কার্য্যে আসক্তি কমাইবার উপায়	১১৮
পাণ্ডারঅত্যাচারদমনেরপন্থা	২৩৪
পারমার্থিক কুশল কিসে?	২২৮
পারিবারিক কলহের বিপদ	৩৮৩
পুরুষকার ও ভগবদ্বিশ্বাসে বিরোধ	৪৭
পুরুষোচিত সামর্থ্য ও নারীর সতীত্ব	১৭৭
প্রকাশ্যশত্রুকিন্তু গোপনবন্ধু	২১৭
প্রকৃত পাষণ্ডতা	১৭
প্রকৃত স্বদেশ	২৭১
প্রকৃত হবিষ্যান্ন	২৩
প্রচার্য্য কি	২৪২
প্রচারের দুই দিক	২৬
প্রণবই শ্রেষ্ঠ নাম	৩৭৮
প্রণব সকল নামের প্রাণ	৩৮০
প্রণবের অধিকার	৩৭৮
প্রণবের উচ্চারণ	১৮৯, ৩২২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রণবের তত্ত্ব	১৯১
প্রলোভন ও নাম	৩৩৮
প্রতি অনুপলে নাম-সেবা	২৮৬
প্রতিষ্ঠা-প্রার্থী বনাম সেবক	২০২
ফাঁকা দাম্পত্য-প্রেম	১৩১
বক্তৃতা ও ব্রহ্মাভিনিবেশ	১১২
বক্তৃতা ও সঙ্গীত	১১৩
বর্ত্তমান পাণ্ডাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ	২৩৩
বরদাকান্ত রায়	১২৬
বহুতীর্থের লোপ-সাধন ও একটী মাত্র তীর্থ-স্থাপন	২৩০
বহুদেববাদেরউৎপত্তিরকারণ	২৪০
বিগ্রহ-পূজার নিয়ম	২৩৭
বিদেহী অবস্থায় জীবকল্যাণ	১৮৬
বন্ধুর মর্য্যাদা	৯৯
বাঁকুড়ায় তৃতীয় বক্তৃতা	১২৪
বাঁকুড়ায় দ্বিতীয় বক্তৃতা	১১৫
বাঁকুড়া ব্রাহ্মণ-সভা	১২৮
বাঁচার মত বাঁচ	১৩৪
বিনা দীক্ষায় শিষ্য	২৭৯
বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা	৯৭
বিবাহের আধ্যাত্মিক দিক্	৭১
বিবাহের দৈহিক দিক্	৬৫
বিবাহের নৈতিক দিক্	৬৭
বিবাহের পরে কন্যার অসহায় অবস্থা	৬০
বিবাহের বিভিন্ন দিক্	৬১
বিবাহের সামাজিক দিক্	৬৩
বিবাহের সাংসারিক দিক্	৬১
বিভিন্ন মতের কর্ম্মীর দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান	১৪
বিশ্বাসঘাতক তথা গুপ্ত-ঘাতক	৩৫৯
বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা	৪০৩
বীর-পূজা	২১
বীর-পূজা এবং ভক্ত-পূজা	৪০৫
বীর-পূজা ও ভক্ত-পূজার উপকরণ	৪০৬
বৃহত্তম কর্ত্তব্য	১২০
বৃহৎ নেতৃত্বের অযোগ্যতা	২৯
বৈষ্ণবের মধুর রস	১৪২
ব্যর্থ জীবন-নাট্য	১৩
ব্রাহ্মণ চিরকালই ব্রাহ্মণ	১২৮
ভক্তপূজার অর্থ	১৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভক্ত-পূজার লাভ	১৪৯
ভক্তের স্মরণে ভক্তি-সঞ্চার	২৪৭
ভগবৎ-পথে বিঘ্ন	২০
ভগবৎ-সেবা ও প্রকৃত মমত্ব	১১১
ভগবৎ-কথার বিস্তৃতির উপায়	২৩৮
ভগবচ্চিন্তন ও পরোপকার	২৯৫
ভগবদ্দর্শী ও ভগবদ্ভক্ত	৩৭২
ভগবন্নাম কি আভিধানিক শব্দ মাত্র	২১৮
ভগবন্নামের আসক্তি ইতর আসক্তি-নাশক	৩১৮
ভগবৎ-প্রেমবর্দ্ধক কর্ম্মের সাধনা	৩৫৪
ভগবৎ-সান্নিধ্যে বাসের উপায়	২৩৮
ভগবদ্-ভক্তগণের সেবার নিয়ম	২৩৭
ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ প্রাপ্তির পার্থক্য	৩৭
ভগবানকে ভার দাও	৫২
ভগবান্ স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-রহিত	১৩৫
ভগবানের উপর আদেশ-জারি	১৪
ভগবানে ভোগবুদ্ধি	১৫৯
ভগবানের গুপ্ত নাম	২৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার	৩৯২
ভারতের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ	২৪৪
ভূস্বামীর কর্ত্তব্য	১০৪
ভোগ-ত্যাগের উর্দ্ধে যাও	২৩৬
মঠ-আশ্রম প্রভৃতির নেতৃত্ব	৩০৮
মঠ ও আশ্রম সমূহের ভবিষ্যৎ	৯০
মঠ ও আশ্রমাদি পরিচালনে গৃহস্থ ভক্ত ও ত্যাগী কর্ম্মী	৯৩
মতামত প্রচার ও তর্কাদি বর্জ্জন	৩২৬
মধুর সাধনার ব্যবহারিক অসুবিধা	১৪৩
মনকে দেহের উর্দ্ধে নাও	৩৩১
মন্মথ নাথ খাওয়াশ	২৭৮
মরণ-কালের মহাকার্য্য	৩৭১
মহতের বাণী	৩২৮
মহাপুরুষ ও সাধারণ মানুষ	৩৯৩
মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে কুৎসা	২০৯
মহাপুরুষ-বাণী	৪০৬
মহাপুরুষ-সমাগম সম্পর্কে পল্লীর আত্ম প্রস্তুতি	২৭৫
মানসিক অকিঞ্চনতা	১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মানসিক সতীত্ব	১৬১
মানসিক সতীত্ব বিপন্ন হইলে কর্ত্তব্য	১৬৩
মানসিক সতীত্ব-রক্ষার কাঠিন্য	১৬২
মানসিক সতীত্বের সাধনায় ব্রতোপবাস	১৬৪
মানুষের করুণা ও ভগবানের করুণা	২০১
মানুষ-পূজা	২২৭
মুক্ত পুরুষের লক্ষণ	৩৮
মুক্তি এবং নিত্য প্রেম	৩৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্	২০৮
যোগীর প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব	১৪৬
যোনিপূজা ও লিঙ্গ পূজার দুইটী দিক্	১৩৯
যোষিৎ-সঙ্গী কে	৩৯৭
রক্তমাংসের লিঙ্গ এবং যোনির পূজা	১৪০
রাধাদেবী	৫৪
রামচন্দ্র পুরী ও শ্রীচৈতন্য	২১১
রোগের ভাণ ও রোগের উপেক্ষা	৩১৫
লক্ষ রাখ পরম ধনে	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
লক্ষ্যহীন কর্ম্মী ও নেতার নেতৃত্ব	১০৯
লাগিয়া থাক	৩৬৩
শরণাগতি ও দম্ভ	১৮১
শরণাগতি লাভের উপায়	১৮১
শান্তি ও শুদ্ধির পথ	৪৫
শান্তি স্থাপনের পথ	২৬৪
শান্তির পথ	২৬৪
শ্বাসকষ্টে নাম জপ	৩৬৬
শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপে সতর্কতা	৩৬৭
শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-জপ	৩২৩
শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপের অদ্বৈতোপলব্ধি	৩৬৯
শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের সুফল	৩৬৮
শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী শিবশক্তি বা রাধাকৃষ্ণ	১৪৮
শিলমান্দীর বক্তৃতা	৪২
শিষ্যের অদোষদর্শিতা	৪১৩
শিষ্যের দোষে গুরুর লাঞ্ছনা	১০১
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা	১০৩
শিক্ষার ব্যয় অপব্যয় নহে	১০৩
শ্রম-সহিষ্ণুতার সাধনা	৩১৬
শ্রেষ্ঠ পরোপকার	৩৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সকলেই কি গৃহত্যাগী হইবে	২৬৮
সকল বিদেশীকে স্বদেশী কর	২৭০
সকল রূপরসাদিতে ভগবৎ-সান্নিধ্য	১৫৫
সঙ্গীতের বিপত্তি	৮৪
সঞ্চয় ও মানসিক অকিঞ্চনতা	১৯৪
সৎকথার মৃত্যু নাই	২৯৫
সৎকার্য্যে সহযোগ ও চিত্তের অশুদ্ধতা	৩৮৯
সতীত্ব রক্ষার সহায়ক কি কি	১৭৭
সতীত্বের প্রকারভেদ	১৬০
সতীর্থদের অবিশ্বাস দর্শনে কর্ত্তব্য	৩২৫
সত্যরক্ষা বনাম বিশ্বাস-ঘাতকতা	৩৫৯
সধবা-জীবনে সংযম-সাধনার সহজ কৌশল	২৫৯
সধবার সংসার-ত্যাগ	২৪৯
সন্ন্যাসের আধ্যাত্মিক দিক্	৭৬
সন্ন্যাসের দৈহিক দিক্	৭৫
সন্ন্যাসের নৈতিক দিক্	৭৫
সন্ন্যাসের পারিবারিক দিক্	৭৪
সন্ন্যাসের বিভিন্ন দিক্	৭৩
সন্ন্যাসের সামাজিক দিক্	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সন্ন্যাসীর সন্তান স্নেহ	৩৪৬
সভ্যতার মাপকাঠি	১০০
সমত্ব ও মমত্ব	১১০
সর্ব্বপ্রযত্নে সেবক হও	৩১০
সহজতম যোগ	১১৮
সংখ্যাল্পতা ও সাম্প্রদায়িক শক্তি	২৮৪
সংযম	৪১৪
সংযম ও সভ্যতা	১৮
সংসারের ঝঞ্ঝাট জয়ের উপায়	৩৩৩
সংসার-পরিত্যাগের বৈধতা	৫১
সাধকের সেবা ও সিদ্ধের সেবা	২৩৬
সাধু-দর্শন	৪০৭
সাধু পরিচয়ের মোহ	২৬৯
সাধুসঙ্গে সদাচার	৩০৯
সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি-বর্জ্জন ও সম্প্রীতি-অর্জ্জন	৩৩
সার্থক কীর্ত্তন	৩১২
সুবৃহৎ নেতৃত্বের বিকাশ	২৭
সুরবালা দেবী	১২
সেবক হইবার মানে	২৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সেবকের শ্রেষ্ঠতা	১০৮
সেবাধর্ম্ম ও ভক্তিধর্ম্ম	১৫৭
সেবাবুদ্ধি ও সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী	৪৮
সেবাবুদ্ধিতে কীট	১৭৯
স্তোত্রাদির সুর	৮২
স্থিরোদ্বাহা কুমারীর প্রতি উপদেশ-দানের দায়িত্ব	৫৮
স্ত্রীগুরু তথা ঘোষিৎ-সঙ্গ	৩৯৫
স্ত্রীজাতির অহংবুদ্ধির লোপ	৩৫৭
স্ত্রীজাতির আত্মবিলোপ	৩৫৬
স্ত্রীজাতির দিব্য মমতা	৩৫৭
স্ত্রীলোকের সাধন বিঘ্ন এবং পুণ্যের ঋণ	৩৫৫
স্বদেশ-সেবা ও সর্ব্বদেশ সেবা	২২২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ ভগবৎপ্রেম	৩৭৪
স্বাধ্যায়	২৭২
স্বামিধর্ম্ম ও পতিতার পুনরুদ্ধার	২৯৮
স্বামিপত্নীর পারস্পরিক সন্দিগ্ধতা	৩০০
স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা ও তাহার নিত্যত্ব বিধান	২৯৩
স্বামিস্ত্রীর সমযুক্তা তপস্যা	১৩২
স্বামীর অনিষ্ট ও পিতৃ-ভ্রাতৃ-কুশল	৩৬৫
স্বামীর ভিটা	২৫০
"হরিওঁ" কথার মানে	৫৬
"হরিওঁ" কীর্ত্তনের মহিমা	৫৬
হরিনামে দলাদলি	৩১১

"বিশ্বের সেবার তরে
জীবন তোমার,
বিশ্বের উদ্ধারে তব
আত্মার উদ্ধার।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

অখণ্ড-সংহিতা

"অখণ্ড-সংহিতা" বা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী ভারতের ধর্ম্ম-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। জীবনের এমন কোনও জটিল প্রশ্ন নাই, যাহার মীমাংসা এই মহাগ্রন্থের কোথাও না কোথাও না পাইবেন। উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়িবার উপায় নাই। গোপন, নিগূঢ় অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের শত শত সমস্যার সময়োচিত অপূর্ব্ব মীমাংসা রহিয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডই এক একখানা পৃথক গ্রন্থ। আগের খণ্ডগুলি পড়ি নাই বলিয়া যে পরের খণ্ডগুলির অর্থ বুঝা যাইবে না বা লাভজনক হইবে না, তাহা নহে।

* * *

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

অখণ্ড সংহিতা

বা

ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড সংহিতা

বা

ত্রয়োদশ

শ্রী শ্রী স্বামী

খণ্ড

পরমহংস দেবের

শ - বাণী

অখণ্ড-সংহিতা

ত্রয়োদশ খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা

বা

শ্রী শ্রী স্বামী

খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দে

উপদেশ - বাণী